বাণী বারকরী

নির্মলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

মন মধুকর

প্রকাশক

আভা গঙ্গোপাধ্যায়

মন মধুকর

৩ যতীন দাস রোড

কলিকাতা-৭০০ ০২৯

মুদ্রক

নিশিকান্ত হাটই

তুষার প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

২৬ বিধান সরণী

কলিকাতা-৭০০ ০০৬

প্রচ্ছদ

শ্যামল সেন

স্নেহের ঝুমুরকে
আশীর্বাদ

এই লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ

শংকর-নর্মদা
নর্মদা আবার
ভারত-পথিক
খাজুরাহো চন্দেলস্মৃতি
মন মধুকর

॥ ১ ॥

ভীমানদীর তীরে কুটীর।

সেই কুটীরে একান্ত মনে পিতৃসেবা করছেন পুণ্ডলিক। প্রথম যৌবনে বড়ো অবহেলা করেছেন পিতামাতাকে। যুবতী স্ত্রীর মোহে জনকজননীকে কতো কষ্ট দিয়েছেন, কতো হেয় করেছেন তা বলার নয়। বৃদ্ধ পিতামাতা একটি কথা বলেননি। মুখ বুঁজে সব সহ্য করেছেন। আর কোনো ছেলেমেয়ে নেই,—একমাত্র সন্তান পুণ্ডলিক। পাছে সেই সন্তানের অকল্যাণ হয় তাই শত যন্ত্রণাতেও একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলেননি,—পড়েনি এককোঁটা চোখের জল।

পিতা স্বর্গ, মাতা স্বর্গাদপি গরীয়সী। পিতৃসেবাই স্বর্গসুখ,—জননীর আরাধনাতেই স্বর্গাদপি পুণ্যের আশীর্বাদ। একথা শেষ পর্যন্ত বুঝেছেন পুণ্ডলিক। তবে অনেক পরে, চোখ ফুটতে অনেক দেরি হয়েছে।

বেশি বয়সের একমাত্র সন্তান। অমূল্য নিধি। পুণ্ডলিক বড়ো হলেন,—বাপ-মা আদর করে তাঁর বিয়ে দিলেন। পুণ্ডলিক সমর্থ হলেন, সংসারী হলেন,—স্ত্রী পেয়ে আত্মহারা হয়ে তাচ্ছিল্যে বাবা-মায়ের প্রতি মুখ ফেরালেন। লাঞ্ছনা গঞ্জনা অপমানে অত্যাচারে তাঁদের মুখ কালো করে দিলেন।

দিনে দিনে বয়েস বাড়ে,—সেই সঙ্গে বাড়ে ছেলে-বৌয়ের সংসারে দুঃখ-যন্ত্রণার দাহ। একদিন বাপ বললেন,—

বাবা, আমরা অশক্ত অকর্মণ্য হয়েছি। সংসার থেকে বিদায় নেবার সময় আমাদের হয়েছে। আমরা কাশী যেতে চাই।

পুণ্ডলিক বললেন,—

যাবে তো যাও না!

পুত্রবধূ বললে,—

কে তোমাদের মাথার দিব্যি দিয়ে রেখেছে?

বৃদ্ধ বললেন,—

ঠিকই বলেছ তোমরা। এখন আমাদের যাওয়াই উচিত। কিন্তু কী করে যাব তাই ভেবে পাচ্ছিনে!

কেন? সোজা বেরিয়ে গেলেই হয়!

এবার মা কথা বললেন,—

বেরিয়ে যেতেই তো চাই বাবা। কিন্তু তোমার বাবা বৃদ্ধ হয়েছেন, আমি তো নিতান্ত অশক্ত। দেহে জোরই পাইনে। তাছাড়া তোমারই আয়, তোমারই সংসার। একটি পয়সাও হাতে নেই,—তাইতো আটকে পড়ে আছি বাবা!

কী চাও তোমরা খুলে বলো তো?

এমন আর কী চাই? তুমি আমাদের সঙ্গে করে কাশী নিয়ে চলো। সেখানে শেষ জীবনটা যাতে কোনো রকমে কাটাতে পারি তার একটা ব্যবস্থা করে দিয়ে এস।

এবার পুত্রবধূ ফোঁস করে উঠল।

বুঝছ না ওঁদের মতলব? ওঁরা ঘাড় থেকে এতোদিনে নামবেন ভাবছ? আসলে তা নয়। ওঁরা কাশী গিয়ে ভেন্ন হবেন। সেই ভেন্ন হবার ব্যবস্থা তোমাকে করতে হবে, সেই ভেন্ন সংসার তোমাকে টানতে হবে।

বটে? তিড়বিড়িয়ে উঠলেন পুণ্ডলিক। বাবা-মায়ের কথা তিনি ধরতেই পারেননি,—ঠিক ধরেছে পতিসোহাগিনী বুদ্ধিমতী স্ত্রী। দরজার দিকে সোজা আঙুল দেখালেন পুণ্ডলিক। চিবিয়ে চিবিয়ে বললেন,—

ইচ্ছে হলে সোজা ঐ দরজা দিয়ে বার হয়ে যাবে। পেছন ফিরে আমাদের মুখের দিকে তাকাবে না।

তাই বার হলেন পুণ্ডলিকের পিতামাতা। দু'জনের কপর্দকশূন্য হাতে দুটি ছেঁড়া পুঁটুলি। স্খলিত চরণই সম্বল, পথে পথে ভিক্ষাই

পাথেয়। এমনি করেই যদি পারেন তো পৌঁছবেন কাশী-বিশ্বনাথের চরণে।

নির্ঝঞ্ঝাট সংসারে ক'দিন আয়েসে কাটল। যাঁদের জন্যে সংসারের আলো দেখেছিলেন, যাঁরা স্নেহ দিয়ে পুষ্টি দিয়ে সংসারের দ্বারে পৌঁছে দিয়েছিলেন,—সেই পিতামাতাকে বিরলক্ষণে মনে পড়ে পুণ্ডলিকের। সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীকে কাছে টেনে তার সোহাগ ভোগ করতে করতে মনে মনে বলেন,—

এ ভালোই হোলো,—বাঁচলাম!

এদিকে স্ত্রীর মনে কী হচ্ছে বোঝা ভার। বুড়োবুড়ির ঝক্কি-ঝামেলা আর নেই,—নেই মর্জির আড়াআড়ি, কথার কাটাকাটি। কিন্তু সব যেন ফাঁকা হয়ে গেছে,—হুহু করছে বুকের মধ্যে। মুখ যেন আষাঢ়ের মেঘ।

পুণ্ডলিক বললেন,—

বেশ তো আছি দুজনে, আবার কী হোলো তোমার?

হবে আবার কী! আমার দিকে কখনো তাকিয়ে দেখেছ?

বলো কী? অনুক্ষণ শুধু তোমার মুখের দিকেই তো তাকিয়ে আছি!

মুখ ঘুরিয়ে নিল স্ত্রী। তাকিয়ে রইল সেই রাস্তার দিকে যার বাঁকে অদৃশ্য হয়ে গেছেন নিঃসম্বল শ্বশুর শাশুড়ী।

পুণ্ডলিক তাড়াতাড়ি সামনে এসে স্ত্রীর চিবুকটি ধরলেন। দু'চোখ জলে টলটল করছে।

কী হয়েছে বলো তো?

কিছুটা সাধ্যসাধনার পর স্ত্রী বললে,—

তোমার বাবা-মা কেমন মনের আনন্দে কাশী বেড়াতে গেলেন, আর আমরাই পড়ে রইলাম। ছাখো তো, কী স্বার্থপর ওঁরা। আমাদের দিকে ফিরেও তাকালেন না।

হেসে ফেললেন পুণ্ডলিক।

এই কথা? কী পাগল তুমি। ওঁরা বুড়ো হয়েছেন, সংসার ছেড়ে তীর্থে গিয়েছেন, তাতে আমাদের কী? তুমি কি এই বয়েসে কাশীবাসী হতে চাও নাকি?

রাখো রাখো। বুড়ো না হলে বুঝি কেউ তীর্থ করে না! আর কাশী বেড়িয়ে কেউ বুঝি সংসারে ফিরে আসে না!

বেশ তো, আমরাও কাশী যাব। সব ব্যবস্থা করে ফেলছি।

পুণ্ডলিক স্ত্রীকে নিয়ে কাশীযাত্রার জন্যে তৈরি হলেন। ঘরবাড়ি পাহারার ব্যবস্থা করলেন, মোটা পাথেয় গোছালেন, আর কিনলেন একজোড়া সুন্দর ঘোড়া। তারপর স্বামী-স্ত্রী দামী পোষাক পরে ট্যাঁকে আর আঁচলে অনেক টাকা নিয়ে ঘোড়ায় চেপে কাশীর উদ্দেশে যাত্রা করলেন।

বারাণসীর প্রায় কাছাকাছি পৌঁছেছেন। পথে এক বিরাট অরণ্য, এই অরণ্য পার হলেই গাঙ্গেয় উপত্যকা। সেই বনে তাঁরা পথ হারালেন। অনেক ঘুরে ঘুরে পৌঁছলেন এক ঋষির আশ্রমে। ঋষির নাম কুক্কুট।

পরিশ্রান্ত পুণ্ডলিক ঋষিকে শুধোলেন,—

প্রভু, বারাণসী যাবার পথ আমাদের বলে দিন, আমরা সেখানেই চলেছি।

কুক্কুট বললেন,—

আমি তো জানিনে।

সে কী? বারাণসী মনে হচ্ছে আর খুব দূর নয়। আপনি পথ জানেন না?

কুক্কুট বললেন,—

কী করে জানব? আমি তো কখনো যাইনি।

কী আশ্চর্য! আপনি এতো প্রবীণ ঋষি,—আর শ্রেষ্ঠ তীর্থ বারাণসী আপনি দর্শন করেননি?

ঋষি হেসে বললেন,—

না। তবে তোমরা কিছু ভেবো না। আমার আশ্রমে রাতটা কাটাও। সকালে উঠে বারাণসীর পথ চিনে নিয়োণ আকাঙ্ক্ষা যখন রয়েছে, পথ খুঁজে পাবেই।

আশ্রমের খোলা দাওয়ায় রাতের আশ্রয় নিলেন স্বামী-স্ত্রী। কুক্কুট তাঁদের অভয় দিয়ে বনের মধ্যে তপস্যা করতে চলে গেলেন।

গভীর হোলো রাত। দিগন্তে চাঁদ উঠল। ঘুমভাঙা পাখিরা পাখা ঝাপটিয়ে ডেকে উঠল কয়েকবার। স্ত্রী ঘুমিয়ে পড়েছে অনেকক্ষণ, কিন্তু পুণ্ডলিকের চোখে ঘুম নেই। মাথার মধ্যে ভাবনার জট।

আশ্রয়হীন পিতামাতাকে মনে পড়ছে, সেই সঙ্গে মনে পড়ছে আশ্রয়দাতা ঐ কুক্কুট ঋষিকে। এতো বড়ো ঋষি,—কখনো বারাণসী যাননি, বারাণসীর পথ চেনেন না। এ আবার কেমন? সত্যি ঋষি তো? না ছদ্মবেশী ডাকাত? এই নিশুতি রাতে গেলেনই বা কোথায়?

হঠাৎ বনজ্যোৎস্নার ম্লান আভায় তিনটি ছায়ামূর্তি পুণ্ডলিকের চোখে পড়ল। তিনটি নারী,—কৃষ্ণকান্তি ম্লানিমাময়ী। তারা আশ্রমে ঢুকল,—অঙ্গন ঝাঁট দিতে লাগল, গৃহমার্জনা করতে লাগল। পুণ্ডলিক তাদের কাজ লক্ষ্য করতে লাগলেন।

নিশীথ রাতের তিন পরিচারিকা নীরবে কাজ করে যাচ্ছে। রাত শেষ হচ্ছে, ক্ষীণ হচ্ছে চাঁদের আলো। মুছে যাচ্ছে তারার জ্যোতি, আর সঙ্গে সঙ্গে তিনটি নারীদেহের কান্তি উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হচ্ছে। পুণ্ডলিক ধড়মড়িয়ে উঠে বসে তাদের লক্ষ্য করছেন তাতে তাদের ভ্রূক্ষেপ নেই।

গৃহকর্ম শেষ হোলো। বিস্ফারিত চোখে পুণ্ডলিক দেখলেন,— তাঁর চোখের সামনে তিন মহামহিমময়ী দেবীমূর্তি। এবার তাঁরা কুটীর প্রাঙ্গণ ছেড়ে নীরবে চলে যাচ্ছেন।

মুগ্ধ পুণ্ডলিক ছুটে গিয়ে তাঁদের পথরোধ করে দাঁড়ালেন। তাঁদের বরজ্যোতিতে চোখ ধাঁধিয়ে গেল। পুণ্ডলিক দু'হাত জোড় করে

চিৎকার করে উঠলেন,—

কে তোমরা? দেখা যখন পেয়েছি, যাবার আগে পরিচয় দিয়ে যাও!

প্রথম দেবী মধুর হাসলেন।

দেখে ফেলেছ আমাদের? শোনো তাহলে,—আমরা তিন নদী—গঙ্গা, যমুনা আর সরস্বতী।

পুণ্ডলিক অস্ফুট স্বরে বললেন,—

তোমরাই মর্তের পাপহারিণী পুণ্যদায়িনী ত্রিস্রোতা?

ঠিক, আমরা তাই—

কিন্তু রাত্রিবেলা এই কুটীরে এসে দাসীবৃত্তি করছ কেন?

কেন জানতে চাও? দ্বিতীয়া দেবী বললেন,—আমাদেরও তো পুণ্যের প্রয়োজন, সেইজন্যে। সারাদিন হাজার হাজার লোকের পাপকালিমা আমরা হরণ করি, তাই না? সেই পাপে আমরা কৃষ্ণ-মলিন হয়ে যাই। সেই মালিন্য ধুতে হবে না? পাপের কালিমা থেকে মুক্ত হয়ে পুণ্যের স্পর্শে উজ্জ্বল হতে হবে না?

পুণ্ডলিক মাথা নাড়লেন।

হবে। কিন্তু কেমন করে?

তৃতীয় দেবী এগিয়ে এলেন। বললেন,—

এই কুক্কুট ঋষির গৃহমার্জনা করে। জানো না, এই ঋষি অনন্ত পুণ্যময়? প্রতি রাত্রে তাঁর ঘরে এসে আমরা কাজ করি। তাঁর সেবার বিনিময়ে তাঁর পুণ্যের কিছুটা অংশ লাভ করি। তাতে আমাদের পাপ-কালিমা ক্ষয় হয়। আমরা আবার পুণ্যদায়িনী হয়ে উঠি। পৃথিবীর মানুষের যতো পাপ, এই কুক্কুট ঋষির অমর পুণ্যে তার ক্ষালন হয়।

বিস্ময়-ব্যাকুল পুণ্ডলিক বললেন,—

এতো পুণ্য এই ঋষির? ইনি তো বারাণসীও যাননি! কোথা থেকে এতো পুণ্য ইনি পেলেন?

দেবীরা বললেন,—

তীর্থদর্শন আর দেবতার পূজা করে পুণ্য সঞ্চয়ের প্রয়োজন কুক্কুটের হয়নি,—ইনি পিতৃমাতৃসেবা করেছেন, পিতামাতাই এঁর তীর্থ, এঁর দেবতা। পিতৃমাতৃভক্তির প্রসাদেই ইনি শ্রেষ্ঠ পুণ্যাত্মা।

বিশ্বনাথ-অন্নপূর্ণা দর্শন সারা হোলো না। কাশীর ঘাটে বাবা-মায়ের দেখা পেলেন। তাঁদের পায়ে লুটিয়ে পড়লেন স্বামী-স্ত্রী।

তুমিই আমাদের পরমপিতা বিশ্বনাথ, তুমিই আমাদের জগজ্জননী অন্নপূর্ণা,—তোমরা আমাদের ক্ষমা করো, তোমাদের পূজায় আমাদের জীবন ধন্য হোক।

জোড়া ঘোড়ায় বাবা মাকে চাপিয়ে স্বগ্রামে ফিরে এলেন। জাহ্নবী-গঙ্গা থেকে ভীমা-চন্দ্রভাগার তীরে।

স্ত্রীকে বললেন পুণ্ডলিক,—

আর আমি সংসারে যাব না। এই নদীর তীরে কুটীর বানিয়ে এখানে পিতামাতার সেবা করে জীবন কাটাব।

স্ত্রী বললেন,—

বেশ তো, আমিও হব ব্রতচারিণী সেবিকা। এই হোক আমাদের প্রায়শ্চিত্ত।

একমাত্র ব্রত একমাত্র প্রায়শ্চিত্ত পিতৃমাতৃসেবা। এই সেবাই প্রত্যহের কাজ, প্রতি মুহূর্তের চিন্তা। এই ভক্তিই ভগবৎভক্তি। বিশ্বনাথ আর অন্নপূর্ণা জনকজননী হয়ে প্রতিদিন তাঁদের সেবা গ্রহণ করছেন।

অনেক বছর কাটল। মা গত হলেন, স্ত্রীও দেহ রাখল। শুধু পুণ্ডলিক আর তার পিতা। নিত্য ভক্ত আর নিত্য আরাধ্য, আর কেউ নেই। পিতাই সর্ব সারাৎসার, পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রিয়ন্তে সর্ব দেবতা।

দ্বারপ্রান্তে এসে দাঁড়ালেন বিষ্ণু-ভগবান। বাইরে থেকে হাঁক দিলেন,—

পুণ্ডলিক!

পুণ্ডলিক পেছন ফিরে তাকালেন। দরজার বাইরে মুচুকুন্দের ছায়া। সে ছায়া আর নেই। আলোয় আলোময়, সেই আলো পুণ্ডলিকের কপালে এসে পৌঁছেছে।

ভগবান আবার বললেন,—

বৎস, ভক্তি আমার কামনা, ভক্ত আমার প্রাণ। তোমার ভক্তির তুলনা নেই। তাই তোমাকে দেখবার জন্যে আমি এসেছি।

ভক্তিভরে পিতার পদসেবা করছেন পুণ্ডলিক। এদিকে ঘরের দ্বারে এসে দাঁড়িয়েছেন ভক্তবৎসল হৃদয়রাজ। তাঁর শ্রীমুখ তিনি দেখেছেন, তাঁর কণ্ঠ তিনি শুনেছেন।

হাতের কাছে আস্ত একটা ইঁট ছিল। সেই ইঁটটা পুণ্ডলিক ছুঁড়ে বাইরে ফেলে দিলেন। বললেন,—

প্রভু, তোমাকে বরণ করবার সময় নেই। পিতার সেবা এখনো সম্পূর্ণ হয়নি, পিতার পরিতৃপ্ত চোখে ঘুম এখনো আসেনি। একটু অপেক্ষা করো,—উয়ো বিটপর খাড়ে রহো।

কঠিন একখানা ইঁট, বরণীয় অতিথির উপযুক্ত আসন। সেই ইঁটের ওপর উঠে দাঁড়ালেন বিষ্ণু-ভগবান। কোমরে দুহাত রেখে অপেক্ষা করতে লাগলেন। গৃহদ্বারের ফাঁক দিয়ে দেখতে লাগলেন পুণ্ডলিকের পিতৃসেবা।

সেবা শেষ করে পুণ্ডলিক বাইরে এলেন। অপেক্ষমান নারায়ণ বললেন,—

তোমাকে আমি বর দেব। কী বর তুমি চাও?

পুণ্ডলিক বললেন,—

তোমার কাছে কেন বর চাইব প্রভু? কেমন করে চাইব? তোমার পূজা তো আমি করিনি!

সহাস্যে ভগবান বললেন,—

তোমার পিতৃপূজাই আমার পূজা। সেই পূজা দেখেই আমি

পরম তৃপ্ত। বর তুমি চাও।

তখন পিতৃপূজারী পুণ্ডলিক বললেন,—

প্রভু তাহলে এই বর দিন,—এই পিতৃপূজায় যেন সারা জীবন নিবেদন করতে পারি আর এই পূজাদর্শনের তৃপ্তিও আমি যেন নিত্য দিন আপনাকে দিতে পারি।

প্রার্থনার মর্ম গ্রহণ করতে দেরি হোলো না। ভগবান বুঝলেন, পিতৃপূজার পুণ্যে পুণ্ডলিক নিত্যকালের মতো তাঁকে বেঁধে ফেলেছেন।

তথাস্তু।

ভীমানদীর তীরে ঐ জনপদে পুণ্ডলিকের কুটীরের সামনে ঐ বিটের ওপর কোমরে হাত দিয়ে চির-আসীন বিষ্ণু-ভগবান। বিটেবরী উভা কটাবরী হাত। বিটবিহারী বিষ্ণুর নাম বিট্‌ঠলদেব বা বিটোবা। তাঁর কৃষ্ণজলধর মূর্তি।

তাই তাঁর অপর নাম পাণ্ডুরঙ্গ।

জনপদের নাম পাণ্ডুরঙ্গপল্লী,—বর্তমানে পান্ধারপুর।

জয় জয় বিট্‌ঠল হরি।

॥ ২ ॥

সেই নদী ভীমা। ভীমার উৎস সহ্যাদ্রি পর্বতমালার এক শিখরে। নাম ভীমশংকর। ভীমশংকরের স্বেদবারি থেকে ভীমার উদ্ভব। ত্রিপুরাসুরকে নিধন করে এই পর্বত-শিখরে জ্যোতির্লিঙ্গ শংকরের চিরন্তন প্রতিষ্ঠা।

বিন্দু থেকে সিন্ধু। পাহাড়ের মাথায় বিন্দু বিন্দু জল একটি কুণ্ডে সংগৃহীত হয়েছে। তারপর ঝিরঝির ঝরণার মতো পাহাড়ের গা বেয়ে নেমে এসেছে ভীমা। বয়ে চলেছে দক্ষিণ-পূবদিকে—গভীর থেকে গভীরতর, স্ফীত থেকে স্ফীততর হয়ে। তীরে তীরে কতো শস্যক্ষেত্র, কতো গ্রাম, কতো জনপদ, কতো মন্দির, কতো তীর্থ।

তেমনি এক জনপদ পান্ধারপুর। তেমনি এক তীর্থ। প্রাচীন নাম পাণ্ডুরঙ্গপল্লী। ভীমানদীর দক্ষিণ তীরে অবস্থিত। এখানে নদী চন্দ্র-বলয়ের মতো বাঁক নিয়েছে। তাই এখানে ভীমার অপর নাম চন্দ্রভাগা।

সেই চন্দ্রভাগার তীরে। কার্তিকের কুয়াশাভরা প্রত্যূষে। একেবারে মুখোমুখি দেখা।

অ্যাঁ? কে তুমি গা? দেখাচ্ছে যেন চেনাচেনা!

চেনাচেনা লাগবেই তো! আমি কি অচেনা? আমার আগেই চোখ পড়েছিল, দূর থেকেই চিনতে পেরেছিলাম। সেই ছিপছিপে চেহারা, সেই টকটকে রং। পরিষ্কার করে কামানো গাল, মোটা গোঁফ,—ঘাড় পর্যন্ত নেমে আসা বাদামী চুল।

তিনি কি আমাকে চিনতে পারবেন? পৈঠানের সেই ক'দিনের বন্ধু দেশপাণ্ডেজী? বললাম,—

এরই মধ্যে ভুলে গেলেন?

ব্যস, ঐটুকু মাত্র।

জয় পুণ্ডলিক! ঠিক ধরেছি, তুমি আমার বাঙালী ভাই,—তাই না?

— নদীর জলে প্রাতঃস্নান সারা হয়েছে। চওড়া বালির চড়া ভেঙে উঠে আসছেন,—গুন্‌গুন গান গলায়। কোমরে খাটো বহির্বাস। গলায় তুলসীমালা। হেমন্তের কুয়াশার মধ্যে উত্তরীয়ের জ্বলজ্বলে হলুদ রংটি।

বাঙালী ভাই, তুমি কেমন করে এখানে এলে?

দু'হাতে জড়িয়ে ধরলেন আমার ডান হাত।

আমি হাসলাম হাসিমুখের দিকে তাকিয়ে।

আপনি যেমন করে এসেছেন, ঠিক তেমনি। একই টানে, একই উদ্দেশ্যে।

কবে?

এইতো কাল সন্ধ্যেবেলা। আজ একাদশী নয়? ঠিক জানতাম, শুধু তীর্থদর্শন নয়,—আপনার সঙ্গেও দেখা হবেই।

বুকে জড়িয়ে ধরলেন এবার। বুকে বুকে লাগিয়ে, প্রাণে প্রাণ মিলিয়ে, আশেপাশে যারা ছিল তাদের চোখে তাক লাগিয়ে।

পৈঠানে একনাথজীর মন্দিরে। চার পাঁচ বছর আগে। সেইখানে আলাপ হয়েছিল বিশ্বম্ভর দেশপাণ্ডের সঙ্গে। আবার দেখা এই পান্ধারপুরে। কার্তিকের শুক্লা একাদশীর শুভ প্রভাতে।

আমি ভোরবেলাই দলছুট। সঙ্গী-সাথী অতিথিশালার বারান্দায় পড়ে ঘুমুচ্ছে। কাউকেই ডাকিনি,—একলা বেরিয়ে পড়েছি। দেশপাণ্ডেজী কিন্তু একা নন। তাঁর সঙ্গে একটি দল আছে। কোলাকুলির আবেগে আমরা আত্মহারা। তাই দেখে কেউ স্মিতমুখ, কেউ অবাক্ হয়ে ভাবছে,—কে এই লোকটা, বাঙালী ভাই আবার কোত্থেকে এসে জুটল? রাস্তা আটকে কতোক্ষণ জ্বালাবে?

সত্যিই পথে দাঁড়িয়ে গল্প করবার সময় এখন নয়। দেশপাণ্ডেজী স্নানের পর কাপড় বদলেছেন, কিন্তু অনেকেরই পরনে ভিজে, তাতে হিমেল হাওয়ার হিহি-লাগানো ছোঁয়া।

হাতে এক জোড়া মন্দিরা' টুং করে শব্দ উঠল। দেশপাণ্ডেজী বললেন,—

চলো ভায়া আমাদের সঙ্গে।

গুন্‌গুন সুর উঠেছে, দেশপাণ্ডেজীর স্নিগ্ধ মধুর গলায় অনেকের গলা মিলেছে,—মিলেছে মন্দিরার রুনুঠুনু। একসঙ্গে সবাই পা বাড়িয়েছে একই গান গাইতে গাইতে,—

জয় জয় বিট্‌ঠল রামকৃষ্ণ হরি।

সামনের মন্দির থেকে বেরিয়ে এল একজন। মাথাটি ন্যাড়া, কপালে চন্দন, গায়ে একটি শাদা চাদর, পরণে শাদা বহির্বাস। একেবারে ছুটতে ছুটতে এল নামগানের তাল শুনে। হাতের মালাটি পরিয়ে দিল দেশপাণ্ডেজীর গলায়। দু'হাত তুলে নামগানে যোগ দিল,—

জয় জয় বিট্‌ঠল রামকৃষ্ণ হরি।

মালা গাঁথতে হবে, একটি একটি করে ফুল দিয়ে মালা গেঁথে প্রিয়ের গলায় পরাতে হবে। কিসের ফুল? নামের ফুল। কিসের মালা? নামের মালা।

যাগযজ্ঞ করতে হবে না। পূজার্চনা বাদ দিলেও চলবে। মন্ত্রপাঠ আর তত্ত্বচিন্তা মাথায় থাক,—শুধু নাম জপ করো নাম-সংকীর্তন করো। রামনাম, কৃষ্ণনাম, জয় জয় বিট্‌ঠলনাম। বনে গিয়ে একলা তপস্যা করতে হবে না। সংসার-সরিতের তীরে সকলে মিলে আত্মহারা হয়ে সকলের গলায় গলা মিলিয়ে শুধু গেয়ে যাও,—

জয় জয় বিট্‌ঠল রামকৃষ্ণ হরি।

কেউ চলেছে স্নান করতে। কেউ দাঁড়িয়ে আছে কোমরজলে। কারো ভিজে গা তখনো মোছা হয়নি। গানের সুর ভেসেছে ভোরের বাতাসে, সকলেরই কানে পৌঁছেছে। সবাই ছুটে আসছে নাম-গানের টানে।

হলুদ উত্তরীয়টি মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে। দেশপাণ্ডেজী দু'হাত তুলে তুলে তুলে নাচছেন। নাচছে তাঁর সারা অঙ্গ। তাঁর মুখের হাসি চোখের দিঠি, নাচছে তাঁর আকুল কণ্ঠ। তাঁকে ঘিরে ধরেছে নদীতীরের মানুষজন, তাঁর বিভোরতায় বিভোর হয়ে সবাই নামগানে মত্ত হয়েছে,—

জয় জয় বিট্‌ঠল রামকৃষ্ণ হরি।

যেখানেই যাই, বিট্‌ঠল বিট্‌ঠল করে সবাই পাগল। সবার আগে বিট্‌ঠলের নাম। সবার মুখে বিট্‌ঠলের গান। স্রোতে ভাসতে ভাসতে আমি এসেছি শত শত ভক্তের পরিক্রমার সঙ্গে সঙ্গে। একবার ঠেকেছি এ ঘাটে আবার ও ঘাটে। ঘাটে ঘাটে বিট্‌ঠলের জয়গান। তীর্থে তীর্থে বিট্‌ঠল উপাসনা।

ত্রেতায় রাম, দ্বাপরে কৃষ্ণ আর কলিতে হরির্নামৈব কেবলম্! এর

মাঝে তুমি কে হে বিট্‌ঠল ?

কানে এসেছে,—

ওহে বিট্‌ঠল,

তুমি আমার সর্বনিধি,

সাগরতলের মানিক তুমি দূর আকাশের তারা,

অহর্নিশি নিরবধি

তোমার খোঁজে আমি পাগল পারা ॥

আবার শুনেছি,—

মাতাপিতা সুত প্রিয় পরিজন

ওহে বিট্‌ঠল, পরম যতন।

তুমি সংসার, বৈরাগ্যধন—

বিট্‌ঠল তুমি হৃদয়রতন ॥

আবার কে গান গেয়ে ফিরেছে,—

ওরে বিট্‌ঠল সর্বনাশা

কোথায় আছিস লুকিয়ে ?

মোর হৃদয়কানন তোর যে বাসা

তোর পরশে মোর কান্নাহাসা

তোর বিহনে অদর্শনে

ফুলগুলি যায় শুকিয়ে ॥

এতো আকুতি কেন ? তুমি আমার সংসার, তুমি আমার বৈরাগ্য, তুমি আমার ধন, তুমি আমার ধ্যান। এসো এসো, তোমার প্রেমস্পর্শে আমার বিরহ-সন্তাপকে দূর করো, তোমার বসন্ত সমীরে আমার মন-বাগিচার ফুলগুলি তুমি ফুটিয়ে তোলো।

এতো আকুতি কার জন্যে ?

বিট্‌ঠলের জন্যে।

তোমার জয়গান আমি পথে পথে শুনেছি। তীর্থে তীর্থে দেখেছি তোমার বিগ্রহ। শুনেছি তোমার ভক্তলীলা। তোমাকে চিনতে

পারিনি, বুঝতে পারিনি। অনেক পথ ঘুরে ঘুরে আজ তোমার পরম নিকেতনে এসে পৌঁছেছি। এবার তোমাকে বুঝব। তোমাকে ধরব।

এদিকে গানের ধুয়ো বদলে গেছে। আর বিট্‌ঠল নয়,—পুণ্ডলিক। জয় পুণ্ডলিক বলে দেশপাণ্ডেজী প্রথম আমাকে সম্বোধন করেছিলেন। কানে ঠেকেছিল কেমন। এ সেই পুণ্ডলিক।

পুণ্ডলিক, তুমি রসামৃত ধারা।
সে ধারায় বিট্‌ঠল প্রভু হারা,
তোমার পরে বিট্‌ঠলজী প্রসন্ন,
পুণ্ডলিক তুমি পরম ধন্য॥

এ এক নতুন শোনা নাম। বিট্‌ঠলের জয় বলতে না বলতেই কিনা পুণ্ডলিকের জয়। তীর্থে তীর্থে মন্দিরে মন্দিরে লোকে যাকে ডেকে ডেকে ফিরছে, খুঁজে খুঁজে মরছে,—সে নাকি আগে থেকেই কোন্ এক পুণ্ডলিককে ধন্য করে বসে আছে।

আমার আর তর সইছে না। দেশপাণ্ডেজীকে পেয়েছি, তাঁকে পাশে নিয়ে বিট্‌ঠল প্রভুকে দেখব। সংকীর্তনের মাঝখানে তাঁর উত্তরীয়ে টান দিলাম।

এখানে দেরি কেন? মন্দিরে যাবেন না?

বারে? বলছ কী, মন্দিরেই তো ঢুকছি!

এ আবার কার মন্দির?

বুঝেছি। বিট্‌ঠলজীর মন্দির তো? চলো, আগে পুণ্ডলিকজীকে প্রণাম করে আসি। তবে তো বিট্‌ঠল! প্রথম প্রণাম তো এখানেই করতে হবে! এখন ভেতরে যাব তো বৈকুণ্ঠ ভাই?

ন্যাড়ামাথা মানুষটি মাথা নেড়ে বললে,—

বাঃ আসবেন না? বিট্‌ঠল মন্দির খুলতে এখনো অনেক দেরি। আর এ মন্দির তো দিনরাত খোলা থাকে!

দিনরাত?

তাছাড়া উপায় কী বলুন ? এ মন্দির সেবার মন্দির, রাজার মন্দির তো নয় !

কেমন যেন ঘুরিয়ে কথা হচ্ছে বৈকুণ্ঠ ভাই ?

শুনে বৈকুণ্ঠ ভাইএর একগাল হাসি।

ঘুরিয়ে কথা নয় দাদা, তবে একটু অভিমানের কথা বলতে পারেন। বলব ? মনে নেবেন না তো ? বিট্‌ঠলজী মহারাজ,—মহারাজের আহার আছে, বিহার আছে, ঘড়ি ধরে শয়ন জাগরণ আছে। কিন্তু পুণ্ডলিকজীর অতন্দ্র সেবা, প্রতি প্রহরের সাধনা। তাঁর দরজা কখনো বন্ধ রাখা তো যায় না !

কানে শুনলাম, কিন্তু মগজে ঢুকল না। না ঢুকুক, দলে বলে মন্দিরে তো ঢুকি,—দেখি কোন্ দেবতার আবাস ? বিট্‌ঠল মন্দিরের মহাদ্বার খুলতে যখন দেরি আছে তাড়াহুড়োর দরকার নেই।

পুণ্ডলিকের মন্দির, পুণ্ডলিকের সমাধি। দেবতার আবাস নয়, মানুষের স্মরণী। ভক্তজনের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে দেখছি। ইতিমধ্যে চত্বরের সামনে কখন একটি আসন পেতেছেন বৈকুণ্ঠ ভাই, করজোড়ে দেশপাণ্ডেজীকে নিবেদন করছেন,—

এখানে আপনাকে একটু বসতে হবে। পুণ্ডলিক-মাহাত্ম্য কীর্তন করতে হবে।

আমি ? আমি বলব পুণ্ডলিকের কথা ?

হ্যাঁ, আপনি ছাড়া কে ? এতো ভক্ত,—শুধু দর্শনে তৃপ্তি কই—কানে মাহাত্ম্য না শুনলে ? আর আপনার চেয়ে বড়ো কীর্তনীয়া তো দেখছিনে !

বটে বটে ? চোখ পাকিয়ে হেসেছেন দেশপাণ্ডেজী। ভক্ত-মাহাত্ম্যের কীর্তন আর শ্রবণ,—দুই বড়ো পুণ্যময়। তাছাড়া পৈঠানেই দেখেছি,—কথা বলতে দেশপাণ্ডেজীর আনন্দের সীমা নেই, অবশ্য সে কথা যদি প্রাণের কথা হয় !

দেশপাণ্ডেজীকে ঘিরে আমরা বসলাম। উত্তরীয়টি তিনি কাঁধ

থেকে নামালেন। গলা থেকে খুলে পাশে রাখলেন মালাখানি।

তারপর শোনালেন ভক্ত পুণ্ডলিকের কাহিনী। যাঁর পিতৃসেবা দেখতে স্বয়ং ভগবান বৈকুণ্ঠ থেকে নেমে এসেছিলেন। বিটেবরী উভা কটাবরী হাত হয়ে বিট্‌ঠল রূপ ধারণ করে চিরদিনের জন্মে আসীন হয়েছিলেন।

ভীমানদীর তীরে,—এই পান্ধারপুরে।

॥ ৩ ॥

পান্ধারপুরে ভীমানদীর তীরে দেশপাণ্ডেজী শুধোলেন,—

এবার কোথা থেকে আসছ বাঙালী ভাই?

গতবারে পৈঠানে যখন তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছিল তখন সারা দাক্ষিণাত্য আমি চষে বেড়াচ্ছিলাম। শুধু বড়ো বড়ো শহরই নয়, টুরিস্ট-প্রিয় দর্শনীয় স্থানগুলিও। শুধু ঐতিহাসিক নিদর্শন নয়, লোকতীর্থগুলিও। আমার সেই এলোমেলো ঘূর্ণির মধ্যে পৈঠানও পড়েছিল।

তিনি ভাবলেন এবারও ঘূর্ণিপাকেই আছি। কিন্তু এবার একটু অন্য। পাক নয়, পাকাপাকি। এক উদ্দেশ্য নিয়ে এক লক্ষ্য থেকে যাত্রা শুরু করে আর এক লক্ষ্যে এসে পৌঁছেছি।

তাই উত্তরে বললাম,—

জ্ঞানেশ্বরজীর পদপ্রান্ত থেকে।

বুঝতে দেরি হোলো না দেশপাণ্ডেজীর। সেই পদপ্রান্ত আলন্দীতে।

ভীমারই এক উপনদী,—নাম ইন্দ্রায়ণী। সেই ইন্দ্রায়ণীর তীরে আলন্দী জনপদ। এই আলন্দীতে জ্ঞানেশ্বর মহারাজের জন্ম,—এখানেই তাঁর সমাধি।

আলন্দী থেকে পান্ধারপুর,—এবার পায়ে হেঁটে এসেছি, দলে বলে এসেছি। ভক্ত শোভাযাত্রার সঙ্গে পায়ে পা মিলিয়ে নাচতে নাচতে

গাইতে গাইতে এসেছি। ক-মাইল চলেছি তার কোনো হিসেব নেই, —কোথা দিয়ে যাত্রাপথের দিনরাত কেটেছে তার কোনো ঠাহর নেই।

বলতে গেলে একটি মাসও নয়। কিন্তু সেই সময়টুকুর মধ্যে আমি সাতটি শতাব্দী পার হয়েছি। তেরো শতক থেকে যাত্রা শুরু করে বিশ শতকে এসে পৌঁছেছি।

আজ থেকে সাতশো বছর আগেকার কথা। ইন্দ্রায়ণী তীরের আলন্দী তখনো ছিল সম্পন্ন জনপদ। সেখানকার কুলকার্ণির নাম সিদ্ধোপন্থ। তাঁর কন্যা রুকমাবাঈ।

রুকমাবাঈ বড়ো ভক্তিমতী। সূর্য ওঠার আগে রোজ সে নদীতে এসে স্নান করে। ঘাটের ধারে একটি স্বর্ণপিপুল গাছ,—সেই গাছের মূলে জল দিয়ে পূজা করে,—আবার পায়ে পায়ে ঘরে ফিরে যায়। একলা সে আসে, একলা যায়,—মুখ তুলে কারো সঙ্গে কথা বলে না। বিষাদভরা তার মুখ, চোখ ছুটি সদাই ছলোছলো।

গুরু রামানন্দ চলেছেন তীর্থযাত্রায়। দাক্ষিণাত্য ভ্রমণে। আলন্দীতে তিনি এলেন। সত্তস্নাতা রুকমাবাঈ ঐ পিপুল তরুমূলে তাঁকে প্রণাম করল।

সুমুখী সীমন্তিনীর মাথায় হাত রাখলেন রামানন্দ। আশীর্বাদ করলেন,—

পুত্রসৌভাগ্যবতী হও মা।

হুহু করে কেঁদে উঠে রুকমা রামানন্দের পা জড়িয়ে ধরল।

রুকমাবাঈ প্রোষিতভর্তৃকা, চিরবিরহিণী। কৈশোরের কয়েক বছর মাত্র স্বামীসঙ্গ পেয়েছিল। তারপর একদিন তাকে ছলনা করে স্বামী গৃহত্যাগ করেছেন। কাশীতে গিয়ে দীক্ষা নিয়ে সন্ন্যাসী হয়েছেন।

গুরুর পা চোখের জলে ভিজিয়ে রুকমা বললে,—

আমি সন্ন্যাসীর পরিত্যক্তা পত্নী। সন্তানলাভের আশীর্বাদে আমাকে কলঙ্কিত করবেন না।

রামানন্দ চমকে উঠলেন।

কে তোমার স্বামী মা ?

স্বামীর নাম সাধ্বী স্ত্রীর মুখে আনতে নেই। স্থানীয় লোক বললে,—

তার নাম বিট্ঠলপন্থ।

রামানন্দ সব শুনলেন। স্তব্ধ হয়ে ভাবলেন কিছুক্ষণ। তারপর অশ্রুমুখীকে তুলে ধরে বললেন,—

আমার আশীর্বাদ মিথ্যা হবার নয় মা,—তোমার মনোবাসনা পূর্ণ হবে।

আর দাক্ষিণাত্যে যাওয়া হোলো না। ফিরে এলেন বারাণসীতে। বিট্ঠলপন্থ তাঁরই শিষ্য,—তাঁরই কাছে দীক্ষা নিয়ে সন্ন্যাসী হয়ে তাঁরই আশ্রমে আছেন।

শিষ্যকে ডেকে গুরু রামানন্দ বললেন,—

সন্ন্যাস তোমার জন্যে নয়। বঞ্চিতা স্ত্রীকে ছলে পরিত্যাগ করে এসে সন্ন্যাসী হওয়া সাজে না। যাও তুমি,—সংসারে ফিরে যাও।

কাশী থেকে বিট্ঠলপন্থ আবার ফিরে এলেন আলন্দীর সংসারে,—বিরহিণী রুকমাবাঈ-এর কাছে। রামানন্দের আশীর্বাদ সত্য হোলো,—রুকমাবাঈ-এর গর্ভে বিট্ঠলপন্থের চারটি সন্তান হোলো। তিন পুত্র,—নিবৃত্তিনাথ, জ্ঞানেশ্বর আর সোপানদেব। এক কন্যা,—মুক্তাবাঈ।

কিন্তু সমাজ ?

ছি ছি ছি ছি! সমাজ করল অন্য ব্যবহার। উচ্চবর্ণের নিষ্ঠাকঠোর সমাজ বিট্ঠলপন্থের ঘরে আসাকে অন্য চোখে দেখল, মুখ ফিরিয়ে নিল ঘেন্নায়। যে একবার সন্ন্যাস নিয়ে আবার সংসারে ফিরে আসে, সমাজে তার ঠাঁই নেই,—সে অপাঙ্‌ক্তেয়। তার পরিবারের ছোঁয়ায় কূপের জল বিষাক্ত, তাদের ছায়ায় পাপের কালিমা। বিট্ঠল-পন্থের পরিবারকে সমাজ একঘরে করল। তারা নির্বান্ধব। সমাজপতিরা যাদের একঘরে করেছে তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করবার সাহস কার ?

বিট্‌ঠলপন্থ বহুশাস্ত্রজ্ঞ,—বিষয়কর্মেও তাঁর দক্ষতা প্রচুর। কিন্তু কেউ কোনো কাজ দেয় না,—জীবনযাত্রার সব পথ বন্ধ। ভিক্ষা চাইতে গেলেও দূর দূর।

ছেলেরা বড়ো হচ্ছে। পিতা নিজে পুত্রকন্যাকে শিক্ষিত করেছেন, শাস্ত্র পড়িয়েছেন। কিন্তু তিন ছেলের একজনেরও উপনয়ন হয় নি। উপনয়ন না হলে ব্রাহ্মণ হবে কেমন করে? কিন্তু বিট্‌ঠলপন্থ কি ব্রাহ্মণ? সমাজের চোখে চণ্ডালেরও অধম।

প্রায়শ্চিত্তের বিধান ভিক্ষা করতে গেলেন সমাজপতিদের দরবারে। তাদের ক্রূর ধিক্‌কার তিনি শুনলেন,—

সন্ন্যাস ছেড়ে এসে সংসার করছ। পুত্রকন্যার জন্ম দিচ্ছ। তোমার জীবন কুকুরের জীবন।

বিট্‌ঠলপন্থ করজোড়ে বললেন,—

আমার যা হবার তা হয়েছে। কিন্তু আমাদের এই সন্তান কটি, তারা তো কোনো অপরাধ করে নি? তাদের আপনারা দয়া করে সমাজে স্থান দিন।

খ্যা-খ্যা করে হেসে উঠল সমাজপতিরা।

তুমি নাকি মস্ত পণ্ডিত হে,— অনেক শাস্ত্রটাস্ত্র পড়েছ। আর এটুকু জানো না যে বাপের পুণ্যে সন্তানের ভাগ্য, বাপের পাপে সন্তানের শাস্তি। তুমি যে পাপ করেছ তার প্রায়শ্চিত্ত কি তোমার ছেলে করবে?

না, আমিই করব। কী প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে বলুন। যা করতে বলবেন তাই করব।

তোমার ঐ দেহ কামাচারী পশুর দেহ। দেহান্ত-প্রায়শ্চিত্তই তোমার পাপের একমাত্র প্রায়শ্চিত্ত।

মুখে আর একটি কথা নেই। ফিরে এলেন বিট্‌ঠলপন্থ। ঘরে তখন চারটি শিশু ক্ষুৎপিপাসায় কাঁদছে। অন্ন নেই, অবলম্বন নেই, তাদের বাঁচাবার কোনো উপচারই নেই। ভাগ্যহত ভ্রষ্ট সন্ন্যাসী স্ত্রীকে ডেকে বললেন,—

চলো, চরম প্রায়শ্চিত্ত আমরা বরণ করি। তাহলে নিরপরাধ শিশুদের ওপর ওদের দয়া হবে। বাপ-মা হারা হয়েই ওরা বাঁচবে।

নদীসলিলে আত্মহত্যা করলেন বিট্‌ঠলপন্থ আর রুকমাবাঈ। পুত্রকন্যাদের রেখে গেলেন কার কাছে? সমাজের কাছে। কীসের আশায়? সমাজ তাদের আশ্রয় দেবে এই আশায়।

সমাজপতিরা অট্টহাস্য করে বাপ-মা হারা তিনটি বালক আর একটি বালিকাকে গ্রাম থেকে তাড়িয়ে দিল।

পরবর্তী অধ্যায় শুনেছিলাম সেবার পৈঠানে,—দেশপাণ্ডেজীর মুখে।

গোদাবরীর ঘাটে। চওড়া ঘাট,—পাথর বাঁধানো বড়ো বড়ো সিঁড়ি। সামনে নদী। বাঁদিকে কিছুটা দূরে বালির চড়ার ওপর শাতবাহন স্তম্ভ।

দেশপাণ্ডেজী বললেন,—

বাঙালী ভাই, এই ঘাটটি বড়ো পবিত্র। জানো, এইখানে পণ্ডিতসভা বসেছিল,—এইখানেই মহিষের মুখ দিয়ে বেদের বাণী শুনিয়েছিলেন জ্ঞানেশ্বর। কাহিনীটা জানো তো?

নিরাশ্রয় নির্বান্ধব তিনটি ভাই আর একটি বোন। সমাজ থেকে স্বগ্রাম থেকে বিতাড়িত। পথই তাদের সম্বল, পথপরিক্রমাই তাদের গতি।

মধ্যম ভ্রাতা জ্ঞানেশ্বর নেতৃত্ব নিলেন,—

চলো, আমাদের পৈঠানে পৌঁছতে হবে।

হিন্দু মহিমার বিরাট কেন্দ্র পৈঠান। উত্তরে যেমন কাশী, দাক্ষিণাত্যে তেমনি পৈঠান। পৈঠানের পণ্ডিতদের বিচার সারা দেশ মেনে নেয়।

জ্ঞানেশ্বরদের আশা পৈঠানের সমাজপতিদের বিধান তাঁরা আনবেন। সেই বিধান যদি স্বপক্ষে যায় তাহলে জাতে তাঁরা উঠবেনই। তখন তাঁদের উপনয়ন ঠেকায় কে? একঘরে করে রাখার সাহস কার?

এই গোদাবরীর বিশাল ঘাটে পৈঠানের পণ্ডিত সমাজের কাছে গিয়ে তাঁরা দাঁড়ালেন।

জ্ঞানেশ্বর স্পষ্ট গলায় বললেন,—

ব্রাহ্মণ বংশে আমরা জন্মেছি, পিতার কাছে শাস্ত্র শিক্ষা করেছি। মূঢ় সমাজের নিষ্ঠুর বিধানে আমাদের বাপ-মা আত্মঘাতী হয়ে প্রায়শ্চিত্ত করেছেন। তবু কেন আমরা ব্রাহ্মণের সংস্কার অর্জন করব না? কেন একঘরে হয়ে আমাদের ঘর ছেড়ে পথে বেড়াতে হবে?

বিনয়নম্র কণ্ঠে জ্যেষ্ঠ নিবৃত্তিনাথ নিবেদন করলেন,—

আমরা অনাথ, আমরা পতিত, আমরা দীন শরণাগত,—দয়া করে আমাদের শুদ্ধ করুন, সমাজের কোলে স্থান দিন!

পণ্ডিত সমাজের সভাপতি প্রসন্ন হলেন। বললেন,—

তোমাদের নাম বলো।

পরপর নামগুলি শুনে মুচকি হেসে আবার বললেন,—

বাঃ, খাশা নাম তোমাদের। তবে এসব নামের মানে জানো?

প্রথমে বললেন সর্ব কনিষ্ঠা মুক্তাবাঈ।

পিতা আমার নাম রেখেছিলেন মুক্তা। তিনি বলেছিলেন আমি হব মুক্তির দিশারী,—আমি বন্ধন ঘোচাব, মুক্তির দ্বার খুলে দেব—তাই আমি মুক্তাবাঈ।

সোপানদেব বললেন,—

আমি হব ভক্তির সোপান। আমার জীবনাদর্শের সোপান বেয়ে কতো ভক্ত কাঙ্ক্ষিতের চরণে গিয়ে পৌঁছবে।

বললেন নিবৃত্তিনাথ,—

আমি প্রবৃত্তিকে জয় করে নিবৃত্তিকে লাভ করব,—তাই আমার নাম নিবৃত্তিনাথ।

আর তোমার নাম?

আমি জ্ঞানেশ্বর। সৃষ্টির যিনি পরম প্রাণ, অস্তিত্বের যিনি পরম ঈশ্বর, অন্তরের যিনি পরম চৈতন্য,—জ্ঞানের আলোকে তাঁকে আমি

উপলব্ধি করব,—তাঁর সঙ্গে একান্ত অদ্বৈত হব,—তাই আমার নাম জ্ঞানেশ্বর।

পণ্ডিতরা চমৎকৃত হলেন। নিতান্ত অল্পবয়সী বালক-বালিকা, নিজের নিজের নামের এমনি আশ্চর্য ব্যাখ্যা শুনিয়ে সভার সবাইকে অবাক্ করে দিল। আচ্ছা, এবার শাস্ত্র পরীক্ষা শুরু হোক। বুদ্ধি তো নামেরই মতো খাশা। দেখা যাক বিদ্যে কতোদূর!

শাস্ত্রের পরীক্ষায় তিন ভাই-ই উত্তীর্ণ হলেন। শেষ পর্যন্ত জ্ঞানেশ্বরকে নিয়ে পড়লেন পণ্ডিতরা, পরীক্ষার বদলে শাস্ত্র নিয়ে তর্কযুদ্ধ আরম্ভ হোলো। বালক অভিমন্যুকে যেমন সপ্তরথীতে ঘিরেছিল, বাঘা বাঘা শাস্ত্রজ্ঞেরা বালক জ্ঞানেশ্বরকে ঘিরে ধরলেন। সভাস্থ সকলে নির্বাক বিস্ময়ে এই অসম সমর দেখতে লাগল।

একে একে প্রতিটি রথী বালক বীরের কাছে পরাস্ত হলেন। জ্ঞানেশ্বরের তর্কশরের আঘাতে আঘাতে পর্যুদস্ত হয়ে শেষ পর্যন্ত পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ হাঁফাতে হাঁফাতে বললেন,—

ব্যস, ব্যস, অনেক হয়েছে, আর না। শাস্ত্রটাস্ত্র থাক, এবার বেশ শুদ্ধ উচ্চারণে কয়েক লাইন বেদ আওড়াও তো দেখি বাবা,—তাহলেই তোমার গলায় পৈতে ঝুলিয়ে দেব!

চমকে উঠে জ্ঞানেশ্বর বললেন,—

তার মানে?

মানে বোঝো না? সব পরীক্ষার শেষ পরীক্ষা বেদপাঠ। বেদ পড়তে পারা কি সহজ কথা? জানো, বেদে শুধু ব্রাহ্মণের অধিকার! বেদপাঠ যে করতে পারে সেই ব্রাহ্মণ!

মুখ দিয়ে কথা বার হোলো না জ্ঞানেশ্বরের। বিস্ময়ের এক চকিত প্রহারে রুদ্ধ হয়ে গেল কণ্ঠ। তারপরেই বিচিত্র এক ভাবান্তরের দোলায় দুলে উঠল তাঁর মন।

এ কী কথা? বেদপাঠ করতে পারলেই ব্রাহ্মণ? চরিত্রের প্রয়োজন নেই, নিষ্ঠার প্রয়োজন নেই, অনুধ্যান অনুভূতির প্রয়োজন

নেই? ব্রাহ্মণ কে? ব্রহ্মণি যোহিতচিত্ত যিনি তিনিই তো ব্রাহ্মণ, —আর সেই জন্যেই তো ব্রাহ্মণ সকলের বড়ো, সকলের প্রণম্য। বেদপাঠ করতে পারলেই সকলের বড়ো হওয়া যায়, সকলের প্রণাম দাবী করা যায়? আর কোনো সাধনা লাগে না? এই ছার ব্রাহ্মণত্ব লাভের জন্যেই এতো আকূতি তাঁর মনে?

কোন্ অলৌকিক নির্দেশে জ্ঞানেশ্বরের মুখ থেকে অর্ধস্ফুট স্বর বার হোলো,—

বেদপাঠ তো পশুতেও করতে পারে। তাহলে পশুতে আর ব্রাহ্মণে তফাৎ কী?

বজ্রপাত হোলো যেন। হাঁ-হাঁ করে উঠল ব্রাহ্মণের দল,—

অ্যাঁ, বলো কী? এমনি কথা তোমার মুখে, তুমি কিনা ব্রাহ্মণের উপবীত ধারণের আশা নিয়ে এসেছ!

জ্ঞানেশ্বরের মেঘগম্ভীর স্বর,—

ঠিকই বলেছি। বেদপাঠ করলেই পশু মানুষ হয় না।

এতো অবজ্ঞা, এতো দম্ভ!

তিড়বিড়িয়ে উঠল পণ্ডিতের দল।

তার মানে কী তুমি বলতে চাও?

একটি মহিষ সামনে দিয়ে যাচ্ছিল।

জ্ঞানেশ্বর তার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। সেই অবোলা জন্তুর মাথায় হাত রেখে ধীর স্বরে বললেন,—

বেদপাঠ করো।

মহিষের মুখে বেদ ধ্বনিত হোলো।

নির্বাক ব্রাহ্মণসমাজ পাথরের মতো দাঁড়িয়ে বিস্ফারিত চোখে সেই অলৌকিক দৃশ্য দেখল,—মূক মহিষের মুখে অশ্রুত বেদবাণী শ্রবণ করল। তারপর চারপাশের জনতার কেউ কেউ লুটিয়ে পড়ল কিশোর জ্ঞানেশ্বরের পদপ্রান্তে।

কে না জানে ভারত-ভগবানের মুখই হচ্ছে ব্রাহ্মণ,—আর বাহু হচ্ছে ক্ষত্রিয়, উরু হচ্ছে বৈশ্য আর চরণ হচ্ছে শূদ্র? স্বয়ং পরম ব্রহ্মের নির্দেশে সেই বদনরূপ ব্রাহ্মণের মুখ থেকে নির্গত হয়েছিল চতুর্বেদ। যেদিন ভারত-আকাশে বেদের উদ্ভাস, সেদিন থেকে বেদ-বিজ্ঞাতা ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণ ছাড়া আর কোনো জাতি কোনো বর্ণের বেদে অধিকার নেই। বেদপাঠের অধিকার এমনকি শ্রীরামচন্দ্রেরও ছিল না।

সেই চিরন্তন ধ্রুব সত্যের কিনা এই পরিণাম? ধর্মভ্রষ্ট সমাজ-ভ্রষ্ট আত্মঘাতী ঘৃণ্য পিতার দুর্মুখ বালকপুত্র,—সে বলে কিনা পশুও বেদপাঠ করতে পারে? সে কিনা জাদুবলে মহিষের মুখ দিয়ে বেদের আবৃত্তি শোনায়? ব্রাহ্মণত্বের অটল দুর্গের ভিত্তিতে ভোজবাজির ঘা মেরে ফাটল ধরাতে চায়?

এই প্রহেলিকার ফাঁদে হার মানতে পৈঠানের ব্রাহ্মণ সমাজ রাজি হোলো না। গর্জন করে উঠল,—যারা চমকের আঘাতে মাথা লুটিয়েছিল, গর্জনের ধমকে তারাও শিরদাঁড়া খাড়া করে দাঁড়াল।

না না, উপনয়নের অধিকার তোমরা পাবে না। ব্রাহ্মণ তোমরা হবে না, সমাজে ঠাঁই তোমাদের মিলবে না। দূর হও, তোমরা দূর হও।

এমনি দূর-দূর তো চিরদিনই শুনে আসছি। যেদিন জ্ঞান হয়েছে সেদিন থেকে। এমনি দূর-দূর রব শুনে শুনে বাপ-মা দূর হয়েছেন জীবন-সীমান্ত থেকে, আমরাও না হয় দূর হলাম সমাজ-সীমানা থেকে।

ব্রাহ্মণ হবার বাসনা মুহূর্তে মুছে গেল জ্ঞানেশ্বরের মন থেকে। নিজের অভূতপূর্ব লীলায় তিনি নিজেই অভিভূত হয়েছেন। চকিত আত্মোপলব্ধি এক মহান্ আত্মবিকাশের পথে আঙুল দেখিয়েছে।

পৈঠানের ব্রাহ্মণ সভা থেকে বিতাড়িত হলেন জ্ঞানেশ্বর। গোদাবরীর তীরে তীরে হাঁটলেন,—সঙ্গে দাদা নিবৃত্তিনাথ আর ছোট ভাই-বোন সোপান আর মুক্তা।

পৈঠানের গোদাবরী ঘাটে দাঁড়িয়ে কাহিনীর শেষ করলেন দেশপাণ্ডেজী,—

আর তাঁরা কখনো এই পৈঠানে এলেন না।

॥ ৪ ॥

জ্ঞানেশ্বরজীর জীবনীর আর এক অধ্যায় আমার কাছে বিবৃত করেছিলেন দেশপাণ্ডেজীর মতো আর এক পথে পাওয়া বন্ধু,—ব্রহ্মগিরির পূর্ণ চৈতন্য মহারাজ। তাঁরই নির্দেশে এবার আলন্দীতে এসেছি।

সহ্যাদ্রি পর্বতমালার ব্রহ্মগিরি শিখরে দক্ষিণগঙ্গা গোদাবরীর উদ্ভব। শিখরের সানুতে জ্যোতির্লিঙ্গ ত্র্যম্বকেশ্বর আসীন। শীতের এক কঠিন প্রত্যুষে একবার আমি বুকে হেঁটে ব্রহ্মগিরির চূড়ায় উঠেছিলাম।

গোদাবরীর উৎসবারি স্পর্শ করে পাহাড়ের গায়ে গঙ্গাদ্বার মন্দিরে গোদাবরীর মর্মর মূর্তি দর্শন করলাম। তারপর অন্য পূজার্থীদের মতো আমারও সমতলে ত্র্যম্বকেশ্বর তীর্থে নেমে যাওয়ার কথা। কিন্তু তা হয়নি। গঙ্গাদ্বার থেকে কয়েক ধাপ নিচে ব্রহ্মাসাবিত্রীর মন্দির। সেই মন্দিরে সাধু পূর্ণ চৈতন্যজীর সঙ্গে দেখা। কদিন তাঁর আশ্রমে তিনি আমাকে ধরে রেখেছিলেন।

মহারাজের সঙ্গে সমস্ত ব্রহ্মগিরি আমি পরিক্রমা করেছিলাম। শুধু আহার আর আশ্রয় নয়,—নানা সদালোচনায় আমার মন তিনি ভরে দিয়েছিলেন। আবার ত্র্যম্বকেশ্বরে নেমে এসে দিয়েছিলেন বিদায়। পথে নিবৃত্তিনাথ মন্দির।

সেই নিবৃত্তিনাথ? আলন্দীর বিট্‌ঠলপন্থের বড়ো ছেলে? জ্ঞানেশ্বরের বড়ো ভাই?

হ্যাঁ, সেই নিবৃত্তিনাথ,—বলেছিলেন পূর্ণচৈতন্যজী।

তাঁর সমাধি এখানে কেন?

গুরুকা চরণ যোগীকা শরণ। এই তো নিবৃত্তিকা নিবৃত্তির যোগ্য স্থান।

তার মানে?

শুনলাম নিবৃত্তিনাথের গুরুলাভের কাহিনী, সেই সমাধি মন্দিরে বসে।

নিতান্ত বালক তখন নিবৃত্তিনাথ, একবার বিট্‌ঠলপন্থ এলেন ব্রহ্মগিরি তীর্থে। সঙ্গে পরিবারের সবাই,—স্ত্রী রুকমাবাঈ, তিন ছেলে নিবৃত্তি, জ্ঞান, সোপান আর ছোট মেয়ে মুক্তা। কুশাবর্ত কুণ্ডে স্নান করলেন, ত্র্যম্বকেশ্বরের মন্দিরে পুজো দিলেন তারপর দল বেঁধে উঠতে লাগলেন ব্রহ্মগিরি পাহাড়ে।

ব্রহ্মগিরির সানু থেকে গঙ্গাদ্বার পর্যন্ত পাথর-বাঁধানো সাতশো ধাপের সিঁড়ি উঠে গেছে। বিট্‌ঠলপন্থের আমলে তার একটি ধাপও ছিল না। দুধারে গভীর বন,—মাঝে মাঝে আঁকাবাঁকা পায়ে চলার খাড়াই পথ। সেই পথ ভেঙে ব্রহ্মগিরির চূড়ায় উঠল যাত্রীরা। উৎসতীর্থের জল অঞ্জলি ভরে মাথায় নিল। পূজা দিল গঙ্গাদ্বারে। তারপর পাহাড়ের গায়ে গায়ে ছায়াঢাকা পথে পথে এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াল সারাদিন।

দিন কাটল। সূর্য বসল পাটে। ছায়াশীতল পাকদণ্ডীর রেখা মিলিয়ে আসছে। ছায়াঘন বনের কিনারে কিনারে অন্ধকার নিবিড় হচ্ছে। ছায়াভরা গাছের মাথায় মাথায় নীড়ে ফেরা পাখীদের পাখা-ঝাপটানি। আর দেরি নয়, এবার পাহাড় থেকে নামতে হবে।

সন্তর্পণে নামতে লাগলেন বিট্‌ঠলপন্থ। সামনে মুক্তার দুহাত ধরে জ্ঞান আর সোপান। মাঝখানে নিজে আর স্ত্রী। পেছনে বড়ো ছেলে নিবৃত্তি।

পাকদণ্ডীর বাঁকে বাঁকে এগিয়ে চলেছেন, স্ত্রীকে ফেলে কয়েক পা এগিয়ে একটা বাঁক নিয়েছেন,—হঠাৎ কানে এল চিৎকার।

রুকমাবাঈ ডাকছেন,—

নিবৃত্তি, নিবৃত্তি ?

কোথায় নিবৃত্তি ? নিবৃত্তি নেই। পথের কোন্ বাঁকে পথ ভুলে এগিয়ে গেছে ছেলে,—আবার কোন্ বাঁক ঘুরে অদৃশ্য হয়েছে। ডেকে ডেকে গলা চিরে গেল। সে ডাক নিবৃত্তির কাছে পৌঁছল না। বন পাহাড় আর অন্ধকার নিবৃত্তিকে গ্রাস করল।

ত্র্যম্বকেশ্বর মন্দিরে এসে আছড়ে পড়লেন সবাই। জ্যোতির্লিঙ্গের পায়ে হত্যে দিয়ে পড়ে রইলেন রুকমাবাঈ।

চারদিন পরে পাহাড় থেকে নেমে এল নিবৃত্তি। হাউহাউ করে কেঁদে উঠে হারানিধিকে মা বুকে জড়িয়ে ধরলেন। মাথায় হাত রেখে বাবা বললেন,—

পথ হারিয়ে কোথায় চলে গিয়েছিলি বাপ ?

মার আলিঙ্গন থেকে ধীরে মুক্ত হোলো নিবৃত্তিনাথ। গভীর কোমল গলায় বাপকে বললে,—

পথ তো হারাই নি, পথ খুঁজে পেয়েছি।

মিষ্টি হেসে পূর্ণচৈতন্য একটু থামলেন। তারপর শুধোলেন আমাকে,—

ক্যায়া হুয়া মালুম ? ক্যায়সে পন্থ মিলা নিবৃত্তিকা ?

আমি না জানার ভঙ্গিতে মাথা নাড়লাম।

সাধু বললেন,—

নাথসম্প্রদায়ের মহাগুরু গোরক্ষনাথ। তাঁর সাক্ষাৎ শিষ্য ছিলেন গহিনীনাথ। এই ব্রহ্মগিরিতে গুরুধ্যান করতেন গহিনীনাথ,—উন্‌কা দর্শন মিলা নিবৃত্তিকা।

পথভোলা নিঃসঙ্গ কিশোরের সামনে আবির্ভূত হয়েছিলেন নাথগুরু গহিনীনাথ। আচম্বিতে গুরুলাভ করেছিলেন নিবৃত্তি। গুরু তাঁকে মন্ত্রদীক্ষা দিয়েছিলেন। দীক্ষান্তে দিয়েছিলেন পথের সন্ধান। সেই পথ বেয়ে নিবৃত্তিনাথ নেমে এসেছিলেন ব্রহ্মগিরি থেকে সংসারের উপত্যকায়।

সংসারের পথে পথে মানুষের হাটে হাটে যাত্রা। সঙ্গে মন্ত্রশিষ্য জ্ঞানেশ্বর। কখনো বা ছোট ভাই-বোন সোপান আর মুক্তাবাঈ। প্রবৃত্তির সংযম, আর নিবৃত্তির আরাধনা, সংসারবাসীকে এই শিক্ষাদান।

তারপর একদিন শেষ হোলো সংসারের পথ-পরিক্রমা। এবার গুরু গহিনীনাথ তাঁকে ডাকছেন,—ডাকছে অরণ্য, ডাকছে সেই মন্ত্রপবিত্র শৃঙ্গপীঠ। নিবৃত্তিনাথ সমাধি নিলেন ব্রহ্মগিরির সানুছায়ায়,—গুরুর পদতলে।

পর পর তিনটি নদীর উৎসতীর্থে সেবার আমি গিয়েছিলাম। কৃষ্ণানদীর উৎস মহাবলেশ্বর, ভীমানদীর উৎস ভীমশংকর আর গোদাবরীর উৎস ব্রহ্মগিরি ত্র্যম্বকেশ্বর। তিনটি উৎসই মহাতীর্থ, তিন তীর্থেই জ্যোতির্লিঙ্গের উদ্ভাস।

দাক্ষিণাত্যের আর এক নদী নর্মদা। এ নদীর যাত্রা উল্‌টোদিকে, পূব থেকে পশ্চিমে। বিন্ধ্যের মেকল পর্বতশিখরে নর্মদার উদ্‌গম, সংগম আরব সমুদ্রে। কয়েকবছর আগে সাধুসঙ্গের সুযোগ নিয়ে নর্মদার তীরে তীরে আমি কিছুদিন ঘুরে বেড়িয়েছিলাম। সেকথা ব্রহ্মগিরির পূর্ণচৈতন্য মহারাজকে বলেছিলাম।

নিবিষ্টমনে ভ্রমণবৃত্তান্ত শোনার পর পূর্ণচৈতন্য বললেন,—

পরিক্রমা করতে চাও আর একবার? পায়ে হেঁটে?

আমি মাথা নেড়ে বলেছিলাম,—

নিশ্চয়ই। আপনি একটু হদিস দিন না?

হেসে বলেছিলেন,—

এ পরিক্রমার শুরু কিন্তু নদীর উৎসতীর্থে নয়,—সংস্কৃতির উৎসতীর্থে, সাধনার উৎসতীর্থে। এ পরিক্রমা নদীর ধারার পাশে পাশে নয়, সংস্কৃতির ধারার পাশে পাশে,—নদীর ঘাটে ঘাটে নয়, লোক-হৃদয়ের ঘাটে ঘাটে। যাবে?

বড়ো বিস্মিত আর আগ্রহী হয়েছিলাম তাঁর কথায়।

সে উৎসতীর্থ কোথায় মহারাজ ?

আলন্দীতে। আর সেই উৎসকে জাগ্রত করেছেন জ্ঞানেশ্বর।

আবার জ্ঞানেশ্বর-লীলা। এবার পূর্ণ চৈতন্যের মুখে।

আমি শুধিয়েছিলাম,—

আপনি বললেন নিবৃত্তির মন্ত্রশিষ্য জ্ঞানেশ্বর। কিন্তু নিবৃত্তি তো জ্ঞানেশ্বরের দাদা, তাই না ?

হ্যাঁ তাই। জ্ঞানেশ্বরের ব্রাহ্মণ হওয়া হয়নি জানো তো ?

হ্যাঁ জানি, পৈঠানের ব্রাহ্মণ সমাজ তাঁকে তাড়িয়ে দিয়েছিল।

ঠিক, তারপর কী হোলো শোনো।

এবার জ্ঞানেশ্বরজীর মন্ত্রলাভের কাহিনী শুনলাম।

পৈঠানের পথে নেতৃত্ব নিয়েছিলেন জ্ঞানেশ্বর। অনেক আশায় অনেক বিশ্বাসে তিনি ভাইবোনদের আগে আগে হেঁটেছিলেন, পথ দেখিয়ে দেখিয়ে চলেছিলেন।

সে আশা চূর্ণ হয়েছে। সে বিশ্বাস অন্ধকার। অন্ধকার সমাজের পথ, অন্ধকার নদীপারের দিগন্ত। কে পথ দেখাবে আর ?

সামনে আছেন জ্যেষ্ঠ নিবৃত্তিনাথ। তাঁর উন্নত কপাল আর গভীর দৃষ্টি শেষ সূর্যের রশ্মিতে জ্বলজ্বল করছে। জ্ঞানেশ্বরের আর্ত-আকুল চোখ জ্যেষ্ঠের নয়নে এসে মিলল। মুহূর্তে পায়ে লুটিয়ে পড়লেন জ্ঞানেশ্বর।

দাদা দাদা, আমাদের যে ব্রাহ্মণ হওয়া হোলো না।

নিবৃত্তি মৃদু হেসে বললেন,—

না হোক, তাতে উতলা হবার কিছু নেই। এতোদূর আমরা এসেছি, আরো এগোবার পথ আমরা পাবই।

কিন্তু ব্রাহ্মণের মন্ত্র ?

ব্রাহ্মণের মন্ত্র সমাজের মন্ত্র, জীবনের মন্ত্র নয়। সংস্কারের মন্ত্র, সাধনার মন্ত্র নয়। শোকে দুঃখে আমার গুরুকে আমি ভুলেছিলাম, কিন্তু মন্ত্রকে ভুলিনি। আমার গুরু গহিনীনাথ, তাঁর দেওয়া মন্ত্র আমার বুকের মধ্যে আছে।

সে মন্ত্রে কি ব্রহ্মকে পাওয়া যায় ?

শুধু পাওয়া যায় না ভাই, ব্রহ্ম হওয়া যায়।

নিবৃত্তিনাথ জ্ঞানেশ্বরের থেকে মাত্র দু-বছরের বড়ো। জ্ঞানেশ্বর কৃতাঞ্জলিপুটে দাদার কাছে প্রার্থনা করলেন,—

আমি জ্ঞানহীন, দীনাতিদীন নিবৃত্তিদাস,—আমাকে জ্ঞান দিন, মন্ত্র দিন।

জ্ঞান চাই। এমন মন্ত্র চাই, যে মন্ত্র হবে জ্ঞানমন্ত্র। কিসের জ্ঞান ? ব্রহ্মার জ্ঞান, ব্রহ্মজ্ঞান। কথা দিয়েছ মন্ত্র দেবে,—এমন মন্ত্র দেবে যাতে ব্রহ্মকে জানা যায়, ব্রহ্ম হওয়া যায়। সেই মন্ত্র দাও।

এই কামনা ছিল নিবৃত্তিনাথেরও মনে যখন ব্রহ্মগিরির অরণ্যে গুরু গহিনীনাথের দেখা তিনি পেয়েছিলেন। সেই কামনার প্রতিধ্বনি আবার তিনি কানে শুনছেন। সেই সঙ্গে প্রাণে বাজছে গুরুর অমৃতবাণী।

ব্রহ্ম নাকি নির্গুণ। তিনি নির্বিশেষ, বিশেষণের শৃঙ্খলে তিনি আবদ্ধ নন। তিনি অখণ্ড মণ্ডলাকার,—শূন্যমণ্ডল হয়েই তিনি নিরাকার। রূপে তিনি চিত্রিত নন, স্পর্শে তাঁকে মেলে না। তিনি নিরীন্দ্রিয়। স্তোত্রবন্দনা তাঁর কানে পৌঁছয় না। তাঁর ঘ্রাণে আসে না পুষ্পনির্মাল্যের সুরভি। চোখে পড়ে না আরতির দীপালোক।

কিন্তু আবার সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম। সবই ব্রহ্ম, যা দেখছি, যা শুনছি, যা স্পর্শ করছি। তিনি আকাশ, তিনি মাটি। তিনি জল, তিনি বাতাস, আলো তিনি, অন্ধকারও তিনি। জড়ও তিনি, চেতনও তিনি। তিনি অতীন্দ্রিয়, তাই ধ্যানে তাঁকে উপলব্ধি করব। ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্যতাতেও তিনি,—তাই পঞ্চেন্দ্রিয়ের প্রদীপ জ্বেলে তাঁকে অনুভব করব।

যোগে উপলব্ধি, ভোগে আস্বাদন। তাঁকে ধরতে হবে, তাঁকে ভোগ করতে হবে, তাঁতে বিলীন হতে হবে। সোঽহং তত্ত্বমসি,—তিনিই আমি, তিনিই তুমি। তুমি ব্রহ্ম, আমি ব্রহ্ম,—তাইতো

তোমাতে আমাতে আস্বাদনের লীলা। সেই তো ব্রহ্মোপলব্ধি। জগৎ ব্রহ্ম, জীব ব্রহ্ম, তাই তো জীবজগতের সঙ্গে অহং ব্রহ্মের সাজুয্য,—সেই হোলো আত্মোপলব্ধি।

তিনি রূপাতীত, রূপের মাধুরীতে তাঁকে সাজাতে হবে। তিনি অনির্বচনীয়,—নামবচনের মালা গেথে তাঁর গলায় পরাতে হবে। তিনি অনন্তমণ্ডলের অধিপতি,—মনোমণ্ডলের সিংহাসনে তাঁকে বসাতে হবে। তিনি নিরাকার,—জগৎসভায় তাঁকে বরণ করতে হবে।

যে আহ্বানে তিনি সাড়া দেবেন সে আহ্বান জ্ঞানের নয়, ভক্তির আহ্বান। যে ডাক তাঁর কানে পৌছবে, সে ডাক যোগের নয়, প্রেমের ডাক। সে ডাকে তাঁরই জয়ধ্বনি।

গহিনীনাথের মন্ত্র যোগের মন্ত্র আর নিবৃত্তিনাথের মন্ত্রে যোগের সঙ্গে ভক্তিপ্রেমের সমন্বয়।

প্রথমে জ্ঞানেশ্বর, পরে সোপানদেব আর মুক্তাবাঈ। তিন ভ্রাতা-ভগ্নীর গুরু হলেন কিশোর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নিবৃত্তিনাথ। একই মন্ত্র দিলেন একে একে শিষ্যদের কানে,—

জয় জয় বিট্‌ঠল রামকৃষ্ণ হরি!

প্রবরা নদীর তীরে নেবাস নামে একটি গ্রাম। সেই গ্রামের উপকণ্ঠে আশ্রয় নিলেন তিন ভাই-বোন। সমাজ-নিরপেক্ষ সংসার-নিরাসক্ত সন্ন্যাসীর জীবন তাঁরা গ্রহণ করলেন।

পাতায় ছাওয়া কুটীরে তাঁরা থাকেন। নিভৃত অঙ্গনের মাঝখানে একটি শিশু তরুর পাশে স্তব্ধ হয়ে ধ্যান করেন নবীন গুরু নিবৃত্তিনাথ আর তাঁকে ঘিরে তাঁর তিন কিশোর শিষ্য-শিষ্যা মৃদু গম্ভীর রবে মন্ত্র জপ করে,—

জয় জয় বিট্‌ঠল রামকৃষ্ণ হরি!

উচ্চকোটি সমাজের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই তবে গ্রামপ্রান্তের সহজ মানুষরা তাঁদের খোঁজ রেখেছে। তারা চাষী, কামার, কুমোর,

তাঁতী। ঐ নিষ্পাপ সরল উদাসীন ছেলেমেয়েগুলির দিকে তাদের নজর পড়েছে।

ওরা কারা গো? ওদের কি কেউ নেই? না, নেই। আচ্ছা, বাপ নেই, মাও নেই? বাপ-মা ছিল বৈকি একদিন, এখন আর কেউ নেই। বনের মধ্যে কুঁড়ে বেঁধে বাস করছে কেন? ওদের কি ঘর নেই? ঘর ছিল বৈকি একদিন,—কিন্তু সমাজ ওদের ঘরছাড়া করেছে। কিন্তু ওরা ধ্যান করে, জপ করে, মন্ত্র পড়ে। তাহলে? ওরা কি ব্রাহ্মণ-সন্তান নয়? ব্রাহ্মণ-সন্তান হলে কী হবে, ওরা ব্রাহ্মণ নয়। তার মানে? মানে খুবই সহজ,—ওরা তোমার আমারই মতো সাধারণ মানুষ, মাটির মানুষ। চলো ওদের কাছে যাই, ওদের কাজ করে দিই।

নিবৃত্তিনাথ ধ্যান ভঙ্গ করে জ্ঞানেশ্বরকে ডাক দিলেন,—

মর্মের গভীরে মন্ত্রকে সন্নিবিষ্ট করেছ,—এবার কাজ করতে হবে।

কী কাজ করব? কাদের জন্যে কাজ করব?

ঐ সাধারণ মানুষরা, যারা তাঁদের অন্ত্যজ অস্পৃশ্য করে রাখেনি। তারা আশ্রয় দিয়েছে, বাড়িয়েছে সাহায্যের হাত। কেউ দিয়েছে অন্ন, কেউ দিয়েছে বস্ত্র, কেউ দিয়েছে মাটির একটি পাত্র। কেউ পাশে এসে বসেছে,—দিয়েছে সঙ্গ, দিয়েছে প্রীতি। তাদের ঋণ শোধ করতে হবে,—কাজ করতে হবে তাদের জন্যে।

নিবৃত্তি তীব্র কণ্ঠে বললেন,—

পৈঠানে মহিষের মাথায় হাত রেখে সেই মূঢ় মূক জীবকে দিয়ে বেদ পড়িয়েছিলে কেন?

চমকে উঠলেন জ্ঞানেশ্বর।

উচিত ধমক দিয়েছেন গুরু। সিদ্ধ কবে হবে ঠিক নেই, আগে-ভাগেই সিদ্ধাই দেখাতে শুরু করেছ? জ্ঞানেশ্বর মুখ নিচু করে বললেন,—

ও তো একটা প্রতীক মাত্র। ঐ প্রতীকের মধ্যে দিয়ে আমি ঘোষণা করেছিলাম—বেদে শুধু ব্রাহ্মণের অধিকার একথা মিথ্যা।

(বেদ যদি ঈশ্বর-নিঃসৃত বাণী হয় তাহলে তার অধিকারী সর্ব মানুষ,—কেননা ঈশ্বর শুধু ব্রাহ্মণের সম্পত্তি নন, তিনি সর্ব জীবের সৃষ্টিকর্তা।)

তাহলে তোমার ঘোষণাকে কাজের মধ্যে সার্থক করো।

কী ভাবে প্রভু?

ভারতে সর্ববেদার্থো ভারতার্থশ্চ কৃৎস্নশঃ।
গীতায়ামস্তি তেনেয়ং সর্বশাস্ত্রময়ী গীতা॥

বেদের সারার্থ মহাভারতে আর মহাভারতের সারতত্ত্ব গীতায়। গীতা সর্বশাস্ত্রময়ী। এই গীতাকে তুমি সাধারণ মানুষের হৃদয়তটে প্রবাহিত করে দাও!

নিজের জীবন দিয়েই জ্ঞানেশ্বর দেখেছেন উচ্চনীচের বর্ণভেদ কেমন করে জাতীয় ঐক্যকে পঙ্গু করছে ব্যর্থ করছে। উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণরা কেমন করে সাধারণ দেশবাসীর ওপর শাসন আর শোষণের পাকা ব্যবস্থা করে রেখেছে।

ওদের হাতের প্রধান অস্ত্র সংস্কৃত ভাষা। শোষক আর শোষিত, শিক্ষিত আর অশিক্ষিত, ধনী আর দরিদ্র, উঁচু জাত আর নিচু জাত,—দুইএর মাঝখানে এই সংস্কৃত ভাষাব ব্যবধান। আপামর জনসাধারণ যে ভাষায় ভাববিনিময় করে সে ভাষা এক। আর মুষ্টিমেয় উচ্চকোটি যে ভাষায় ন্যায়ধর্মেব বিধান দেয় সে ভাষা আর এক। সাধারণে সে ভাষা বোঝে না, সে ভাষা শেখার সুযোগ পায় না। অথচ সেই ভাষা তাকে ভোলায়, তাকে ভয় পাওয়ায়। পরম কারুণিক ঈশ্বরকেও সেই ভাষার জালে বন্দী করে রেখেছে।

সংস্কৃতের শৃঙ্খল থেকে ভগবানকে মুক্তি দিতে হবে, তবে না ভগবান মানুষের কাছাকাছি আসবেন? সংস্কৃতের অর্গল থেকে মানব-মনকে মুক্ত করতে হবে, তবে না মানুষ ভগবানের কাছে এগোবে? তবেই না ভগবানের মুক্ত আকাশের নিচে মানুষে মানুষে মিলবে?

নিবৃত্তিনাথ নির্দেশ দিলেন।

জ্ঞানেশ্বর বললেন,—

গীতা পরম মাতৃকা। শ্রীগুরুনির্দেশে মাতৃভাষায় আমি মাতৃ-বন্দনা করছি। সন্তানের মুখে যে ভাষা প্রথম ফোটে, সেই ভাষায় আমি গীতার ব্যাখ্যা করছি। গীতা বেদার্থসার। এই সাগরের গহন তত্ত্বে বেদেরও মতিভ্রম হয়। এই বেদার্থ-সাগরের ব্যাখ্যায় আমার মতো ক্ষুদ্র মন্দমতি মূর্খের সাহস কোথায়? সাহস শ্রীগুরুভরসা। পরশমণি লোহাকে সোনা করে, অমৃত করে মৃতের জীবনদান। সেই পরশমণি গুরু নিবৃত্তিনাথের উপদেশ, সেই অমৃত তাঁর আশীর্বাদ। তাঁর ভরসায় আমি এই দুরূহ ব্রতে ব্রতী হয়েছি।

ব্রত সম্পূর্ণ হোলো। জ্ঞানেশ্বর মারাঠী ভাষায়, রচনা করলেন গীতা জ্ঞানেশ্বরী। লোকভাষায় শ্রীমদ্‌ভগবৎগীতার প্রথম অনুবাদ ও সুগভীর বিশদ আলোচনা।

গুরু নিবৃত্তিনাথ বললেন,—

গীতার লোকললিত ভাষ্য তুমি রচনা করেছ। পাহাড়ের চূড়া থেকে যেমন নদী নেমে আসে, তেমনি এই ভাষ্যধারা লোকমানসকে অভিষিক্ত করুক। এবার তুমি স্বাধীনভাবে দর্শনের তত্ত্ব বিশ্লেষণ করো।

জ্ঞানেশ্বর রচনা করলেন অমৃতানুভব। মারাঠী ভাষায় হিন্দু দর্শনের সহজবোধ্য পরিচিতি। সাধারণ মানুষের প্রাণে ছড়িয়ে দিলেন অমৃতের অনুভূতি।

তারপর গুরু বললেন,—

এবার তুমি শুধু গান গাও। গানের মধ্যে তুমি বন্দনা করো প্রভুকে।

জয় জয় বিট্‌ঠল রামকৃষ্ণ হরি,—নামগান করতে করতে জ্ঞানেশ্বর তীর্থ পরিক্রমায় বার হলেন।

পৌঁছলেন পান্ধারপুরে।

দর্শন করলেন পুণ্ডলিক প্রতিষ্ঠিত পান্ধারীনাথ বিট্‌ঠলদেবকে।

॥ ৫ ॥

ইন্দ্রায়ণীর তীর।

উৎসতীর্থ আলন্দী। পূর্ণ চৈতন্যজীর নির্দেশে এসেছি। যদি আসো, এলে ভালো হয়,—এমনি আমতা কথা তিনি আওড়ান নি। সোজা বলেছিলেন,—আসতেই হবে। আমি তোমাকে সঙ্গে নিয়ে যাব সংস্কৃতির পরিক্রমায়।

কবে আসতে হবে মহারাজ?

আশ্বিন মাসে। একটি তিথি উল্লেখ করে বলেছিলেন,—বরং তার কদিন আগে, পরে নয়।

তাই এসেছি। পূজার সময়টা ছিলাম পুনায়। বঙ্গদেশে জগজ্জননী দুর্গা এসেছেন,—অঙ্গনে বেজেছে মাতৃ-আহ্বানের ঢাক। আমার প্রবাসী মন শিবানীর পূজা করেছিল পার্বতী-মন্দিরে। তারপর সময় থাকতে থাকতেই আলন্দীতে এসে পৌঁছেছি। উৎসে এসেছি, এবার ধারায় ধারায় ভাসব। তরঙ্গে দুলে দুলে ভেসে ভেসে এগোব। মহারাজকে একবার পেলে হয়।

সেই তরঙ্গ ফুঁসে ফুঁসে উঠছে। জোয়ার লেগেছে অগণিত মানুষের হৃদয়-সমুদ্রে। সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো হৃদয়ের ঢেউ আছড়ে আছড়ে পড়ছে। বিরাম নেই, বিশ্রাম নেই। সকাল থেকে সন্ধ্যা, রাত থেকে দিন।

কোন্ তটে? কোন্ কূলে? জ্ঞানেশ্বরজীর চরণমূলে।

ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ। ১২৭৫ খ্রীষ্টাব্দে জন্ম, ১২৯৬-তে তিরোভাব। মাত্র একুশ বাইশ বছরের আয়ু। যৌবন আসতে না আসতেই জিতেন্দ্রিয় জীবনের অবসান। যা করেছেন শৈশব থেকে কৈশোরের মধ্যে। তপস্যা করে যোগসিদ্ধ হয়েছেন, সাধনা করে ভক্তিসিদ্ধ হয়েছেন। লোকভাষাকে উন্নত করেছেন, লোকধর্মকে জাগ্রত

করেছেন, লোক-জাতীয়তাকে উদ্বুদ্ধ করেছেন। রচনা করেছেন গীতাভাষ্য জ্ঞানেশ্বরী, যোগচুম্বক চাঙ্গদেব পাশস্তি, দর্শনগ্রন্থ অমৃতানুভব আর অসংখ্য অভঙ্গগীতি। অন্তরে যোগ, বুকে ভক্তি আর কণ্ঠে মানবপ্রেমের গান নিয়ে ভ্রমণ করেছেন সারা দেশে,—লোক-হৃদয়ে অবর্ণনীয় আশ্বাস আর আবেগের সঞ্চার করেছেন।

জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ আর কর্মযোগ,—এই তিন যোগে সমন্বিত যে যোগী, তিনি রাজযোগী। তেমনি যোগী ছিলেন জ্ঞানেশ্বর মহারাজ। সাতশো বছর পরেও তাঁর রাজমহিমা অপরিম্লান। তাঁর সমাধি-মন্দিরে আজও সহস্র ভক্তের আত্মনিবেদন।

কিন্তু রাজারও রাজা থাকেন। তিনি রাজাধিরাজ। তিনি শ্রীবিট্‌ঠলদেব। জ্ঞানেশ্বর মহারাজের আত্মনিবেদন তাঁরই শ্রীচরণে। যতো সাধনা,—তার লক্ষ্য ঐ বিট্‌ঠলচরণ। যতো ভ্রমণ তা ঐ বিট্‌ঠলকে কেন্দ্র করে। যতো গান,—তা ঐ বিট্‌ঠলেরই জয়গান। তিনিই বিষ্ণু, তিনিই রামকৃষ্ণ হরি,—তিনিই মানবাত্মার প্রার্থিত পরমাত্মা। তিনিই পথের শেষ, বন্ধনের মুক্তি, আকাঙ্ক্ষার পরিপূর্ণতা।

কতোবার এসেছেন পান্ধারপুরে। আবার বিট্‌ঠলজীর নির্দেশ নিয়ে কতোবার গেছেন দূর-দূরান্তের তীর্থযাত্রায়। সব যাত্রা শেষ করে শেষবারের মতো পান্ধারপুরে এলেন। কর্মময় জীবনের সমস্ত শ্রমভার, জ্ঞানময় জীবনের সমস্ত বোধি আর ভক্তিময় জীবনের সমস্ত আকূতি—এবার সবকিছু সমর্পণ করতে হবে। প্রতিদিনের আত্ম-নিবেদন মাত্র নয়—শেষ দিনের আত্মাঞ্জলি।

সেদিন কার্তিকের শুক্লা একাদশী। বিট্‌ঠলদেবের মহাপূজার দিন। অসংখ্য ভক্তের সমাগম। জ্ঞানেশ্বর এসেছেন শুনে চেনা-অচেনা আরো অসংখ্য লোক ছুটে আসছে তাঁকে দেখতে। তাঁর কাব্যসুধা আস্বাদন করতে। তাঁর অমৃতবাণী শুনতে।

কিন্তু জ্ঞানদেব কাউকে চিনতে পারছেন না। নিত্য পরিচিতদের

মুখও অচেনা। চেনা কেবল একটি মুখ, একটি প্রাণের সঙ্গে শুধু যোগ,—সে মুখ সে প্রাণ পরমপ্রিয় বিট্ঠলদেবের।

জ্ঞানদেব বলেছেন,—

ভাবেঁ বীণ ভক্তি, ভক্তি বীণ মুক্তি।
বলেঁ বীণ শক্তি, বোলুঁ নয়ে॥

বল বিনা শক্তি হয় না, তেমনি ভাব বিনা ভক্তি হয় না, আর ভক্তি ছাড়া মুক্তি হয় না। মুক্তিই পরমারাধ্য আর ভক্তিই মুক্তির পথ।

ত্রিবেণী সঙ্গমী নানা তীর্থ ভ্রমী।
চিত্ত নাহীঁ নামীঁ, তরি তেঁ ব্যর্থ॥

ত্রিবেণীসংগমে স্নান করলাম, নানা তীর্থ ভ্রমণ করলাম, যাগযজ্ঞ নানা ধর্মসংস্কার পালন করলাম,—সব কিন্তু ব্যর্থ হোলো।

জপ তপ কর্ম, ক্রিয়া নেম ধর্ম।
হরী বিনেঁ নেম নাহীঁ দুজা॥

জপতপ ক্রিয়াকর্ম কিছুই ধর্ম নয়,—হরিনামই সব, হরিনামই ভক্তিব মন্ত্র, মুক্তির পথ।

পথের প্রান্তে পৌঁছেছেন জ্ঞানেশ্বর। নির্নিমেষ চোখে তাকিয়ে আছেন বিট্ঠল মুখপানে। বাহ্যজ্ঞান নেই, নিস্পন্দ দেহ, দুচোখ শুধু জলে ভেসে যায়, স্ফুরিত অধর শুধু অনির্বাণ ঘোষণা করে,—

জয় জয় বিট্ঠল রামকৃষ্ণ হরি।

একদিন দুদিন করে কাটল পাঁচটি দিন,—একাদশী থেকে পূর্ণিমা। পাঁচ দিন পাঁচ রাত বাহ্যজ্ঞান বিরহিত হয়ে একাগ্রচিত্ত হয়ে বিট্ঠল নাম করলেন। পৌর্ণমাসীর চন্দ্র যেমন সারা আকাশকে ভরে দেয়, তেমনি বিট্ঠলের আলোক-জ্যোতিতে কানায় কানায় ভরে উঠল অন্তরের চক্রবাল।

উঠে দাঁড়ালেন জ্ঞানেশ্বর। পিছন ফিরে মন্দিরদ্বারের দিকে তাকালেন। টলমল করছে পা, কাঁপছে সারা অঙ্গ। অস্ফুটস্বরে বললেন,—

এবার আমাকে যেতে হবে।

একপাশে দাঁড়িয়েছিলেন অগ্রজ গুরু নিবৃত্তিনাথ আর একপাশে অপ্রতিম বন্ধু নামদেব। নামদেব তাড়াতাড়ি তাঁর বাহু চেপে ধরলেন।

জ্ঞানেশ্বর আবার বললেন আপন মনে,—এবার আমি যাই!

নিবৃত্তিনাথ তাঁর কাঁধ স্পর্শ করে শুধোলেন,—কোথায় যাবে?

কোথায়? কেন,—মাতৃক্রোড়ে।

জীবন্মুক্ত জ্ঞানেশ্বর। প্রাণ তিনি সঁপেছেন প্রাণারাম হৃদয় দেবতার পাদপদ্মে—এখন যেখানে দেহের সূচনা সেখানে ফিরে যাবে দেহ। আর কোনো কথা নয়,—নির্বাক জ্ঞানেশ্বর স্খলিত পায়ে হেঁটে চললেন পান্ধারপুর থেকে আলন্দীতে। সঙ্গে চললেন দুই ভাই আর বোন। আর নামদেব। পিছনে পিছনে চলল পদযাত্রী ভক্তদল।

কৃষ্ণা একাদশীর দিন পৌঁছলেন মাতৃভূমি আলন্দীতে। সেই ইন্দ্রায়ণী নদী যার ঘাটে জননী রুকমাবাঈ প্রতিদিন স্নান করতে আসতেন, সেই স্বর্ণপিপুল গাছ যার নীচে দাঁড়িয়ে তিনি সন্তানলাভের আশীর্বাদ পেয়েছিলেন। অদূরে সিদ্ধনাথ মহাদেবের মন্দির। যে মন্দিরে প্রতিদিন পূজা দিতেন পিতা বিট্‌ঠলপন্থ। জ্ঞানেশ্বরের ভাব-বিহ্বল নয়ন একবার যেন সবকিছু চিনতে পারল। তারপরই স্থির হয়ে গেল আঁখিতারা।

নিবৃত্তিনাথের বুঝতে বাকি ছিল না। মন্দিরের সামনে এক গুহা। সেই গুহার মধ্যে জ্ঞানেশ্বরকে তিনি নিয়ে গেলেন। একে একে রুদ্ধ হোলো ইন্দ্রিয়ের দ্বার। প্রদীপের নিবাত শিখা যেমন উর্ধ্বপানে চায়, তেমনি জীবাত্মা মিলনোন্মুখ স্তব্ধতায় উর্ধ্বমুখী হোলো পরমাত্মার আকর্ষণে।

সমাধিস্থ হলেন জ্ঞানদেব।

ত্রয়োদশীর প্রত্যুষে সমাধিস্থ দেহে মৃদু স্পন্দন জাগল। মুদিত চোখ খুলল। সামনে জাগ্রত হয়ে বসে আছেন গুরু নিবৃত্তিনাথ।

ঠোঁট দুটি নড়ল,—গুরু, গুরু, গুরু!

একটু পরে দীর্ঘনিশ্বাসের সঙ্গে তিনটি অস্ফুট শব্দ ফুটল,—গুরু, অনুমতি দাও!

নিবৃত্তিনাথ রুদ্ধ গম্ভীর গলায় বললেন,—অনুমতি দিলাম।

শেষবারের মতো মুদিত হোলো কমল-আঁখি। জ্ঞানদেব নিমগ্ন হলেন চিরসমাধিতে। বিট্‌ঠল-ব্রহ্মে আসঙ্গিত হোলো তাঁর অমর আত্মা।

সমাধিগুহার দ্বার বিশাল এক পাথর দিয়ে বন্ধ করে দিলেন গুরু নিবৃত্তিনাথ।

সেই সমাধি। তাকে ঘিরে বিরাট চত্বর। একপাশে সেই স্বর্ণপিপুল গাছ। পিছনে ইন্দ্রায়ণীর ঘাট। চত্বরের মাঝখানে বিশাল মন্দির,—জ্ঞানদেবের সমাধিমন্দির।

মন্দিরের পূর্বমুখী দ্বারে আছড়ে পড়ছে জনতার ঢেউ,—ভক্ত-হৃদয়ের কল্লোলের পর কল্লোল। কাতারে কাতারে লোক ঢুকছে,—ছড়িয়ে যাচ্ছে প্রশস্ত চত্বরে। চাতাল জুড়ে যাত্রীর জমায়েত। হাঁটাচলার ভিড়ের মাঝে পোঁটলা-পুঁটলি নিয়ে বসে গেছে মেয়েপুরুষ শিশু বৃদ্ধের দল।

মস্ত নাটমন্দির। শ্বেতপাথরে বাঁধানো ঝকঝকে মেঝে। রঙিন টালি বসানো ঝক্‌ঝকে দেওয়াল। সেই টালিতে কতো কারুকার্য, কতো বিচিত্র চিত্র। সবাই ঠেসাঠেসি করে আছে নাটমন্দির জুড়ে। মাঝখানে সরু একটু ফাঁক। সেই ফাঁক দিয়ে সন্তর্পণে এগিয়ে গিয়ে মন্দিরের গর্ভগৃহ।

ভিড়, কিন্তু হুড়োহুড়ি নেই। আকৃতি, কিন্তু উদ্দামতা নেই। কুলকুলু স্রোতের ঢেউ, উথাল-পাথাল নেই। সেই ঢেউ-এ ঢেউ-এ ভেসে ভেসে এগোচ্ছি।

এতো মানুষ,—আকুল মানুষ, ব্যাকুল মানুষ, কিন্তু সবাই আমার অচেনা। কারো সঙ্গে মিল নেই—কেবল ঐ আকুলি-বিকুলির মিল ছাড়া। একটি চেনা লোক কেবল জুটেছে,—হঠাৎ দেখা পুরোনো

বন্ধু কানহাইয়ালাল। কানহাইয়ালালের পেছনে পা ফেলে ফেলে হেলতে দুলতে আমি এগোলাম।

ধাক্কাধাক্কি নেই,—কিন্তু পায়ে পায়ে এগোতে পা-গুটোনো মানুষের গায়ে পা লাগবেই। সেটা অবহেলার লক্ষণ নয়,—তাতে কারো ভ্রূক্ষেপ নেই। যার পা লাগছে তার আক্ষেপ নেই, যার গায়ে পা লাগছে তার নেই উষ্মা। ভক্ত-পদধূলি অঙ্গে তো মাখতেই এসেছি,—ভক্ত চরণস্পর্শ তো বাড়তি লাভ।

এমনি বিচিত্র ব্যবহার কোথাও দেখিনি। একজনের কাঁধে কাঁধ লাগল,—সে আমার কাঁধে হাত বোলালো মুচকি হেসে। পায়ের ধাক্কা লাগল একজনের হাঁটুতে—সে উল্টে আমার পা জড়িয়ে আমারই হাঁটুতে মাথা ঠেকাল।

হাত ধরে টান দিল কানহাইয়ালাল। তড়িঘড়ি বললে,—এখানকার রকমই এমনি দাদা। ও কিছু না,—চলুন, এগিয়ে চলুন।

এগিয়ে চললাম। নমস্কারের ভঙ্গিতে দুহাত কপালে লাগিয়ে পায়ে পায়ে পৌছলাম গর্ভগৃহে।

শান্ত মধুর পরিবেশ। ধূপধুনোর গন্ধে গন্ধে গন্ধময়, ফুলে ফুলে ফুলময়। আলোয় আলোয় আলোময়। গানে গানে গানময়। গর্ভগৃহের ঠিক মাঝখানে আটকোণা বৃহৎ একটি শিলাপট্ট। সেই পট্টের কোণে কোণে ধূপপাত্র, গায়ে গায়ে প্রদীপের মালা। রাশি রাশি ফুল। ভক্তরা ধূপধুনো দিয়েছে, সারি সারি প্রদীপ জ্বালিয়েছে, নিবেদন করেছে পুষ্পাঞ্জলি। সেই শিলাপট্টকে ঘিরে ঠাসাঠাসি করে বসে আছে,—বিভোল হয়ে নামকীর্তন করছে,—

জয় জয় বিট্‌ঠল রামকৃষ্ণ হরি!

কানের কাছে কানহাইয়ালাল বললে,—

মাথা ঠেকান, প্রণাম করুন। এই জ্ঞানেশ্বর মহারাজের সমাধি।

মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করলাম।

কানহাইয়ালাল আবার বললে,—

ঐ দেখুন, মহারাজের আরাধ্য দেবদেবী।

সমাধিশিলার ঠিক পেছনেই কালো পাথরের যুগল বিগ্রহ,—বিট্‌ঠল-রুক্মিণী।

বাজছে মৃদঙ্গ, বাজছে মন্দিরা, কণ্ঠে নিরবচ্ছিন্ন নামগান। আসনপিঁড়ি হয়ে বসে ঐ গানে যারা মত্ত, তাদের নড়ায় কার সাধ্য? তাদের বিলম্ব নেই, ত্বরা নেই, সময়ের কোনো জ্ঞান নেই। প্রাণ তাদের মাতোয়ারা, চোখে তাদের অশ্রুধারা। আমাদের মতো যারা ক্ষণদর্শনের অভিলাষী,—তাদের শুধু যাওয়া-আসা। বেশীক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে ভিড় বাড়ানোর দস্তুর তাদের নেই। তাই বলে কোনো হুকুম নেই, চিৎকার নেই। চোখের ইঙ্গিতে তারা এগোচ্ছে, চোখের ইঙ্গিতেই পেছোচ্ছে।

আমরাও সন্তর্পণে গর্ভগৃহ থেকে বার হয়ে এসে নাটমন্দিরে পড়লাম। নাটমন্দিরের দেয়ালে দেয়ালে বিমোহন চিত্রাবলী। দেবদেবী মহাপুরুষদের চিত্র। সবাই ঘুরে ঘুরে দেখছে।

একটি চিত্রের সামনে সোজা দাঁড় করাল কানহাইয়ালাল।

এবার এঁকে প্রণাম করুন দাদা।

কাকে প্রণাম করব? প্রণাম করেছি জ্ঞানদেবকে, প্রণাম করেছি বিট্‌ঠলদেবকে। আর কে প্রণম্য আছেন এই মহামহিম স্মারক-মন্দিরে? দেখি এক বিরাট পুরুষমূর্তি। দেহে কৌপীন, মাথায় জটা, কপালে বিভূতি। সুদীর্ঘ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, প্রশস্ত ললাট, চোখদুটি যোগসন্নিহিত উদার উদাস।

প্রণাম করারই মতো মূর্তি বটে।

কে এই মহাপুরুষ, কানহাইয়ালাল?

চিনতে পারলেন না? ইনি গুরু নিবৃত্তিনাথ।

জ্ঞানদেব তাঁর গুরুকে বলেছেন,—

তোমার দয়ায় আমি দেখেছি জগৎ,—
পুরায়েছ তুমি মোর সর্ব মনোরথ।

তুমি মোর মর্মচক্ষে দিব্যাঞ্জন দান,—
যে দৃষ্টিতে মহানিধি পেয়েছি সন্ধান।
তুমি মোর চিন্তামণি, আত্মার আরাম,
তোমার কৃপায় আমি পূর্ণ সিদ্ধকাম।
সকল তীর্থের প্রতি নদীতে গাহন,
সকল রসের শ্রেষ্ঠ অমৃত স্বাদন
তোমারি কৃপায় গুরু হে নিবৃত্তিনাথ,—
তোমার চরণে আমি করি প্রণিপাত॥

মহা ভাগ্যবান ভক্ত চাঙ্গদেব। তিনি বিট্‌ঠলপন্থের চার সন্তানকেই প্রত্যক্ষ করেছিলেন। চারজনেরই অনুপ্রেরণা পেয়ে ধন্য হয়েছিলেন।

চাঙ্গদেব বলেছেন,—

জ্ঞানদেব করেছেন মুক্তামৃত পান,
নিবৃত্তিনাথের চোখে মেঘের অঞ্জন।
সুরভি সুধায় স্নান করিল সোপান,
মুক্তার ভোজন-থালে হীরক-ব্যঞ্জন।

তারপর বলেছেন,—

আমি ভক্ত চাঙ্গদেব ধন্য মোর প্রাণ।
এ চার রহস্য আমি পেয়েছি সন্ধান॥

এই চাঙ্গদেব এসেছেন আলন্দীতে,—পাহাড় ডিঙিয়ে, বন পেরিয়ে। বিট্‌ঠলপন্থের সন্তানদের পুজো করতে নয়, তাদের একেবারে ঠাণ্ডা করতে। বাঘের পিঠে চেপে এসেছেন,—বাঘের মতো চেহারা, পরনে বাঘছাল। গলায় ব্যাঘ্রহুংকার।

সেই হুংকারে চারদিক কাঁপছে,—

কোথায় জ্ঞানেশ্বর, কোথায় তার ভণ্ড দাদা নিবৃত্তি, কোথায় তাদের ভাইবোন সোপান আর মুক্তা!

ইন্দ্রায়ণীর তীরে সিদ্ধেশ্বরের মন্দির।

পুরোহিত ভয়ে ভয়ে এগিয়ে এলেন,—কী হয়েছে যোগীবর? কীসের জন্যে আগমন? ওদের আপনার কেন চাই?

কেন চাই? ওদের সঙ্গে লড়ব বলে,—ওদের গুঁড়োগুঁড়ো করব বলে।

বলেন কী? নিবৃত্তি আর জ্ঞান তো মাত্র কিশোর! আর সোপান আর মুক্তা তো বালক-বালিকা। কী অপরাধ ওরা করেছে?

কী অপরাধ করেছে? যোগের মন্ত্র নিয়ে সেই মন্ত্রকে তুচ্ছ করে ওরা ভক্তির জয়ধ্বনি করেছে। ভক্তি! জানো আমি কে? আমি যোগী, আমি শিব, আমিই ব্রহ্ম। আর ঐ জ্ঞানেশ্বর কী বলেছে জানো? বলেছে মানুষ আবার ব্রহ্ম কী? জীব কখনো শিব হয়?

পুরোহিত আমতা আমতা করে বললেন,—তাইতো! জীব কখনো শিব হয়?

হয় না? আবার হুংকার ছাড়লেন চাঙ্গদেব,—তাহলে আমি কী? আমি মিথ্যা? আমি শিব নই? প্রমাণ চাও?

রক্তচক্ষু ঘুরিয়ে চাঙ্গদেব বললেন,—প্রমাণ দেব। আমার চোখে রুদ্রের আগুন।—সেই আগুনে আমি ওদের পুড়িয়ে মারব। কোথায় ঐ অবিশ্বাসীর দল?

কিছু দূরে নিভৃত পল্লী। সেখানে রাস্তার ধারে পাথরের এক নিচু পাঁচিল। সেই পাঁচিলের ওপর পাশাপাশি বসে আছেন তিন ভাই আর বোন। গুনগুন গান করছেন তাঁরা। চাঙ্গদেবের হুংকার কানে এসে পৌঁছল।

কী হবে? মুক্তা শিউরে উঠে বললে।

জ্ঞানদেব হেসে বললেন,—কী আবার হবে? মহাযোগী চাঙ্গদেব আমাদের খোঁজে এসেছেন, তাঁর সঙ্গে দেখা করতে হবে।

কিন্তু বনের একটা বাঘ যে বাহন?

তাতে কি? আমাদেরও বাহন আছে,—আমরাও বাহনে চেপেই যাব।

চাঙ্গদেবের আর খুঁজতে হোলো না। যাদের খোঁজে এসেছেন তারাই সামনে এগিয়ে এল। বাহন বাঘও আর এগোলো না। ভয়ে লেজ গুটিয়ে দাঁড়াল। বেড়াল হয়ে মিউমিউ করতে লাগল। চাঙ্গদেব বিস্ফারিত চোখে দেখলেন,—বাহনে চেপে তাঁর কাছে আসছেন তিন ভাই আর বোন। বাহন ঐ পাঁচিল,—পাথরের পাঁচিল সচল হয়ে তাঁর দিকে এগিয়ে আসছে।

পাঁচিল সামনে এসে দাঁড়াল।

জ্ঞানেশ্বর জলদগম্ভীর স্বরে ডাক দিলেন,—চাঙ্গদেব, তুমি ডাকছ? তুমি আমাকে চাও?

চাঙ্গদেবের মুখে কথা সরল না।

জ্ঞানেশ্বর আবার বললেন,—তুমি বনের পশুকে বশ করে তাকে তোমার বাহন করেছ, এ দেখে আমি বড়ো আশ্চর্য হয়েছি চাঙ্গদেব!

চাঙ্গদেব বললেন,—কিন্তু এই পাঁচিলকে তুমি—

হ্যাঁ, আমি প্রাণহীনের অন্তরে প্রাণসঞ্চার করেছি, অচলকে সচল করেছি,—এ দেখে তুমিও আশ্চর্য হচ্ছ না?

চাঙ্গদেবের সবচেয়ে রাগ নিবৃত্তিনাথের ওপর। গোরক্ষনাথের শিষ্য গহিনীনাথ আর গহিনীনাথের শিষ্য নিবৃত্তি। তিনিই ছোটভাই জ্ঞানেশ্বরকে দীক্ষা দিয়েছেন। কিন্তু কোন্ মন্ত্রে? গহিনীনাথের মতো মহাযোগী যার গুরু তাঁর শিষ্য কিনা অরণ্যপর্বতে নিভৃতে যোগসাধনা না করে সংসারের পথে পথে কীর্তন করে ফেরে?

কিন্তু নিবৃত্তি কোনো কথা বলছেন না। চাঙ্গদেবের রকম দেখছেন আর মুচকি মুচকি হাসছেন। আর চাঙ্গদেব অপলক চোখে তাকিয়ে আছেন জ্ঞানেশ্বরের মুখের দিকে।

কে বলে এ কিশোর যোগী নয়? ললাটে হোমাগ্নির মতো যোগবিভা! কে বলে এ কিশোর ভক্ত নয়? ছলছল চোখের

প্রশান্ত করুণ দৃষ্টিতে এ কী ভক্তিমাধুরী! ঋজুদেহে যোগের কাঠিন্য, পেলব বাহুদুটিতে প্রেমের ভঙ্গিমা। আর এ কী কণ্ঠ? যেন একতারায় বৈরাগ্য আর আকিঞ্চনের যুগল সুর বাজছে। আর কী কথা শোনালো? নিষ্প্রাণের বুকে প্রাণসঞ্চার করতে হবে, জড়কে করতে হবে জীবন্ত!

চাঙ্গদেবের কানে আবার এল জ্ঞানেশ্বরের কণ্ঠ, কঠিন মধুর স্বর,—যেন শিশুকে তিনি ধিক্‌কার দিচ্ছেন,—

বনের পশুকে বশ করতে পেরেছ চাঙ্গদেব,—কিন্তু ষড়রিপুকে? সবকিছু ছেড়ে যোগী হয়েছ, কিন্তু তোমার গর্বকে কি তুমি ছাড়তে পেরেছ? সোঽহং সোঽহং,—তিনি কে? না, তিনিই আমি, আমিই তিনি। এ কি সহজ কথা? গর্বভরে চিৎকার করে বললেই হোলো?

চিৎকারই করলেন চাঙ্গদেব। আর্ত চিৎকারে বললেন,—

তাহলে কে তিনি, আর কে আমি?

শোনো চাঙ্গদেব, তোমার পঞ্চম রিপুকে শাসনে রেখে মন দিয়ে শোনো। তিনি তিনি, আর তুমি তুমি। তিনি প্রভু আর তুমি ভক্ত, তিনি শরণ আর তুমি শরণাগত।

এই জ্ঞানেশ্বর। নাথপন্থী যোগী, কিন্তু বৈষ্ণবী ভক্তিতে সম্পূর্ণ তার সাধনা। ললাটে শিবচিহ্ন। বক্ষে বিষ্ণুপাদ। প্রেম বিনে ভক্তি হয় না, প্রেমের কোল পরম কোল। তুমি প্রেমিক, আমি ভক্ত, তাই তো তোমায় আমায় প্রেম।

সেই প্রেমের ডাকে চাঙ্গদেবকে তিনি ডাকলেন। চাঙ্গদেব, তুমি কি সাড়া দেবে না?

না, সাড়া দেব না, তোমার কাছে আমি যাব না।

তবে তুমি কি ফিরে যাবে চাঙ্গদেব তোমার যোগের গুহায়, তোমার আত্মাভিমানের কারাগারে?

না না, হুহু করে কেঁদে উঠলেন চাঙ্গদেব। আকুল স্বরে বললেন,—

আমি মূর্খ, আমি অবোধ, আমি কিছু জানিনে। তোমাদের মধ্যে যে সবচেয়ে ছোট তার আশ্রয় আমি নেব।

বালিকা মুক্তাবাঈএর সামনে হাঁটু গেড়ে বসলেন চাঙ্গদেব। বললেন,—

মা, আমাকে আশ্রয় দাও, আমাকে মন্ত্র দাও!

মুক্তাবাঈ হাত জোড় করে প্রার্থনা করলেন,—

প্রভু, তুমি যন্ত্রী আমি যন্ত্র,—

চাঙ্গদেব প্রার্থনা করলেন,—

তুমি যন্ত্রী, আমি যন্ত্র,—

মুক্তাবাঈ বললেন,—

প্রভু, তুমি বাজাও, আমি বাজি,—

চাঙ্গদেব অনুসরণ করলেন,—

তুমি বাজাও, আমি বাজি।

মুক্তাবাঈ তখন চাঙ্গদেবকে বললেন,—

বলো,—জয় জয় বিট্ঠল রামকৃষ্ণ হরি।

চোখের জলে বুক ভেসে যাচ্ছে। এ তো অশ্রুর ধারা নয়,—মুক্তির ধারা, শান্তির ধারা।

চাঙ্গদেব বললেন,—

জয় জয় বিট্ঠল রামকৃষ্ণ হরি।

॥ ৬ ॥

দিন শেষ হয়ে আসছে। ইন্দ্রায়ণীর ওপারে দিকচক্রবাল লালে লাল। জ্ঞানেশ্বর-মন্দিরের অপূর্ব চূড়াটি চোখে পড়ছে। থাকে থাকে অর্ধচূড়া, অর্ধ-অলিন্দ। কারুকার্যকরা কার্নিশের ওপর থাকে থাকে মন্দিরসারি। বড়ো থেকে ছোট হয়ে আসা তিনটি থাকের মাথায় বিশাল আমলক তার ওপর সোনার শিখর। পড়ন্ত সূর্যের রশ্মিতে সেই শিখর চকচক করছে।

আর এক স্মৃতিনিদর্শন। পাথরের একটি পাঁচিল,—দুপাশে দুটি সিঁড়ি। কাতারে কাতারে লোক হুড়োহুড়ি করে সিঁড়ি বেয়ে উঠছে,—পাঁচিলের মাথাটি স্পর্শ করছে। কপাল ছোঁয়াচ্ছে, পুষ্পাঞ্জলি ছড়াচ্ছে, আবার পেছনের ধাক্কা সামলিয়ে আর এক সিঁড়ি বেয়ে হুড়মুড়িয়ে নেমে আসছে।

কানহাইয়ালাল কানের কাছে হেঁকে বললে,—এই সেই পাঁচিল দাদা, জ্ঞানদেবের সচল বাহন। এখানেই চাঙ্গদেবকে জ্ঞানেশ্বরজী জয় করেছিলেন, কৃতার্থ করেছিলেন।

প্রশ্ন নেই, বিশ্বাস-সংশয়ের কোনো উদ্বেগ নেই। শুধু ভক্তজনের স্রোতে গা ভাসিয়ে যাওয়া। ঐ পাঁচিলের মাথায় জ্ঞানেশ্বরজী বসেছিলেন,—ঐ তাঁর মরজীবনের পুণ্য স্পর্শের নিদর্শন। নিদর্শন কি সত্যি হয়? সাতশো বছর ধরে ঐ পাঁচিল দাঁড়িয়ে আছে বললেই হোলো? নিশ্চয়ই আছে,—তাই তো এখানে এতো ভক্তের ভিড়,—এতো পুষ্পার্ঘ, এতো আকুলতা।

সকলের সঙ্গে আমিও সিঁড়ি বেয়ে উঠেছিলাম। সকলের মতো আমিও মাথা ঠেকিয়েছিলাম পাঁচিলের মাথায়।

আমি পথে পথে ঘুরি, তীর্থে তীর্থে বেড়াই, দিন যাপন করি মন্দিরে মন্দিরে। এক মন্দিরে পূজা দিই, এক তীর্থ দর্শন শেষ হয়,—আবার পথে বার হই নতুন তীর্থ নতুন মন্দিরের উদ্দেশে।

সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে। উত্তরে হিমালয় আর আর দক্ষিণে কুমারিকা, পুর্বে গঙ্গাসাগর আর পশ্চিমে দ্বারকা পর্যন্ত যার বিস্তার। যার পর্বতের শিখরে অরণ্যের গভীরে নদীর তীরে আর জনপদের কেন্দ্রে তীর্থের শেষ নেই। ভারতে জন্মেছি বলেই আমি তীর্থপথিক।

পথ এখানে ফুরোয় না। পথের নেশা কাটে না। পথই টানে, পথই ডাকে, বলে,—চলো, চলো, এগিয়ে চলো। পিছনের হাতছানি

নেই, প্রান্তে পৌঁছবার তাড়া নেই,—আনন্দ শুধু চলার। তাই বৈশাখের খর রৌদ্রভরা প্রচণ্ড দ্বিপ্রহরে পথে আমি হেঁটেছি, পথপাশে হেমন্তের শীর্ণা নদীর ধারে সায়াহ্নে আমি বসেছি, পথের প্রান্তে তৃণ-শয্যায় আমি কাটিয়েছি শীতের অন্ধকার রাত।

প্রকৃতির বৈচিত্র্য, পথের বৈচিত্র্য, তীর্থের বৈচিত্র্য,—সবার ওপর মানুষের বৈচিত্র্য। পথিক হয়েই আমি বিচিত্র মানুষের সংস্পর্শে এসেছি। বিচিত্র তাদের ভাবনা-সাধনা, বিচিত্র তাদের ধ্যানধারণা। তারা দুদিনের জন্যে কাছে টেনেছে, কাছে থেকেছে,—আবার দুদিন পরে আমার অভিজ্ঞতার ঝুলি ভরে দিয়ে হাসিমুখে নিয়েছে বিদায়। আর তাদের সঙ্গে দেখা হবার কথা নয়,—না হলেও চলবে। পথ থাকবে, তীর্থ থাকবে, কিন্তু ক্ষণিকের চেনা মানুষগুলি তলিয়ে যাবে বিস্মৃতির অতলে।

সাধু কানহাইয়ালালকেও আমি ভুলেছিলাম। নর্মদা পরিক্রমা-বাসী কানহাইয়ালাল। ছ-সাত বছর আগে নর্মদা-উৎস অমরকণ্টক পাহাড়ে তার সঙ্গে আমার পরিচয়। নর্মদা-পরিক্রমার প্রধান তীর্থগুলির হদিস সে আমাকে দিয়েছিল। তারপর উৎসতুঙ্গ থেকে উপত্যকা পর্যন্ত মুণ্ড মহারণ্যের পাহাড়ী ঢালু পথে আমার পাশে পাশে হেঁটেছিল দিনের পর দিন। মুণ্ড মহারণ্যের পাকদণ্ডী যুগ যুগ ধরে কতো সাধুমহাত্মার পদরজস্পর্শে পবিত্র। সেইসব মহাত্মাদের কথা সে আমাকে শুনিয়েছিল। শুনিয়েছিল নর্মদা-মাহাত্ম্যের কতো অমৃত কাহিনী।

মুখই ভুলে গিয়েছিলাম। এতোদিন পরে আলন্দীর বাসস্ট্যাণ্ডের পাশে হঠাৎ সেই মুখের দেখা।

দাদা না?

কে ডাকে? এই অচিন ঠাঁই-এ কার আমি দাদা? কে আমার ভাই?

সেই জটাধরা রুক্ষ কোঁকড়া চুল ঘাড় পর্যন্ত নামানো, সেই ধূসর-কচি দাড়ি, সেই ভাবে ভোলা চোখ।

চিনতে পারলেন না দাদা ?

তুমি ? তুমি ডাকছ আমাকে ?

হ্যাঁ, আমিই তো। নামটা মনে নেই ? আমি অমরকণ্টকের কানহাইয়ালাল।

পথের মানুষ কানহাইয়ালালকে শুধোলাম,—

এবার কোথা থেকে আসছ কানহাইয়ালাল ?

ব্রহ্মগিরি থেকে।

ব্রহ্মগিরি ? পূর্ণচৈতন্যজীর খবর রাখো ?

রাখি বৈকি। তিনি তো এসে গেছেন,—আমার নাসিকে দুদিন দেরি হোলো। তাই আজ এসে পৌঁছলাম।

কোথায় তিনি কানহাইয়ালাল ?

আছেন কোথাও। ঠিক তাঁকে ধরব,—ভাবনা কী ?

আমাকে ভাবতে বারণ করেই কানহাইয়ালাল গেছে নদীতীরে। সেখানে সে সান্ধ্যজপ সারবে। তারপর পূর্ণচৈতন্যের সন্ধানে এদিক ওদিক আমরা ঘুরব। এখন একটু পা ছড়িয়ে জিরিয়ে নিই স্বর্ণ-পিপুলের তলায়।

হঠাৎ চোখের সামনে ফুটে উঠল সোনালি-হলুদ রঙের এক উজ্জ্বল বিদ্যুৎরেখা। কানে এল তীক্ষ্ণ রিনরিনে গলা,—

জয় বিট্‌ঠল, জয় হরি !

সামনে এসে ঝুপ করে বসে পড়ল। দুহাতে দুই পিতলের মন্দিরা, টুংটং করে কানের কাছে বাজিয়ে দিল একবার। তারপর নীল চোখে বিদ্যুৎ হেনে বললে,—

ইয়েস, ইউ মাস্ট বি হি ! আরন্‌ট ইউ ফ্রম ওয়েস্ট বেঙ্গল ?

চমকে উঠলাম,—অ্যাঁ ?

অ্যাঁ ? আরে অ্যাঁ কেয়া ? তুম্ বাঙ্গাল নেহি ? বোলো সচ্ ?

পরনে একটা সোনালি হলুদ ঢোলা পাঞ্জাবি,—প্রায় একই রঙের

গেরুয়া পাজামা। সোনালি হলুদ ঢেউ-খেলানো ঝুমরো চুলে টুকটুকে কপাল আর গালছুটো অর্ধেক ঢাকা,—ফরসা গলার চামড়া ফুঁড়ে নীলচে শিরের বাহার।

হাঁ করে তাকিয়ে রইলাম। এ কোন্ আজব মানুষ? কী চায় আমার কাছে?

কানের কাছে আবার মন্দিরার টুং। সঙ্গে সঙ্গে চড়া গলায় ধমক,—ক্যায়া দেখতা হ্যয়? অ্যাম আই এ বিউটি? কান্‌ট ইউ স্পীক?

চমক ভাঙল। হ্যাঁ, আমি বাঙালী। কী হয়েছে তাতে?

খিলখিল হাসি, ঝক্‌ঝকে দাঁতের ঝিলিক। আমার ডানহাতটা খপ করে ছমুঠোর মধ্যে ভরা।

গ্লোরি টু লর্ড বিট্‌ঠল! সো আ হ্যাভ গট ইউ! নাউ, গেট্ আপ, চলো মেরি সাথ!

চট করে উঠে দাঁড়াল। কিন্তু আমি উঠব কী? আজব চিঁড়িয়ার দিকে ফ্যালফেলিয়ে তাকিয়ে আছি, বিস্ময়ে আমার হাঁটু দুটো আরো শিথিল হয়ে গেছে।

মেঝের ওপর পা ঠুকে সারা শরীরটা ছুলিয়ে নিল একবার। পাঞ্জাবির আচ্ছাদনের নিচে দুলে উঠল বুক।

ডোন্‌ট বি লেজি ম্যান!

কাঁধের উপর চটপট চাপড়।

চলো, দেরি মৎ করো।

কোথায় যাব?

ইত্‌না ডর কিঁউ পিয়ার? আমি যেখানে নিয়ে যাব, উঁহাই তুম্ চলো গে!

আমার বাঁ-হাতের কব্‌জিটা শক্ত করে চেপে ধরেছে—পাছে পালিয়ে যাই। হাত ধরে টানতে টানতে লম্বা লম্বা পা ফেলে হন্‌হনিয়ে চলেছে,—পাছে পিছিয়ে যাই। ভিড়ের বাধায় যখনই থমকে দাঁড়াচ্ছে,

আত্বরে গলায় তখনি বলছে,—ডোন্‌ট ওরি, চুক্ চুক্, আও, আও। পাছে ভবীভোলানোর টান থেকে খসে যাই !

এ ভবী যে সে ভবী নয়, একেবারে অচিন ভবী। এ ভবীর তুলনা নেই। জানিনে কী জাত, কোথায় জানিনে দেশ,—তবে যেমন বিচিত্র বেশ, তেমনি বিচিত্র পরিবেশ। এখানে এসে জুটল কোথা থেকে, কেমন করে ?

মন্দিরের সিংহদ্বার পার হলাম। সারি সারি দোকানের মাঝখান দিয়ে সরু পথে এগোলাম। ঐ তো ঝাঁকড়া-চূড়া কদমফুলের গাছটা ! তারপরেই রাস্তার বাঁক। বাঁক ছাড়িয়েই ইন্দ্রায়ণীর তীর। ডানদিকে ঘুরে ঘাটের ধারে ধারে এগোলাম।

হেমন্তের সন্ধ্যা। ইন্দ্রায়ণীর বুকে এক আস্তরণ কুয়াশা জমেছে। ওপারে আঁধার,—এপারের আলোগুলি কুয়াশার ফাঁক দিয়ে ভাসা-ভাসা বড়ো বড়ো দেখাচ্ছে। অগুন্‌তি আলো—ইলেক্‌ট্রিকের সঙ্গে গ্যাস, গ্যাসের পাশে কেরোসিনের ডিব্বা, মোমের বাতি, মাটির প্রদীপ। ঘাটের রাস্তার কোণে কোণে উঁচু পোস্টে বিজলির প্রখর বাল্‌ব, ঘাটের ধারের বড়ো বড়ো দোকানগুলিতে পাম্প-করা পেট্রোম্যাক্স। তীরে বাঁধা নৌকোয় কেরোসিনের লণ্ঠন। ঘাটের সিঁড়িতে মোমবাতির আলোয় সওদা সাজিয়েছে ছোট ব্যবসায়ীরা, পুণ্যার্থীরা মাটির জ্বলন্ত প্রদীপ ভাসিয়েছে জলে।

ইন্দ্রায়ণীর ঘাট পাথর-বাঁধানো। যেমনি লম্বা তেমনি চওড়া। সিঁড়ির পর সিঁড়ি নেমে গেছে জলে। মন্দির চাতালের মতো এখানেও লোক গিজগিজ, এখানেও পাঁচিলের কিনারে কিনারে দূরাগত যাত্রীরা পোঁটলা-পুঁটলি জমিয়ে বসেছে। তাছাড়া দোকানে দোকানে জটলা, নিরবচ্ছিন্ন চলাচল, মেলার কোলাহল।

বাঁধানো ঘাট পার হলাম। কাঁচা রাস্তার শুরু, পাতলা ভিড়, নিবুনিবু আলো, বিরল বসতি। আর হারাবার ভয় নেই, তবে আলো-আঁধারিতে পালাবার পথ প্রশস্ত। একবার হাত ছাড়াবার

চেষ্টা করলাম। কঁকিয়ে উঠল সঙ্গে সঙ্গে,—

ডোন্‌ট ডোন্‌ট, অ্যায়সা মৎ করো।

সঙ্গে সঙ্গে আমার বাঁ-হাতের আঙুলের ফাঁকে ফাঁকে নিজের ডান হাতের আঙুলগুলো জড়িয়ে ধরল,—তালুতে তালু চেপে ধরার শিরশিরানি স্পর্শ।

কে তুমি? কোথায় নিয়ে চলেছ বলো তো?

দাঁত বার করে হাসল। অদূরে নদীতীরে খোলা এলাকায় কতকগুলো তাঁবু পড়েছে,—দূরাগতদের আশ্রয়। সেখানে জমাট জনজটলা আবার। সেইদিকে আঙুল তুলে বললে,—দেয়ার! এ সারপ্রাইজ ওয়েটস্ ফর ইউ!

সারপ্রাইজ? কীসের সারপ্রাইজ? তুমি কে বললে না তো?

অতো ব্যস্ত কেন? আর কয়েক পা চলো না!

সামনাসামনি একটা তাঁবু। তাঁবুর সামনে অনেকটা জায়গা। ফাঁকা জায়গায় অনেক লোক উবু হয়ে বসে আছে। পেছনে একটা উঁচু পাটাতন। পাটাতনের ধারে ধারে চার পাঁচটা গ্যাসবাতি জ্বলছে। ভিড়ের দিকে মুখ করে পাটাতনের ওপর বসে আছে একসার লোক। সভামঞ্চে ওজনদার লোকেরা যেমন বসে,—আদালতের বেঞ্চে যেমন বসে হাকিমের সার।

মাঠে বসা মানুষদের পাশ কাটিয়ে কাটিয়ে পৌঁছলাম পাটাতনের ঠিক সামনে। কাছাকাছি পৌঁছতেই রিনরিনে গলায় চিৎকার,—

লুক বাপ্পা লুক, আই হ্যাভ ব্রট ইয়োর ম্যান!

ইয়োর ম্যান? কার ম্যান আমি? আমি নির্বান্ধব নিরুপদ্রব মুক্ত পুরুষ,—কার হুকুমে এই বিদেশী মেয়ে-সেপাই আমাকে ধরে নিয়ে এল? কোন্ হাকিমের এজলাসে?

ঠিক চোখের সামনেই একটা জ্বলজ্বলে পেট্রোম্যাক্স। তার ঝাঁঝালো রোশনাই-এ ধাঁধিয়ে যাওয়া চোখ। ইতিমধ্যে বাঁ-হাতটা ছাড়া পেয়েছে। দুহাতে দুচোখ কচলিয়ে ভালো করে চেয়ে দেখলাম।

কানে এল সশব্দ উদার হাসি।

কী বাঙালী ভাই? চিনতে পারলে না?

সঙ্গে সঙ্গে মেয়ে-সেপাই-এর সহর্ষ আস্ফালন,—

কারেক্‌ট! সো দিস ইজ দি বেঙ্গলী চ্যাপ। ঠিক আদমীকো পাকাড়কে লায়া না?

হাঁ, বেটী ঠিক। কিন্তু ভায়া, এখনো আমাকে মনে পড়ছে না?

চোখে দেখছি, গলা শুনছি,—আর চিনতে ভুল হয়? এই আলন্দীতে এসে অবধি যার ভাবনার ঠোক্করে ঠোক্করে পথ হেঁটেছি, মন্দির-চাতালে বসে এই ক-মিনিট আগেও যার মুখ জ্বলজ্বলে হয়ে মনে পড়েছে,—সেই মানুষ! চোখের সামনে সশরীরে বর্তমান! ব্রহ্মগিরির পূর্ণচৈতন্য মহারাজ। সেই চুল, সেই দাড়ি, সেই গেরুয়া বসন। চোখে সেই তীব্র দৃষ্টি, ঠোঁটে সেই আপনকরা হাসি।

ধপ্ করে পাশে বসে পড়লাম। হাঁটুটা চেপে ধরলাম ডান হাতে, কথা সরল না মুখে।

সেই হাতটা হাতে তুলে নিয়ে বললেন,—কেমন? দেখা হোলো তো? কথা রেখেছি বলো?

আমিও উৎফুল্ল গলায় বললাম,—আমিও কথা রেখেছি মহারাজ। সারাদিন আপনাকেই যে খুঁজছি!

বটে? মাঝে কটা বছর গেছে বলতো হে? প্রতি বছর এমনি দিনে আমি যে তোমাকে খুঁজে খুঁজে ফিরেছি বাঙালী ভাই! এতোদিনে ধরা পড়েছ!

মেয়ে-সেপাই-এর খিলখিল হাসি। আমি বললাম,—কিন্তু এটি কে? এ আমাকে চিনে চিনে কী করে পাকড়াও করল?

আর এক মোটা গলার চেনা হাসি, হাসিতে যোগ দিল। পেছন ফিরে দেখি কানহাইয়ালাল।

আরে! নদীতীরে নিরিবিলি জপতপ করবে বলে হাওয়া হয়েছিল,

এখানে এসে জুটল কী করে? সে প্রশ্ন করার আগেই ফস্ করে বলে বসল,—

এখানে প্রেমের আসর দাদা, তাই মহারাজ প্রেমের দূতীকে পাঠিয়েছিলেন আপনার কাছে। কেমন? দূতীটি ভালো নয়?

আমি মেয়েটির দিকে ভালো করে তাকালাম। আসনপিঁড়ি হয়ে পা গুটিয়ে ঘেঁসাঘেসি বসেছে,—টুকটুকে মুখ, নীল-নীল চোখ, পেট্রোম্যাক্সের আলোয় জ্বলজ্বলে চুল। অচেনা মানুষকে ভিড়ের মধ্যে চিনে চিনে ঠিক ধরে এনেছে,—মুখে তার গর্বের হাসি।

মহারাজ স্নেহভরে মেয়েটির কাঁধে হাত তুলে দিলেন। বললেন,—এ আমার বড়ো স্নেহের পাত্রী। এর নাম চেরিল।

মহারাজের পাশে বসে অনেকটা সহজ হয়েছি। আর ভাবীর ভয় নেই।

চেরিল, চেরিল,—কবার উচ্চারণ করলাম, তারপর বললাম,—সুন্দর নাম, উচ্চারণে সহজ, বলতেও মিষ্টি।

চোখ পাকিয়ে তাকাল।

তাই নাকি? খুব যে আওড়াচ্ছ। তা তোমার নামটা কি শুনি?

আমার নাম? ভারতের তীর্থে তীর্থে আমি ঘুরে বেড়াই, নানা অচেনা জন ক্ষণিকের জন্যে কাছে আসে, ক্ষণসঙ্গের স্বাদ মনে লাগিয়ে দূরে সরে যায়। কে জানে আমার গোত্র, কে জানে আমার নাম? আমার পিতৃদত্ত নাম ধরে ডাকবারই বা দরকার হয় কার? সে নাম আমি ফেলে এসেছি অনেক দূরে—ভাগীরথীর তীরে।

তাই বললাম,—আমার নামটা খুব সুন্দর নয় চেরিল, শুনতে বিশ্রী, উচ্চারণেও খটমটে।

তাহলে ডাকব কী করে?

কী মুশকিল, ডেকো না!

বাঃ, না ডাকলে চলে? আচ্ছা বাপ্পা, তুমি বলছিলে বাঙালী ভাই,

তাই না? এ ফ্রেণ্ড ফ্রম বেঙ্গল। আমি ওকে ডাকব বাঙাল সখা বলে। কেমন? ঠিক হবে না?

আমি চমকে উঠলাম। বাঙাল সখা,—এ আবার কেমন নাম?

চমক ভাঙাল কানহাইয়ালালের হাসি।

কী দাদা, ডাকনামটা লাগল কেমন?

আমি কোনো উত্তর দিলাম না। চট্ করে কথা জোগাল না মুখে। শুধু মনে মনে ভাবলাম,—এই প্রবাসী ঘাটে এই আসন্ন সন্ধ্যায় অচেনা কেউ যদি অচেনা আমাকে ডাকতে চায়,—তার নতুন দেওয়া নতুন নামেই ডাকুক।

॥ ৭ ॥

আমার প্রবাসীগৃহের দ্বার দিনরাত খোলা থাকে। দ্বারপালের ঠিকানা নেই। জং-ধরা লোহা-বাঁধানো গুলি-বসানো গেট কখনো বন্ধ হয় না। দেউড়ির দুপাশে সার সার ঘর, তেমনি ঘরের সারি বাকি তিন দিকে। সামনে টানা বারান্দা। কাঁচা উঠোনের কোণে কোণে কটা শীর্ণ ফুলগাছ।

ঘরে ঘরে দূরাগত যাত্রী-যাত্রিণী। আমি ঝাড়া-হাত-পা একলা মানুষ। তাই আমার ঠাঁই ঘরে নয়, বারান্দার এক কোণে। মাথার ওপরে চোখের সামনে পাখির খাঁচা।

খাঁচার পাখিটা জাগবার আগেই আমি খোলা দ্বার দিয়ে পথে বার হয়ে এলাম। জনপদের ঘুম ভাঙছে, ছায়া ছায়া রাস্তায় দোকানপাট খুলছে। স্নানার্থীরা প্রত্যূষস্নানে চলেছে নদীর ঘাটে। ভোরবেলাকার মন্থর বাতাস।

আমার কিন্তু মন্থর হবার উপায় নেই। সোজা ছুটেছি বাস-স্ট্যাণ্ডে। সেখানে বাঙাল সখার জন্যে অপেক্ষা করে আছে প্রেমের দূতী।

গতকাল পূর্ণ চৈতন্যজীর আসর ভেঙেছিল গভীর রাত্রে। সারা সন্ধ্যা জুড়ে অভঙ্গগীতি। জ্ঞানদেব-রচিত হরিপাঠাচে অভঙ্গ। হরি-পদাশ্রিত কাব্য, হরিনামের অভঙ্গগান।

হরিনামই সব, কলিযুগে হরিই ভরসা, হরি ছাড়া গতি নেই। হরের্নামৈব কেবলম্, কলৌ নাস্ত্যেব গতিরন্যথা। হরিনামেই ভক্তি, হরিনামেই মুক্তি।

তাই নামকীর্তন শুধু নয়, নামমাহাত্ম্য কীর্তন।

নাম করো জীব,
নিত্য হরিনাম,
সর্ব পুণ্য আছে হরিনামে।
গান করো জীব,
হরি গুণগান,
পূর্ণ মুক্তি পাবে হরিনামে॥

বহু অভঙ্গপদ রচনা করেছিলেন জ্ঞানেশ্বরজী। তার মধ্যে আঠাশটি অভঙ্গে বিশেষ করে হরিনামের মাহাত্ম্য ঘোষণা। এগুলি হরিপাঠাচে অভঙ্গ বলে চিহ্নিত। এই গানগুলি সম্বন্ধে রচয়িতা নিজেই বলেছেন,—

অভঙ্গ হরিপাঠ অসতী অঠ্ঠাবীস।
রচিলে বিশ্বাসে জ্ঞানদেবে॥
নিত্য পাঠ করীঁ ইন্দ্রায়ণী তীরীঁ।
হোয় অধিকারী সর্বথা তো॥

হরিনাম এ যুগের অমোঘ বিধান।

অষ্টবিংশ অভঙ্গ যে
রচিয়াছি পরম বিশ্বাসে,—
এ গীতি ওষধি রূপে
অনিত্যের সর্বদুঃখ নাশে।

ইন্দ্রায়ণী তীরে বসি
শান্তচিত্তে একাগ্র অন্তরে
যে ভক্ত উল্লাসভরে
হরিকথা নিত্য পাঠ করে,
নিত্য স্মরে হরিনাম,
হরিই যে পারের কাণ্ডারী,—
পরমার্থ মোক্ষফল
অবশ্য সে হয় অধিকারী।
হরিনামে সর্বকালে
সর্ববাধা সংকটমোচন।
হরিনামে অন্তকালে
পরমাত্মা জীবাত্মা মিলন।
সজ্জন সন্তের মতে
হরিনাম প্রত্যক্ষ বিধান,
অলস ও মন্দমতি
হরিনামে পাবে পরিত্রাণ।
গুরু শ্রীনিবৃত্তিনাথ,—
প্রেমপূর্ণ তাঁহার বচন,
জ্ঞানদেব কহে,—ধন্য
করিয়াছে আমার জীবন॥

কার নাম করব? কে তিনি হরি? সৃষ্টির আদিতে যিনি নারায়ণ,—ত্রেতায় যিনি রাম, দ্বাপরে যিনি কৃষ্ণ,—কলিতে তিনিই হরি। তাঁর নাম-তরণী সম্বল করে কলির জীব ভবতরঙ্গ উত্তরণ করে।

মায়াশৃংখলে আবদ্ধ আমি, কারাগারে বন্দী আমি,—হরি, তুমি আমাকে হরণ করো। আমি অজ্ঞান, অন্ধ, আমি পথহারা পথিক, তুমি আমাকে কৃপা করো, অন্ধকারে আলো দেখাও, পথ দেখাও।

তাই আকুল হয়ে তোমাকে ডাকি। নামগানের মধ্যে দিয়ে নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে তোমাকে স্মরণ করি।

পরনে শ্বেতাম্বর। মাথায় শ্বেতবস্ত্রের আবরণ, কপালে শ্বেতচন্দন, গলায় তুলসীমালা। দুহাতে দুই মন্দিরা। তিনজন গাইছেন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। পায়ের কাছে বসে আরো ক-জন। একই বেশবাস তাঁদের। তাঁরাও গলা মিলিয়েছেন,—তাঁদের কারো হাতে করতাল, কারো কোলে মৃদঙ্গ।

কালে কালে তুমি রাম কৃষ্ণ হরি, নিত্যকালে তুমি শ্রীবিষ্ণু বিট্‌ঠল। তোমার জয় হোক।

জয় জয় বিট্‌ঠল রামকৃষ্ণ হরি।
পুণ্ডলিক বরদায়ী বিট্‌ঠল হরি॥

মাথার ওপর শাদা চাদরের চৌকো চাঁদোয়া,—চাঁদোয়ার ঠিক মাঝখানে লাল শ্রীপদচিহ্ন। তার ওপরে শরৎ রাত্রির আকাশ। জনপদের আলোক-আভার লঘু সংকেত এক দিগন্তে,—অন্য দিকে নদীপারের দূর চক্রবাল অসীম আঁধার। নদীবক্ষের ঘন কুয়াশা আস্তে আস্তে ওপরে উঠছে। চাঁদের হাসি আধ-ঘুমন্ত পাখির শিসের মতো মৃদু।

চাঁদোয়ার নিচে একটি কোণে বসবার সুযোগ পেয়েছিলাম। চেরিল আর আমি পাশাপাশি। কান্‌হাইয়ানাল পাম্প ঠেসেছিল ভালোই,—জোরদার গ্যাসবাতিগুলোর আলো। পাটাতনের তিন দিক ঘিরে শ্রোতার দল। নামগানের আকর্ষণে ছুটে-আসা মানুষের ভিড়, মন্দিরা-মৃদঙ্গের শব্দতরঙ্গের আমন্ত্রণে ঘন জমায়েত।

একা কখনো গান হয় না, গাইতে হয় দুজনে। গাহিবে একজন খুলিয়া গলা, আরেক জন গাবে মনে। জ্ঞানদেবের রচনা,—সাতশো বছরের প্রাচীন মারাঠী ভাষা। সম্যক্ অর্থ বোঝার ক্ষমতা আমার নেই। যদি একা ঘরে বসে রেকর্ডে শুনতাম,—তাহলে একসঙ্গে গাইতে পারতাম না। না বুঝতাম মানে, না বুঝতাম ভাব, না ধরতে

পারতাম সুর। কিন্তু আলন্দীপুরে ইন্দ্রায়ণী তীরে ভক্তজন সঙ্গে বসে শুনছি,—গাইতে পারছি বৈকি। উচ্চারণের সঙ্গে-উচ্চারণ মিলিয়ে গলা ছেড়ে না গাই,—মনে মনে গাইছি। ভক্তমনের মাধুরীধারায় আপন মনের আকৃতিকেও সমর্পণ করছি।

বেদসংখ্যা চার, দর্শন ছয়,
পুরাণ অষ্টাদশ,—
সকল শাস্ত্র মন্থনরস
অমিয় নিদান হরিনামে।
ত্রিগুণ অসার নির্গুণই সার
অনর্থ ভরা বৃথাই বিচার,
অন্তর ভরি আছে সারাৎসার
রামকৃষ্ণ মন্ত্র হরিনামে॥

পদের শেষে আখর,—

নিবৃত্তিদাস গাহে জয় জয় হরি।
জয় জয় বিট্‌ঠল রামকৃষ্ণ হরি॥

আসরের শেষে রাতের আশ্রয়ে ফিরে যাব। মন্দিরের পেছনে বাজারের রাস্তায় আমার প্রবাসীগৃহে। পূর্ণচৈতন্যকে বলেছিলাম,—কাল ভোরেই আপনার কাছে চলে আসছি মহারাজ। এখন থেকে আপনিই আমার আশ্রয়।

ফস্ করে বলে উঠল চেরিল,—সে কী কথা বাঙাল সখা? কাল ভোর থেকে সারাটা দিন তুমি যে আমার সঙ্গে কাটাবে?

তাই নাকি? কেন বলো তো?

একটা জায়গা দেখতে যাব তোমার সঙ্গে।

কোন্ জায়গা?

কাল খুব ভোরে বাসস্ট্যাণ্ডে এসো, তখন বলব। আসবে তো? কই বাপ্পা, আমার হয়ে বলো না একটু লোকটাকে।

শান্ত কোমল স্নেহের হাসি হেসেছিলেন পূর্ণচৈতন্য। সে হাসির মধ্যে আমি কেমন করে ঢুকব? পূর্ণচৈতন্যজীকে আমি মহারাজ বলে ডাকি, এই স্বাভাবিক নামে আরো অনেকেই তাঁকে ডাকে। আর এই বিদেশী মেয়ে দেখি তাঁকে ডাকে বাপ্পা বলে। কেন ডাকে? কোন্ সুবাদে? কোন্ অন্তরঙ্গতায়? মহারাষ্ট্রের পাহাড়-জঙ্গলবাসী সংসার-বিরাগী সাধু, তুমি আমার বাপ! আমি সমুদ্রপারের বিদেশিনী,—ভিন্ আমার রক্ত, ভিন্ আমার দেশ ভাষা সংস্কৃতি,—তবু আমি তোমার মেয়ে। এ সম্পর্ক কেমন করে গড়ল? কোথা থেকে কোন্ টানে এল এই অখ্যাত জনপদ আলন্দীতে? আর পরকে চকিতে আপন করে নিয়ে কেমন সহজে আমাকে ডাকছে সখা বলে?

ঠিক আছে ভায়া, কালকের দিনটা তুমি চেরিলকেই দাও। বুড়ো বাপের সঙ্গে থেকে থেকে বেচারী হাঁপিয়ে উঠেছে।

তাই ভোর হতে না হতে বাসস্ট্যাণ্ডে এসেছি। আমারও আগে এসেছে চেরিল,—হাসিমুখে হাত ধরে টেনে নিয়ে গেছে বাসস্ট্যাণ্ডের চায়ের দোকানে,—যার উনুনে তখনই গনগনে আঁচ, তার ওপরে টগবগে কেটলি।

চা-চিঁউড়ার ব্রেকফাস্ট খেতে খেতে চেরিলকে জিজ্ঞাসা করলাম,—

কাল সন্ধ্যে থেকে অমন মিস্‌টিরিয়াস হয়ে আছ কেন সখি? কোথায় যাচ্ছি আমরা?

আঙুল উঁচিয়ে বললে,—কেন? উই তো আমাদের বাস।

বাস তো বুঝলাম, কিন্তু যাচ্ছি কোথায়?

আহা, জানো না বুঝি? সব যাত্রী যেখানে যাচ্ছে,—সেখানে।

উত্তরটা ভালোই দিয়েছে চেরিল। আলন্দীর বাস-স্টেশনে প্ল্যাটফরম একাধিক। কয়েক দিকে বাসের যাওয়া-আসা। প্রধান গন্তব্য পুণা। পুণা থেকে আসছে, পুণায় যাচ্ছে। সারাদিন বিরাম নেই।

এখন কিন্তু একটিমাত্র বাসই যাই-যাই করছে। ড্রাইভার বনেট খুলে যন্ত্রপাতি নাড়ানাড়ি করছে। কনডাক্টর ঘন্টি বাজিয়ে যাত্রী ডাকছে। ছোটখাটো চেহারার বাস ক্রমে ভরে উঠছে। কেউ আসছে ধীর কদমে। কেউ আসছে তড়িঘড়ি।

চেরিল আশ্বাস দিয়েছে আমাদের সীট রিসার্ভড, আমাদের তাড়া নেই। ড্রাইভার তার সীটে উঠবে, স্টার্টের আওয়াজ কানে আসবে,—তখন চট্ করে উঠে পড়লেই হোলো।

চায়ের গেলাসে চুমুক দিয়ে বললাম,—তা বেশ বলেছ সখি,—সবাই যেখানে যায় সেখানেই আমরা যাব। নইলে তোমাতে আমাতে নিরুদ্দেশ যাত্রা করতে হবে যে।

চোখ পাকিয়ে আমার দিকে তাকাল। তারপর ফিক্ করে হেসে ফেলল। গালের পাশের চুলের গুচ্ছ ঘণ্টার মতো দুলে উঠল।

মরে যাই! তোমার সঙ্গে নিরুদ্দেশ যাত্রা? কোন্ দুঃখে? মাত্র একদিনের চেনা, পথের আলাপ,—তবু শখ ছাখো!

সঙ্গে সঙ্গে গুন্‌গুন্ করে উঠল,—নোন্ ওয়েজ আইল গো উইথ্ দী,—বাট নেয়ার টু দি আন্‌নোন্!

কাল সন্ধ্যেবেলা প্রথম দর্শনেই যাকে আশ্চর্য লেগেছিল, আজ সকালে তাকে বেশ ভালোও লাগছে। খাসা লাগছে চেরিলকে। বেশ পাগল-পাগল ব্যবহার আর আবোল-তাবোল কথা। সেই সঙ্গে গুন্‌গুনিয়ে গানের কলি। গান গেয়ে বলে কিনা আমি তার অচেনা, অচেনা লোকের সঙ্গে অচেনা পথে সে পা বাড়াবে না।

হঠাৎ মনে পড়ল। কাল একথাটা মাথায় আসেনি। মহারাজের সংস্পর্শে ভুলেই গিয়েছিলাম। এবার মনে পড়তে বললাম,—

ঠিক বলেছ চেরিল, তুমি আমার অচেনা, আমিও তোমার অচেনা। বিলকুল অচেনা। তবু কাল মন্দিরে ঐ অচেনার ভিড়ে তুমি আমাকে চিনে চিনে ধরলে কী করে বলো তো?

প্রশ্ন শুনে গান বন্ধ। কুঁচকোনো ভুরু, চোখের দৃষ্টি সরু। ঠক্

করে চায়ের গেলাসটা বেঞ্চিতে নামিয়ে ফোঁস করে উঠল,—বলব কেন?

মনের কৌতূহল বুদ্‌বুদের মতো। এক লহমায় রংবাহার হয়ে ফুটে উঠে। আর এক লহমায় ফুস করে বাতাসে মিলিয়ে যায়। তা নইলে প্রশ্নের শেষ ছিল নাকি? রূপটি মাত্র দেখেছি, আর নামটি মাত্র জানি,—তাতেই কী সব জানা হয়? কে তুমি? কার কুমারী, কাহার নারী, কোথায় তোমার দেশ? কেন এমন বেশ? কেন এখানে আগমন?

একটি প্রশ্নও এখনো করিনি। কৌতূহল বুদ্‌বুদের মতো বলেই। পথে পথে আছ, পাশে পাশে আছ। বেশ তো, থাকো না,—আবার যখন চলে যাবে চলে যেয়ো। কী হবে তোমার হাঁড়ির খবর জেনে?

অচেনা অচেনাই থাকুক। অচেনা বলেই বিচিত্র,—হঠাৎ খুশীতে বিচিত্র, তেমনি হঠাৎ বিরাগে। অচেনা বলেই মনোহর।

আমি তার হাঁটুটা সাবধানে ছুঁলাম।

কী হোলো? রেগে উঠলে কেন এমন করে?

রাগব না? বোকা-বোকা কথায় রাগ ধরে না?

আমি তাজ্জব। কথা ছাখো মেয়েটার!

তার মানে? বোকা বোকা কথা আবার কোথায় বললাম?

শোনো তাহলে। কাল মহারাজের কাছে বসে ঐ গুণ্ডা সাধুটা তোমার কথা বলছিল।

গুণ্ডা সাধু? কে? কানহাইয়ালাল?

হ্যাঁ হ্যাঁ, ঐ কানহাইয়ালাল। তোমার কতো দিনের বন্ধু, হঠাৎ আবার দেখা, মন্দিরের চাতালে বসিয়ে রেখে এসেছে,—ঐসব আর কী? তারপর দেখি,—ওমা, স্রেফ আড্ডায় জমে গেল,—আর নড়ে না। ব্যাপার দেখে আমি মহারাজকে বললাম,—বাপ্পা, আমি লোকটাকে খুঁজে নিয়ে আসি?

তাতো বুঝলাম। কিন্তু চেরিল, কানহাইয়ালাল তো তার ঝুলি

থেকে আমার ছবি বার করে তোমাকে দেখায় নি,—অতো ভিড়ের মধ্যে ঠিক ঠিক মানুষটাকে চিনলে কী করে?

হাসির ঝনৎকার তুলল এবার। এমন বোকা তুমি! এইজন্যেই তো রাগ ধরে!

বেশ, আমি বোকা তো বোকা,—বোকাকে একটু বুঝিয়েই বলো না তোমার বুদ্ধিটা!

এ আর এমন শক্ত কী বাঙাল সখা?

ডানহাতের আঙুল দিয়ে আমার পাঞ্জাবীর বুকের কাছটা চেপে ধরল।—এই ছাখো না, তোমার আর আমার জামার একই রঙ। এক রঙ বলেই চিনেছি, এক রঙ বলেই সখা বলে ডেকেছি।

এক রঙই বটে। একেবারে এক না হোক, খুব কাছাকাছি। চেরিলের কামিজ সোনালি হলুদ আর আমার পাঞ্জাবি-পাজামা মেটে গেরুয়া। এই রঙের ইঙ্গিত নিশ্চয় কানহাইয়ালাল দিয়েছিল। নজর আছে মেয়েটার, বুদ্ধিও প্রখর। খুঁজে খুঁজে ঠিক ধরেছে।

ছাখো কেমন উল্‌টো ব্যাপার। কেউ আমাকে চিনবে না, কেউ খুঁজে পাবে না সেইজন্যেই তো গেরুয়া ধরেছি। আর গেরুয়াই কিনা ধরিয়ে দিল চিনিয়ে দিল আমাকে! অচেনাকে বাঁধল চেনার বাঁধনে!

॥ ৮ ॥

আলন্দীর আধো-জাগা বাজার ছাড়িয়ে ফাঁকা রাস্তায় বাস ছুটছে। দুপাশে শান্ত নম্র ক্ষেতের বুকে কুয়াশার স্বচ্ছ আঁচল। দূরের কুটীরগুলি ঘুমন্ত,—চাষাবৌ-এর উনুন থেকে কোথাও কোথাও ধোঁয়ার কুণ্ডলী আকাশে মুখ তুলতে চেষ্টা করছে। কোন্ গৃহস্থের গোয়াল থেকে মাঠে বার হয়েছে দু-চারটে গোরু-মোষ।

যাত্রীবোঝাই বাস মাঝপথে থামবে বলে মনে হয় না। সকলের

একই লক্ষ্য একই গতি। দাঁড়ানো যাত্রীরাও অনেকেই বাসের পাটাতনে হাত-পা গুটিয়ে উবু হয়ে বসে পড়েছে। পেছনদিকে একদল মেয়ে চাপা গলায় গান ধরেছে,—ওভি গানের নরম ঘুমপাড়ানী সুর। ভোরবেলাকার প্রশান্তি আর পল্লীগীতির মাধুর্যকে বিরক্ত করবার মতো উচ্চ কণ্ঠ নেই। বরং তন্দ্রার ঘোর লেগেছে কারো চোখে, মাথা হেলছে পাশের লোকের কাঁধে।

চেরিলের মুখও বন্ধ। বাস ছাড়বার সঙ্গে সঙ্গেই ব্যাগ থেকে একটা পাকা পেয়ারা বার করেছিল। কয়েক কামড় চিবুতে না চিবুতেই ঢুলুনি এসেছে তার। কন্‌ডাক্‌টারও সীটে বসে ঢুলছে। এতগুলো ঝিমোনো মানুষের ঝক্কি নিয়ে জেগে আছে শুধু সামনের ঐ ড্রাইভার। তার হাত কাজ করছে, পা কাজ করছে। চোখ চকচক করছে। আর নিশ্চল ছায়া-ছায়া পরিবেশ কেটে ঝকঝক ছুটেছে আমাদের বাস।

কতোটুকুই বা যাত্রা? পথের ব্যবধান মাত্র দশ বারো মাইল। কালের ব্যবধান তিন শতাব্দীর বেশী। আমরা চলেছি দেহুতে,— যেখানে তুকারামের স্মৃতিতীর্থ। জ্ঞানেশ্বরজীর তিনশো বছর পরে যেখানে আবির্ভূত হয়েছিলেন সাধকপ্রবর তুকারাম।

এই তিন শতাব্দীর ইতিহাসে কতো বিবর্তন, কতো আগন্তুকের অনুপ্রবেশ, কতো রাজ্যের ওঠাপড়া। কতো যুদ্ধ, কতো জয়-পরাজয়। ইতিহাসের অধ্যায়ের পর অধ্যায়।

সাধারণ মানুষ যারা মাঠে ফসল ফলায়, অঙ্গনে পণ্য তৈরি করে, হাটে মাল বেচাকেনা করে, ইতিহাস তাদের কথা লেখে না। রাজবংশের ইতিবৃত্তে তাদের ঠাঁই নেই। রাজা যদি উদার হয় তারা শান্তিতে থাকে। যদি শোষক হয় তাহলে দুর্বহ হয় জীবন। আর শোষক যদি হিংস্র হয়, তাহলে তো দুর্দশার অন্ত থাকে না। কখনো স্বস্তিতে কখনো ত্রাসে কখনো আর্তিতে সাধারণ প্রজার জীবন কাটে।

রাজা থাকেন প্রাসাদে, প্রজা মাথা রাখে তার কুটীরে। প্রজার

আনন্দ-বেদনার খবর রাজার কানে পৌঁছবার নয়। তাদের হাসি-কান্নার জোয়ার-ভাঁটার কল্লোল এই তিন শতাব্দী ধরে একটি আশ্বাস-জাগানো সুরে একটি আত্মনিবেদিত গানে বেজে ওঠে,—জয় জয় বিট্‌ঠল রামকৃষ্ণ হরি। তিন শতাব্দীর আগে ব্রাহ্মণ-বংশীয় সন্ন্যাসী-সন্তান পরম বেদজ্ঞ জ্ঞানেশ্বর যে মন্ত্রলাভ করেছিলেন, তিনশো বছর পরে চাষীর অশিক্ষিত ছেলে ব্যর্থ ব্যবসায়ী তুকারামও শুনিয়েছিলেন সেই একই মন্ত্রগান,—

জয় জয় বিট্‌ঠল রামকৃষ্ণ হরি।

মহারাষ্ট্র।

সারা ভারত জুড়ে আরো কতো রাজ্য। কিন্তু মহারাষ্ট্র নামটির জুড়ি নেই। মহারাষ্ট্রবাসীদের দারুণ গর্ব,—এ রাষ্ট্র যে মহান্ রাষ্ট্র! তাই মহারাষ্ট্র এর নাম।

যাঁরা ইতিহাসনবীস, তাঁরা এই নামের মাহাত্ম্য বর্ণনায় প্রাক্তনীর নজীর টানেন। বলেন,—এ নামের সূচনা খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে। সেই বুদ্ধদেবের জন্মমুহূর্তে। বিশেষ করে খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দী থেকে, যখন রাজানুগ্রহে আর্যাবর্তে বৌদ্ধধর্মের বন্যা বয়ে যায়।

বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে রফা করতে পারেনি এমনি অসংখ্য উত্তর-ভারতীয় আর্যহিন্দু নিজেদের ব্রাহ্মণ্যধর্ম আর রীতিনীতি রক্ষা করবার জন্যে দক্ষিণ দেশে চলে এসেছিল। সাধারণ প্রজারা রাজধর্মে বশীভূত তো হবেই, দাক্ষিণাত্যগামী হয়েছিলেন বিশিষ্ট মহারাষ্ট্রিকরা। রাজ্যনাশ সম্ভ্রমচ্যুতি স্বধর্মগ্লানির বেদনা নিয়ে তাঁরা গঙ্গাযমুনার উপত্যকা ত্যাগ করে গোদাবরীর উপত্যকায় আশ্রয় নিয়েছিলেন। সেই মহারাষ্ট্রিকদের স্মরণে এ রাজ্যের নাম মহারাষ্ট্র।

হিন্দু যুগের বৃহত্তম সাম্রাজ্য মৌর্য সাম্রাজ্য। সুদূর দক্ষিণের চের-চোল-পাণ্ড্য ছাড়া সারা ভারতভূমি এক সাম্রাজ্যের পাশে বাঁধা পড়েছিল। সম্রাট অশোকের পর মৌর্য সাম্রাজ্য ভাঙতে বেশি দেরি

হয়নি। তারপর থেকে মহারাষ্ট্র আর কখনো উত্তর ভারতের কোনো হিন্দু সাম্রাজ্যের অধীন হয়নি। সাম্রাজ্যের পর সাম্রাজ্য আর্যাবর্তে উঠেছে পড়েছে,—কুশান সাম্রাজ্য, গুপ্ত সাম্রাজ্য, হর্ষবর্ধনের সাম্রাজ্য, গুর্জর প্রতিহার সাম্রাজ্য,—কোনো সাম্রাজ্যই মহারাষ্ট্রকে গ্রাস করতে পারেনি। দাক্ষিণাত্যের বিভিন্ন রাজশক্তির আশ্রয় ছিল কৃষ্ণা-গোদাবরীর উপত্যকা। সাতবাহনদের পর ত্রৈকূটক-বাকাটক, তারপর চালুক্য-রাষ্ট্রকূট আর শেষ পর্যন্ত যাদব।

মহান্ রাষ্ট্র মহারাষ্ট্রে জ্ঞানেশ্বরজী যখন আবির্ভূত হন তখন যাদবরাজ রামচন্দ্রদেবের আমল। রাজধানী দেবগিরি। মানচিত্র খুঁজলে এখন অবশ্য দেবগিরি পাওয়া যাবে না—সে নাম মুছে গেছে। তার জায়গায় নাম হয়েছে দৌলতাবাদ। দেবগিরিতেই ছিল যাদব রাজপ্রাসাদ। সে প্রাসাদের ধ্বংসস্তূপের ওপর তুর্কী জয়স্তম্ভ চাঁদমিনার এখন মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে।

মহারাষ্ট্রের নিজস্ব রাজবংশ এই যাদববংশ। রাজধানী দেবগিরি একেবারে মহারাষ্ট্রের মাঝখানে। যাদবদের অভ্যুত্থান দ্বাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে। যাদব রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বিল্লম আর শেষ সার্থক রাজা রামচন্দ্রদেবের মধ্যে প্রায় একশো বছরের ব্যবধান। রাজ্য রক্ষা আর রাজ্য বিস্তারের জন্যে যাদবরাজারা সমানে যুদ্ধবিগ্রহ করেছিলেন। সেই সঙ্গে তাঁরা ছিলেন বিদ্বান আর বিদ্যোৎসাহী। তাঁদের পৃষ্ঠ-পোষকতায় রচিত হয়েছিল শার্ঙ্গধরের সঙ্গীত-রত্নাকর, ভাস্করাচার্যের সিদ্ধান্ত-শিরোমণি, অমলানন্দের বেদান্ত-কল্পতরু, হেমাদ্রির চতুর্বর্গ-চিন্তামণি, বোপদেবের মুগ্ধবোধ। বহুমুখী প্রতিভাধর হেমাদ্রি ছিলেন রাজা রামচন্দ্রদেবের মুখ্যমন্ত্রী। স্থাপত্যশিল্পে তিনি এক নতুন ধারার প্রবর্তন করেন। সেযুগের মন্দির-স্থাপত্যে হেমাদপন্থী ধারার প্রকাশ।

যাদবরাই ছিলেন প্রথম খাঁটি মারাঠা রাজা। তাঁদেরই আমলে প্রজারা নিজেদের মারাঠা বলে ভাবতে শিখেছে, তাদের মনে মারাঠা জাতীয়তাবাদের বীজ অঙ্কুরিত হয়েছে। সংস্কৃতের পণ্ডিতী

পাগড়ি মাথার ওপর থাকলেও মুখে মুখে গড়ে উঠেছে মারাঠা জাতির নিজস্ব মারাঠী মাতৃভাষা। সে ভাষায় সাহিত্য রচনাও শুরু হয়েছে। মারাঠী ভাষার আদি কবি মুকুন্দরাজ রচনা করেছেন আদি কাব্যগ্রন্থ বিবেকসিন্ধু। তারপর ধীরনির্ঝরিণী লোকভাষা গীতা জ্ঞানেশ্বরীর মাধ্যমে আপামর লোকহৃদয়ে সঞ্চারিত হয়ে গিয়েছে।

আর সেইসঙ্গে মহারাষ্ট্রের বুকে স্থায়ী আসন পেতে বসেছেন লোকদেবতা পরম ভগবান বিষ্ণুবিট্‌ঠল প্রভু। পরম ভক্ত যাদবরাজের আনুকূল্যে ভীমানদীর তীরে পান্ধারপুরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে আদি বিট্‌ঠল মন্দির।

রামচন্দ্র যখন দেবগিরির রাজা তখন সারা উত্তর ভারতে একটি হিন্দু রাজ্য নেই। বাঘা বাঘা রাজপুত বংশ,—দিল্লি-আজমীরের চৌহানবংশ, কাশী-কনৌজের গাহড়বালবংশ, গুজরাটের চালুক্য-বংশ, মালবের পরমারবংশ, বাংলা-বিহারের সেনবংশ, বুন্দেলখণ্ডের চন্দেল্লবংশ—সবাই একে একে বিদেশী পাঠান শক্তির কাছে হার মেনেছে। পাঠান আক্রমণের ঝড়ে সকল রাজার প্রাসাদই একে একে ধুলোয় লুটিয়েছে। সেই ঝড় এবার বিন্ধ্য-নর্মদা পার হয়ে পৌঁছেছে গোদাবরীর উপত্যকায়।

দাক্ষিণাত্যে তখন নামকরা রাজা বলতে চারজন। দেবগিরির যাদব রাজা রামচন্দ্র, বরঙ্গলের কাকতীয় রাজা প্রতাপরুদ্র, দোর-সমুদ্রের হয়শাল রাজা বীরবল্লাল আর মাতুরার পাণ্ড্য রাজা কুলশেখর। কারো সঙ্গে কারো মিল নেই, সদ্ভাব নেই,—খালি হিংসা আর প্রতিহিংসা।

জ্ঞানেশ্বর হিন্দু সমাজের ভালোমন্দ দেখেছিলেন, কিন্তু তুর্কী মুসলমান দেখে যাননি। তিনি সমাধিস্থ হয়েছিলেন ১২৯৬ সালে। তাঁর দেহাবসান হবার ঠিক দুবছর আগে দেবগিরির যাদব রাজ্যে তুর্কী মুসলমানের প্রথম পায়ের ছাপ। ছাপ ফেললেন আলাউদ্দিন খিলজি।

দিল্লীর মসনদে তখন খিলজি সুলতান জালালুদ্দিন। সারা উত্তর ভারত তাঁর দখলে। ভাইপো আলাউদ্দিন একেবারে তরুণ তুর্কী। উত্তুঙ্গ মেজাজ—টগবগে রক্ত। বিন্ধ্য-নর্মদা পার হয়ে দক্ষিণ মহাসাগর পর্যন্ত ছুটে যাবেন এই তাঁর অভিপ্রায়।

মহড়া শুরু যাদবরাজ্য দেবগিরিতে। রাজা রামচন্দ্রদেব প্রস্তুত ছিলেন না। যুবরাজ তখন রাজ্যের সৈন্যসামন্ত নিয়ে দক্ষিণের প্রতিবেশী রাজ্যে হানা দিতে গেছেন। রামচন্দ্র হাতজোড় করে সন্ধি ভিক্ষা করলেন,—অনেক ধনরত্ন দিয়ে আলাউদ্দিনকে সেবারের মতো বিদায় করলেন। দেবগিরি থেকে ফিরেই সার্থক চক্রান্তে পিতৃব্যকে বধ করে আলাউদ্দিন খিলজি দিল্লির সিংহাসনে সওয়ার হলেন।

তেরো বছর পরে আলাউদ্দিন খিলজির দাক্ষিণাত্য অভিযান রীতিমতো আরম্ভ হোলো। সেনাপতি মালিক কাফুরের নেতৃত্বে পাঠান সৈন্যবাহিনী ঝাঁপিয়ে পড়ল দেবগিরির ওপর। ছারখার করে দিল রাজ্য, রাজা রামচন্দ্রকে বেঁধে নিয়ে গেল দিল্লীতে।

ভারতবাসী মাত্রই সজ্জন। ভারতে প্রতিবেশীরাই দুরাত্মা। যেমন পুরুরাজের প্রতিবেশী তক্ষশিলার রাজা অম্ভি। যেমন পৃথ্বীরাজ চৌহানের প্রতিবেশী কনৌজরাজ জয়চাঁদ। তিন প্রতিবেশী হয়শাল কাকতীয় আর পাণ্ড্য রাজ্যের তিন রাজা দূর থেকে বাঁকা চোখে রামচন্দ্রের সর্বনাশ দেখলেন,—কুটোটি নাড়লেন না।

সেই যে বুড়ো চাষী চার ছেলেকে বলেছিল,—চারটে কাঠি নিয়ে একটা আঁটি বাঁধো, সে আঁটি ভাঙা শক্ত। আর আলাদা করে এক একটি কাঠি দুহাতের মুঠোয় নিয়ে টেপো, পটপটিয়ে ভেঙে যাবে।

তেমনি এক এক করে ভাঙল বাকি তিনটি কাঠি পাঠান সম্রাটের মুঠোয়। কাকতীয়, হয়শাল আর পাণ্ড্য—বাকি তিনটি রাজ্য গ্রাস করতে আলাউদ্দিনের তিন বছরও লাগল না।

মুহূর্ত থেকে মুহূর্ত, প্রত্যূষ থেকে প্রভাত—চলন্ত চাকার নিচে রাস্তার রেখা। বাস ছুটে চলেছে সমান গতিতে। গায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে শরৎ সকালের মিষ্টি বাতাস।

মেয়েপুরুষ যাত্রী। পুরুষদের হাতে লাঠি, মেয়েদের কোলে কোলে ছোট ছোট পুঁটুলি, দেহাতী তীর্থযাত্রী সব। মেয়েরা ওভিগান থামিয়েছে,—এবার নামগানে সরু-মোটা গলা।

একই সুর, একই কথা। একই ফুল সাজিয়ে সাজিয়ে মালা গাঁথা। একই লহর, একই সুবাস। কান জুড়িয়ে যায়, চোখ জড়িয়ে আসে।

কোলের পুঁটুলির ওপর কেউ পেতেছে গাল, পাশের লোকের কাঁধের ওপর কেউ নুইয়েছে ঘাড়। চেরিলের মাথা আমার কাঁধে,—তার শিথিল হাত থেকে আধ-খাওয়া আমরুদটি কখন খসে পড়েছে সীটের তলায়।

বাস ছুটছে। রোদ ফুটছে। সামনে উইণ্ডস্ক্রীনের দৃশ্য দুপাশের জানালা দিয়ে উল্‌টো ছুট ছুটে পালিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে। পেছনের দিকে তাকাতে গেলেই চেরিলের মাথাটা আমার কাঁধ থেকে ফসকে যাবে, ভেঙে যাবে ঘুম্। তাই আমি তন্দ্রালু চোখে সামনের দিকে তাকিয়ে তন্দ্রালু মনে পেছনের কথা ভাবছি,—শতাব্দীপারের দূর ইতিহাসের।

জ্ঞানেশ্বরজী গেলেন,—তার ক-বছরের মধ্যেই অস্তমিত হোলো মহারাষ্ট্রের হিন্দু গরিমা। যাদবরাজ রামচন্দ্রদেব মহারাষ্ট্রের শেষ স্বাধীন হিন্দুরাজা। তারপর তিনশো বছরের বেশি মুসলমান রাজত্ব।

মারাঠা জাতি তখন কোথায়? কোথায় তার জাতীয়তাবোধ? মহারাষ্ট্রের কোনো ঐক্যবদ্ধ ভৌগোলিক চেহারা তখন নেই, মহারাষ্ট্রের সমাজ তখন দুই ভাগে ভাগ করা। এক ভাগে মুসলমান বিজেতা,—যারা বিজিত হিন্দু প্রজার যুগসঞ্জাত সংস্কৃতিতে ধ্বংস আর লুণ্ঠন

করতে উন্মুখ, অন্যভাগে বিজিত হিন্দু,—অত্যাচারী রাজশক্তির হাত থেকে যুগসঞ্চিত সংস্কারকে রক্ষা করতে যার দুর্বল প্রচেষ্টা। রাজা বিধর্মী, প্রজা বিধর্মী।

তবে রাজতখ্‌ত পাকা করতে, রাজকার্য ঠিকভাবে চালাতে বশংবদ কিছু প্রজা চাই। রাজার ধমককে প্রজার কানে পৌঁছে দেবার উপযুক্ত দূত চাই, রাজার হুকুমকে সরেজমিন তামিল করবার বিশ্বস্ত কর্মচারী চাই। এই কাজে এগিয়ে এসেছিলেন উচ্চবংশীয় হিন্দু নায়করা। পাঠান সুলতানদের বিনীত রাজকর্মচারী হয়ে প্রজাসাধারণের শাসনে ও শোষণে তাঁরা জবরদস্ত ভূমিকা নিয়েছিলেন। হিন্দু জাতীয়তার কল্পনা পর্যন্ত তাঁরা বিসর্জন দিয়েছিলেন। মুসলমান প্রভুর স্বার্থসাধনে নিজের স্বার্থকে গুছিয়ে নেবার লোভে পরস্পরের মধ্যে বিবাদ-কলহে তাঁরা সর্বদাই লিপ্ত। ক্ষুদ্র স্বার্থ আর হীন পরশ্রীকাতরতার দৈন্যে স্বাজাত্যবোধের চিহ্নটুকু তাঁদের মন থেকে অন্তর্হিত।

সেই সঙ্গে তুঙ্গস্পর্শী জাত্যাভিমান,—উচ্চনীচ জাতিবর্ণের ভেদাভেদে হিন্দু সমাজ টুকরো টুকরো। ছুৎ আর অচ্ছুৎ, বর্ণশ্রেষ্ঠ আর ব্রাত্য, ব্রাহ্মণ আর শূদ্র, পণ্ডিত আর মূর্খ, ভূম্যধিকারী আর চাষী, কেরানী আব কর্মকার, সরকারী পোষ্য আর সাধারণ প্রজা। সমাজে যাঁরা প্রধান তাঁরাই মানুষ, দেশের সাধারণ মানুষ মনুষ্যদেহধারী মাত্র। তাদের দূরে রাখো, তাদের কাছ থেকে দূরে থাকো।

এই সাধারণ মানুষের বুকের অঙ্গারেই জাতীয়তার স্ফুলিঙ্গ, এই সাধারণ মানুষের মুখেই জ্ঞানেশ্বরজীর মারাঠী ভাষা। বিদেশী বিধর্মী রাজশক্তি তাদের শাসক, স্বদেশী উচ্চকোটির দল তাদের শোষক। সেই অন্ধকার যুগে সাধারণ মানুষকে ডাক দিয়েছিলেন কয়েকজন সাধক কবি। গীতা জ্ঞানেশ্বরী তাঁদের মন্ত্র, বিট্‌ঠল ভগবান তাঁদের ঈশ্বর। তাঁরা জন্মেও ছিলেন সাধারণ মানুষের সংসারে। ভক্তি প্রেম আর উদার মানবতাবোধের মহানুভাবনায় মারাঠা জনচিত্তকে

উদ্‌বুদ্ধ করেছিলেন। তাঁরা উচ্চনীচের ভেদাভেদকে ধিক্‌কার দিয়েছিলেন,—সকল মানুষকে একাত্ম করেছিলেন করুণার আলিঙ্গনে।

এই মহানুভাবনার প্রথম উদ্‌গাতা সন্ত জ্ঞানেশ্বর। ভারতাত্মার দৃঢ় প্রত্যয় তাঁর মনে ছিল। তিনি মুসলমান শাসন দেখেননি, কিন্তু দেখেছিলেন উচ্চনীচের বর্ণভেদ কেমন করে জাতিকে পঙ্গু করছে, ব্যর্থ করছে। তিনি জানতেন ধর্মবন্ধনই জাতির শ্রেষ্ঠ বন্ধন, ধর্মই একতার গ্রন্থি। সংস্কৃত গীতাকে লোকভাষায় অনুবাদ করে তিনি হিন্দুর ধর্মশিক্ষার দ্বার সাধারণ মানুষের কাছে উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন।

তারপর শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে এই মহান্ রাষ্ট্রে আবির্ভূত হয়েছেন একের পর এক সাধক কবি,—ঈশ্বরানুগৃহীত সন্ত। তাঁরা পণ্ডিত নন দার্শনিক নন,—তাঁরা মরমী কবি। তাঁরা সমাজ-সংসার ছাড়া সন্ন্যাসী নন, তাঁরা সমাজ-বান্ধব সংসারী বৈরাগী। তাঁরা উদাসীন নন, প্রেমিক,—তাঁরা যোগী নন, ভক্ত। তাঁরা বক্তৃতা দেননি, গান গেয়েছেন। তাঁরা তাঁদের জীবনাদর্শ দিয়ে আর লোকসঙ্গীত লোকসাহিত্যের মাধ্যমে জাতিধর্মনির্বিশেষে মারাঠা জনগণকে ঐক্যবোধ আর আত্মত্যাগব্রতে অনুপ্রাণিত করেছেন। মহারাষ্ট্র-বাসীর মনে জাতীয়তার প্রেরণা জাগিয়েছেন।

তিনশো বছর পাঠান শাসনের পরে দাক্ষিণাত্যে হাত বাড়াল দিল্লির মুঘল শক্তি,—পাঠান সুলতান আর হিন্দু প্রধান উভয়েরই শান্তি আর স্বস্তি হোলো বিঘ্নিত। সাধারণ প্রজা পেল ধর্মবিদ্বেষ আর জাতিবৈরিতার তিক্ত বিষের নতুন স্বাদ। দিল্লীশ্বর নতুন করে হুকুম দিলেন হিন্দু মন্দির ভাঙতে আর হিন্দু প্রজাদের ওপর জিজিয়া কর বসাতে।

এই মুঘল অভিযানকে রোধ করার শক্তি কার? সুলতানরা ভিন্ন ভিন্ন হয়ে সর্বদা যুদ্ধবিবাদে লিপ্ত,—প্রজারাও একই দুর্বলতায় অবসন্ন। সারা উত্তর ভারতের প্রতিরোধকে চূর্ণবিচূর্ণ করে দুর্মদ

মুঘল দক্ষিণে হানা দিয়েছে,—দাক্ষিণাত্যের পাঠান-হিন্দু ঠকঠক করে কাঁপছে।

এমন সময় আবির্ভূত হলেন এক আশ্চর্য নেতা,—স্বামী-পরিত্যক্তা দুঃখিনী জননীর কোলে শিবাজী। শিবাজী উপলব্ধি করলেন দাক্ষিণাত্য যদি মুঘল অধিকারে যায় তাহলে সমস্ত জাতি ধ্বংস হয়ে যাবে। সেই অধিকারকে ঠেকানো পাঠান সুলতানদের সম্ভব নয়, হিন্দু রাজকর্মচারী আর জায়গীরদারদেরও সম্ভব নয়। সেই নেতার পক্ষেই সম্ভব যিনি জাতির কোলে জন্ম নেবেন, জাতির ভালোমন্দের সঙ্গে একাত্ম হবেন। যিনি সাধারণ মানুষের প্রাণে জাতীয়তাবোধকে জাগ্রত করতে পারবেন। জাতির প্রাচীন গরিমার সঙ্গে ভবিষ্যতের সম্ভাবনার দৃঢ় বন্ধন ঘটাতে পারবেন। মহারাষ্ট্র জাতির প্রাচীন গরিমা হিন্দু গরিমা,—যিনি সমস্ত মহারাষ্ট্রকে এক করে আবার হিন্দু রাজ্য স্থাপনের স্বপ্ন দেখতে পারবেন।

শিবাজীর চোখে সেই স্বপ্ন,—এক ধর্মরাজ্য-পাশে খণ্ড ছিন্ন বিক্ষিপ্ত ভারত বেঁধে দিব আমি।

ব্রেক কষে বাস থামল। ঘুচে গেল তন্দ্রার আবেশ।

ওঠো, ওঠো চেরিল,—পৌঁছে গেছি যে!

হুড়মুড়িয়ে যাত্রীরা নামছে। আমাদের সীট একেবারে সামনের দিকে, নামার মুখে আমরা সকলের পেছনে।

এ আর এক জনপদ। ঐ ইন্দ্রায়ণীরই তীরে। নাম দেহু। আলন্দীর মতো আর এক সন্তস্মারক তীর্থ। এই দেহুতে একদিন এসেছিলেন শিবাজী। সন্ত তুকারামের চরণে প্রণিপাত করে করজোড়ে প্রার্থনা করেছিলেন,—

প্রভু, আমাকে মন্ত্র দিন!

॥ ৯ ॥

ভক্তগণ বলে,—বিদেহী তুকারাম। তার মানে? বিদেহী,—এই বিচিত্র বিশেষণ কেন? দেহ নেই তুকারামের? দেহ ছাড়া মানুষ হয় নাকি,—পার্থিব মানুষ?

আছে, দেহ আছে বৈকি তুকারামের।

চরণ আছে,—তীর্থে তীর্থে চলে, হাত আছে,—বাজে মৃদঙ্গ-মন্দিরা, চোখ আছে,—প্রেমাশ্রুসলিলে ভাসে, কণ্ঠ আছে,—অহর্নিশি অভঙ্গগীতি গায়।

দেহ আছে, কিন্তু দেহবোধ নেই,—তাই তুকারাম বিদেহী। সর্বচিন্তা শ্রীবিট্‌ঠলে সমর্পিত, তাই দেহ নিয়ে কোনো চিন্তা নেই। খাদ্য জোটে খাব, নইলে খাব না। আশ্রয় জোটে শোবো, নইলে শোবো না। প্রভু, তুমিই আমার ক্ষুধা, তুমিই আমার পূর্তি, তোমারই আলোয় জাগরণ, তোমারই কোলে সুষুপ্তি। ষড়রিপু আছে বৈকি,—তারা তো দেহেরই ভূষণ। সেই ভূষণ নিজের দেহ থেকে খুলে খুলে তোমারই শ্রীঅঙ্গে পরিয়েছি, দেহের শৃঙ্খলকে মালায় রূপান্তরিত করে তোমারই গলায় দুলিয়েছি।

তাই দেহ থেকেও দেহ নেই,—তুকারাম বিদেহী।

কিন্তু সমাজ তো আছে,—সমাজের শৃঙ্খল তো আছে। বড়ো আর ছোট, ধনী আর গরিব, উঁচু আর নীচু, বর্ণ আর ব্রাত্যে ভাগে ভাগে ভাগ করা সমাজ। ভক্তি খুলে দেয় মুক্তির দ্বার, সমাজের হাতে বাঁধনের রশি। ভক্তের প্রাণে প্রেমিক প্রভু, সমাজের প্রভু লোকাচার।

জাতে শূদ্র, পেশায় দোকানী, বিদ্যেয় অষ্টরম্ভা, বুদ্ধিতে ঢেঁকি। কানাকড়ির মুরোদ নেই, জাতব্যবসা কবে খুইয়েছে, ছেলে বউ-এর অন্নবস্ত্র জোটে না। একটা বউ না খেতে পেয়ে মরেছে, আর একটা বউ খিদের জ্বালায় এমন চেঁচায় যে পাড়ায় টেঁকা ভার।

কিন্তু দুষ্ট বুদ্ধির সীমা নেই। কপালে তিলক আর গলায় তুলসী মালা পরে গোঁসাই সেজেছে, নিষ্কর্মা বাউরা হলে ঢুলুঢুলু চোখে রাস্তায় রাস্তায় গান গেয়ে গেয়ে ফিরছে।

তা ফিরুক। কিন্তু পাগল সেজে অপরকে যে পাগল করছে! শুধু তাল-সেবকই জুটিয়েছে চোদ্দটা,—যাদের কাজ ওর গানের তালে তাল বাজিয়ে নাচা। অ্যাঃ? ঐ তাল-বাজিয়ের দলে বামুনের ছেলেও যে জুটে গেছে! আর বুকের পাটা দ্যাখো! শুদ্দুর হয়ে কী গাইছে শুনছ?

তুকারাম গাইছেন,—

নির্গুণ তুমি পরম ব্রহ্ম
নাহি রূপ নাহি নাম,—
ইন্দ্রিয়াতীত চির বিরাজিত
কোথায় তোমার ধাম?
তব বর্ণনে মূক হোলো বেদ
জানে না তোমারে শ্রুতি,—
অজ্ঞ পুরাণ বোঝে না তোমায়
বৃথা করে তব স্তুতি।
যাগযজ্ঞ পূজা-উপচার
পায় না তোমার চরণ,
যোগীর সিদ্ধি ভোগীর ঋদ্ধি
করে না তোমায় বরণ।
গুণাতীত তুমি সগুণ হয়েছ
ভক্ত-আকুলতায়,—
পুণ্ডলিকের বিট্‌ঠল হরি,
তব নাম তুকা গায়॥

শূদ্র হয়ে বেদ পুরাণের নিন্দা করছে? যাগযজ্ঞ তপশ্চর্যাকে নস্যাৎ করে দিচ্ছে? সর্বনাশ! নীচ ভণ্ডটাকে একেবারে ঠাণ্ডা করতে হবে। এমন শাস্তি দিতে হবে যে জীবনে ভুলবে না!

রেগে আগুন সমাজপতিরা। চাপ দিলেন নগর-কোটালের ওপর,—ব্যাটাকে আমরা একঘরে করেছি, তুমি এবার দেশছাড়া করে দাও।

হুকুম তামিল হতে দেরি হোলো না।

তুকা তখন গাইছেন,—

ওহে পাণ্ডারী ভবকাণ্ডারী
জনক-জননী তুমি,
অচিন লীলার তুমি ভাণ্ডারী,—
কেড়ে নিলে মোর ভূমি !
ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে দিলে তুমি
মহিমা তব কী কব ?
তব গান গেয়ে পথে পথে ফিরে
তোমারি শরণ লব ॥

গানের ভিতর দিয়ে দেখি ভুবনখানি। ঘর গেল, ভুবন তো আছে। আশ্রয় গেল, নিরাশ্রয়ের তুমি তো আছ ভুবনেশ্বর। আমার গান আছে, তাই সব আছে।

তাই তো! ভিটেছাড়া করেছি, গানছাড়া তো করতে পারিনি ব্যাটাকে! গান গেয়ে গেয়ে পথে পথে ফিরছে, পিছনে পিছনে চলেছে অজস্র লোক। পল্লীর আকাশটুকু মাত্র গানের সুরে ভরে থাকত,—এখন দিগন্ত ছাড়িয়ে দূরান্তে ছড়িয়ে যাচ্ছে অভঙ্গ সঙ্গীত-লহরী।

দাঁড়াও! সামনে পথ আটকে সমাজপতির হুংকার।

গান থামল। তুকারাম বিনয়নম্র ভঙ্গিতে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়ালেন।

শোন্ তুকা, ধর্মসংস্কারকে তুই স্বেচ্ছায় অবজ্ঞা করেছিস, লোকাচার থেকে ভ্রষ্ট হয়েছিস,—তুই মহাপাপী। এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত শুধু নির্বাসনে হয় না। এর জন্যে তোকে আরো শাস্তি পেতে হবে।

তুকারাম বললেন,—আপনারা ব্রাহ্মণ, আপনারা শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত, আপনারা উচ্চকোটি সমাজের প্রতিভূ। আপনারা যখন বলছেন

তখন নিশ্চয়ই আমি পাপী। আপনাদের দেওয়া শাস্তি আমি মাথায় পেতে নেব।

উত্তরীয়ে বেঁধে কী নিয়ে চলেছিস তুই?

কিছু না, সামান্য ধন,—আমার গানের পাণ্ডুলিপি।

অনেক গান হয়েছে, আর নয়। তুমি মূর্খ, তুমি নীচ, তুমি শূদ্র,—তোমার আবার গান কীসের? নদীতীরে যাও, ইন্দ্রায়ণীর জলে নিজের হাতে তোমার সমস্ত পাণ্ডুলিপি বিসর্জন দাও। এই তোমার শাস্তি।

সমাজপতিদের শাস্তি মাথায় পেতে নিলেন তুকারাম। পায়ে পায়ে গেলেন ইন্দ্রায়ণীর তীরে। সব পাণ্ডুলিপি ছুড়ে ফেলে দিলেন জলে। স্তব্ধ ভীরু নিষ্প্রতিবাদ জনতা চুপ করে রইল, সমাজপতিরা খলখল হেসে ফিরে গেল।

আর গান নেই। ছন্দহীন সুরহীন শুধু অস্ফুট প্রার্থনা।

প্রভু, এখনো কি সময় হয়নি?
আমার সহায় নেই, সম্বল নেই,
কিছু নেই।
ছিল শুধু ভক্তি আর আকুলতা,
কাব্য আর গান।
তাও তুমি নিয়েছ,—নিয়েছ একেবারে নিঃস্ব করে।
এবার শুধু তুমি আছ
আর আমি আছি।
বলো প্রভু, এখনো কি দেখা দেবে না?

ঠিকই শাস্তি হয়েছে। মানুষ সমাজবদ্ধ জীব, সমাজের অনুশাসন তাকে মানতে হবে বৈকি। উচ্চবর্ণের অধিকারের গণ্ডীতে নিম্নবর্ণ পা বাড়াবে কোন সাহসে? মূর্খ কোন্ দাবিতে এগোবে পণ্ডিতের সীমানায়? তাই আর কাব্য নয়, গান নয়। ছিন্নতার হৃদয়বীণা তোমারই সুরে তুমি ভরে দাও।

তুকারাম হাসলেন,—প্রভু, আমার বড়ো ভাগ্য আমি নীচ বংশে

জন্মেছি। আমি জানি গিরিশিখরেই থাকে হিমকঠিন তুষার,—নদীর উষ্ণ ধারার মতো প্রেমের ধারা যখন বয়, সে ধারা ওপরে থাকে না, নীচে এসেই জমা হয়। নদীর ধারার মতো করুণার ধারায় আমার নীচ হীন জীবনকে তুমি স্পর্শ করবে না কি?

তুকারাম কাঁদলেন,—

এতদিন তোমারই গান গেয়েছি,
তবু তুমি অচেনা।
তোমারই নাম জপেছি,
তবু স্বপ্নেও তুমি অদেখা।
আজ আমার গান নেই, জপ নেই,—
শুধু আমি পড়ে আছি।
কবীর ছিল তাঁতী, রোহীদাস ছিল মুচি,
জনাবাঈ ছিল দাসী,
আর গণিকাকন্যা ছিল কান্হা।
তারা যদি ধন্য হোলো
আমাকে তুমি এড়িয়ে যাবে কেমন করে?
অচ্ছুতকে কেউ যদি না স্পর্শ করে,
তুমি না ছুঁয়ে যাবে কোথায়?

ইন্দ্রায়ণীর তীরে নিরম্বু উপবাস শুরু করলেন তুকারাম। সমাজ তাঁর উপর অত্যাচার করেছে তাতে কোনো ক্ষোভ নেই। ভগবান তাঁকে বঞ্চনা করেছেন,—বড়ো অভিমান।

তেরো দিন কাটল, একবিন্দু জলও গলা দিয়ে নামল না। শুধু শুকনো ঠোঁটদুটি নীরবে নড়ে,—

দেখা দেবে না প্রভু, দেখা দেবে না?

দেখা দিলেন পাণ্ডুরঙ্গজী। ইন্দ্রায়ণীর স্রোত ফিরিয়ে দিল হারানো পাণ্ডুলিপি।

আমাদের বাস একেবারে মন্দিরের পূর্ব দ্বারে এসে পৌঁছল। আলন্দীর প্রথম বাসে আমরা এসেছি। আরো কতো বাস পরে পরে আসবে।

জ্ঞানেশ্বর আর তুকারাম আর তাঁদের স্মৃতিপবিত্র আলন্দী আর দেহু। একই নদীর তীরে মাত্র দশ মাইলের ব্যবধানে একই মন্ত্রের একই ভাবনার যুগলতীর্থ। আলন্দীতে যে আসে সে দেহু না দেখে যায় না। দেহুদর্শনে যে আসে সেও আলন্দীতে প্রণাম করে যায়। দু-জায়গাতেই সরাসরি বাস আসে পুনা থেকে।

চেরিলকে তাই বললাম,—ঠিক জায়গাতেই তুমি আমাকে নিয়ে এসেছ চেরিল। আজকের দিনটি আমাদের সার্থক হবে।

চেরিলের চোখে উৎসাহ, মুখে খুশীর হাসি। বাস থামতেই ঘুমের ভাব উবে গেছে। বললে,—বলো সখা, ঠিক না?

নিশ্চয়ই।

একই চেহারার আর একটা বাস আমাদের সামনে রাস্তা জুড়ে দাঁড়াল। ও বাসটা এল পুনা থেকে যাত্রী ঠাসাঠাসি হয়ে। ওরা বড়ো শহরের বাসিন্দা, চেহারা আর একটু ঝকঝকে, পোশাকের পারিপাট্য আর একটু বেশি। হৈহৈ করে নামল, আলন্দীর যাত্রীদের ঠেলেঠুলে আগেভাগে এগোলো।

চেরিল বিদেশী মেয়ে। দৌড়ঝাঁপে কম যায় না, ধাক্কাধাক্কিকে ডরায় না। আমি তাড়াতাড়ি তার হাত ধরে টানলাম।

আরে দাঁড়াও, দাঁড়াও, ধীরে সুস্থে এগোও! অতো হুড়োহুড়ির কী আছে?

বাঃ? সবাই যে এগিয়ে গেল!

যাক না। আমরাও তো এগোচ্ছিই, পেছনে তো ফিরে যাচ্ছিনে।

আমি টুক্ করে চেরিলকে বাঁদিকে ঠেলে দিলাম, তারপর তার পেছনে পেছনে ঢুকে গেলাম গ্রন্থাগারের মধ্যে।

আধো-অন্ধকার একটি ঘর। দেউড়ির পাশেই। টিমটিমে আলো

দিনের বেলাতেও জ্বলে। দেয়ালের কোণে কোণে ঝুলকালি। ওখানে আছে কাঠের একটি আধার। কাঁচ-বাঁধানো বন্ধ ডালা। তার মধ্যে তুকারামের পাণ্ডুলিপি,—তাঁর নিজের হাতে লেখা।

প্রায় পৌনে চারশো বছর আগেকার জীর্ণ কাগজ, ম্লান মুছে-আসা কালি। অক্ষরগুলি পড়া যায় কিনা জানিনে। কাঁচের আড়ালে ঢাকা ঐ বিবর্ণ পাণ্ডুলিপির দিকে তাকিয়ে চেরিল কেমন বিমনা হয়ে গেল। ঘরে খুব ভিড় নেই। এক জায়গায় কিছুক্ষণ দাঁড়ালে পেছন থেকে কেউ ঠেলবে না। স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল চেরিল। তারপর কাঠের আধারটি দুহাতে স্পর্শ করে তার ওপর মাথা ঠেকাল।

গ্রন্থাগার থেকে বেরিয়ে এসে চেরিলকে বললাম,—জানো, এই তুকারাম মহারাষ্ট্রের সবচেয়ে বড়ো মরমী কবি। হাজার হাজার গান তিনি লিখে গেছেন, লোকে এখনো তাঁর গান গায়। এই গান রচনার প্রেরণা তিনি পেয়েছিলেন জ্ঞানেশ্বরেরই সমসাময়িক এক সন্ত কবির কাছ থেকে। তাঁর নাম নামদেব।

জানি, চেরিল বললে,—তাঁর গানের অনুবাদও আমি পড়েছি। শুনবে একটা?

আমার গভীর ঘুমের মধ্যে,
দাঁড়ালে তুমি নামদেব,—
আমার বধির কানের মধ্যে
ঢাললে প্রভুর জয়গান॥
বুকের মধ্যে আঙুল রেখে
বললে,—ওরে তুকা—
তুই শুধু গান রচনা কর,—
প্রভুর নামে গান॥
ছন্দহারা তোর প্রাণেতে
প্রভুই দেবেন ছন্দ।

তাল নেই তোর তাতেই বা কী,—
তাঁর হাতে মৃদঙ্গ ॥

আমি অবাক চোখে তাকিয়ে রইলাম চেরিলের মুখের দিকে। শরতের একখণ্ড মেঘ ক্ষণকালের জন্য সূর্যের মুখ ঢেকেছে, স্নিগ্ধ ছায়া ঘনিয়েছে চাতালে। তেমনি স্নিগ্ধতা চেরিলের চোখে মুখে। তুকারামের গানের আবৃত্তি ক্ষণিকের জন্যে তার কপালে ফেলেছে মাধুর্যের কোমল ছায়া।

সত্যি তাকে স্পষ্ট করে দেখাই হয়নি এর আগে। কাল সন্ধ্যার অন্ধকারে বিস্ময়ের ঝলকটুকু তুলে বিদ্যুল্লতার মতো সে ফুটে উঠেছিল। আজ দিনের আলোয় মুখোমুখি তাকে দেখছি। আজও সেই বিস্ময়। চোখের বিস্ময়,—মনের বিস্ময়।

লাল টকটকে লম্বাটে মুখ, শক্ত চোয়াল, ভারি চিবুক, পরিপাটি দাঁতের সারি। কোণের একটা দাঁত দল ছেড়ে একটু উঁচু হয়ে আছে। তাই বোধহয় বোঁচা নাকের নীচে টুকটুকে ঠোঁটের ফাঁকে সদাই হাসি-হাসি ভাব। ফিকে নীল ভাসা ভাসা চোখে সেই হাসিটা মাখানো।

চওড়া কপাল আরো চওড়া করে চেরিলের সোনালি চুল ঘাড়ের পেছনে টানটান বাঁধা। কয়েকটি অলকগুচ্ছ সেই বাঁধনের কাছে হার মানেনি। তাঁরা দুপাশ দিয়ে গালের কাছে নেমে এসে ঝুমুর ঝুমুর নাচছে। ঘণ্টার মতো দুলছে।

চেরিল দীর্ঘাঙ্গিনী। ছড়ানো লম্বা হাত পা তার, শক্ত আঙুল, চওড়া হাতের কবজি। আমার কাঁধের একটু নিচেই তার কাঁধ। আমার থুতনি বরাবর তার কপাল।

লম্বা চেরিলকে তার পোশাকের জন্যে আরো লম্বা দেখায়। গাঢ় বাদামী রঙের একটা পায়জামা তার পরনে, কোমর থেকে হাঁটু পর্যন্ত যথেষ্ট টাইট,—তারপর গোড়ালির কাছে পৌঁছতে পৌঁছতে ফাঁদটা একটু বড়ো। ঊর্ধ্বাঙ্গে সোনালী-হলুদ পুরুষালী ঢোলাহাতা পাঞ্জাবি।

রোদের আলোয় চেরিলের পাঞ্জাবি জ্বলজ্বল করছে,—শুভ্র গলায় আর লালচে গালে সোনালী রঙ ধরিয়েছে।

চেরিলের গলায় ঘি-রঙের ক'গাছা সরু মোটা পুঁতির মালা, কাঁধে একটা গেরুয়া রঙের খাদি ব্যাগ। পায়ে মোটা চপ্পল, যা দেহাতি মারাঠী পুরুষরা সচরাচর পরে। চেরিলের চোখে নেই ম্যাসকারা, ঠোঁটে নেই লিপস্টিক, নখে নেই রঙিন নেল-পালিশ। আঁখিপল্লবের ধূসরতা আর ঠোঁট-নখের লালিমা বিধাতার দান।

কতো বয়েস হবে চেরিলের? তার টাইট করে বাঁধা ঘন চুল আর চওড়া কপাল যে বয়সের ইঙ্গিত দেয় চোখের ঝিলিক আর ঠোঁটের হাসি সে বয়সকে অনেক কমিয়ে আনে। চওড়া কাঁধ আর ভারি নিতম্বে সে পূর্ণ যুবতী। আবার তার পাঞ্জাবির বুকে মৃদু একটি ঢেউ-এর আভাস সত্ত্বেও মনে হয় সে এক তরুণ কিশোর।

তাই চেরিল যেন আধেক মানবী আর আধেক কল্পনা। মহারাষ্ট্রের পশ্চিম প্রান্তে এই অখ্যাত গ্রামে তুকারাম মন্দিরের চাতালে পাঞ্জাবি-পাজামা পরে যে বিদেশিনী আজ পাশে দাঁড়িয়ে আছে, তুকারামের গান শোনাচ্ছে আমার কানে,—ক্ষীণতম পরিচয়ে সে মানবী,—বাকি সবটুকুই কল্পনা ছাড়া আর কী?

চেরিল, তুমি তুকারামের রচনা পড়েছ? আমি অবাক হয়ে শুধোলাম।

পড়েছি বৈকি সখা। কিছু কিছু পড়েছি। যেটুকু ইংরেজি অনুবাদে পেয়েছি। না পড়লে এখানে এসেছি কেন?

স্বতই আমার মুখ থেকে বেরিয়ে এল,—কেন এসেছ? কোথা থেকে এসেছ আমাদের দেশে?

এড়িয়ে গেল চেরিল। মুখে আবার সেই কৌতুকভরা হাসি। বললে,—এসব কথার জবাব দেবার সময় নাকি এখন? চলো চলো, সবাই দর্শন শেষ করল,—আমরাই শুধু পেছনে পড়ে রইলাম।

কাঁধে খোঁচা দিল আমার। সম্বিত ফিরিয়ে আনল।

হাঁ করে কী ভাবছ সখা? যাবে না মন্দিরে?

॥ ১০ ॥

দেহুর তুকারাম তীর্থে মন্দির একটি নয়,—তিনটি। একই চাতালের ওপর পাশাপাশি,—এক দুই তিন। প্রত্যেকটি মন্দিরই দক্ষিণমুখী। মাঝের মন্দিরটির গড়ন সবচেয়ে সুন্দর, সবচেয়ে বড়ো, শিখর সবচেয়ে উঁচু। বাঁদিকের মন্দিরের চূড়া আর একটু খাটো, আরো একটু খাটো ডানদিকেরটি। চূড়াগুলি ধবধবে শাদা, তাতে নানান্ রঙিন কারুকার্য।

এক দুই তিন—পরপর এই প্রাথমিক তিনটি সংখ্যার মাহাত্ম্য অতুল। এক থেকে শুরু, তিনে পৌঁছে অশেষ। সৃষ্টির কেন্দ্রে যিনি, তিনি অদ্বৈত পুরুষ, একমেবাদ্বিতীয়ম্। তাঁর আয়ু নেই, বিনাশ নেই, তিনি অনন্ত ব্রহ্ম।

সেই এক ব্রহ্ম সৃষ্টির প্রেরণায় নিজের অদ্বৈত স্বরূপকে স্বেচ্ছায় দ্বিখণ্ডিত করেছেন। একমেব সনাতন দ্বৈতরূপ পরিগ্রহ করেছেন,—পুরুষ আর প্রকৃতি, বীজ আর আধার, লিঙ্গ আর যোনিরূপে। দুই থেকেই সৃষ্টিলীলার বিচিত্র বিকাশ। পিতা, মাতা আর সন্তান। এক, দুই আর তিন।

সন্তান তার পিতামাতাকে বলে,—আমাকে পালন করো, রক্ষা করো, আশ্রয় দাও। স্নেহ দিয়ে মমতা দিয়ে সংসারের উদ্যানটি এমন সুন্দর করে সাজিয়েছ, তাতে প্রীতির ফুল ফুটিয়েছ, ছায়া মেলেছ ভালোবাসার, ঝরিয়েছ স্নেহের স্নিগ্ধ প্রস্রবণ,—এইখানে আমাকে থাকতে দাও। সুখে শান্তিতে স্বধর্মে আর সার্থকতায় সংসার-জীবনটি অতিবাহিত করতে দাও।

তাই করেন প্রভু। যে তাঁর একান্ত শরণাগত তিনি তার শরণাগতি।

অষ্টোত্তর শতনাম শ্রীকৃষ্ণের। একটি প্রিয় নাম বিট্ঠল। এই

নামে তাঁকে ডাকে সংখ্যাতীত ভক্ত। তাদের তিনি রক্ষা করেন, আশ্বাস দিয়ে বলেন,—মামেকং শরণং ব্রজ। শঙ্খের মঙ্গলরবে সুপ্ত সৃষ্টিতে আমি জাগাব, প্রসন্ন পদ্মের মঙ্গল সুরভির আশীর্বাদে সৃষ্টিকে সুন্দর করব। তাই তিনি বৃন্দাবনের গোপীবিমোহন বংশীধারী কিশোর নন, আভীরবধূ শ্রীরাধিকার নিষিদ্ধ প্রেমিক নন। তিনি লোকপালক প্রজানুরঞ্জক রাজা। রাজনন্দিনী রুক্মিণী তাঁর মহিষী। ভক্ত তাঁদের সন্তান।

কলিকালে মহারাষ্ট্রের পুণ্য নদীতীরে কৃষ্ণের এই বিট্‌ঠল রূপ। তাই তাঁর পাশে রুক্মিণীর অবস্থিতি। বৈকুণ্ঠপতি নারায়ণের পাশে যেমন নারায়ণী লক্ষ্মী। অযোধ্যাপতি শ্রীরামচন্দ্রের পাশে যেমন জনকনন্দিনী সীতা।

লাইনের পেছনে পেছনে সোজাসুজি মন্দিরে ঢোকা আমাদের হোলো না। কচি কচি ক'টি ছেলেমেয়ে আমাদের ঘিরে ধরল। ফুটফুটে বাচ্চাগুলি,—চেপে ধরল চেরিলের জামার খুঁট, কেউ ঝুলল তার হাত ধরে। চেরিলের হাসিমুখ দেখে তাদের সাহস বেড়ে গেছে। তারা নেচে নেচে চেরিলের চারধারে ঘুরে ঘুরে গাইতে লাগল,—জ্ঞানোবা তুকারাম জ্ঞানোবা তুকারাম। হাতে তাদের ফুলের মালা। দুহাত উঁচু করে চেরিলের মুখের কাছে সেই মালা তারা দোলাতে লাগল। চেরিলের ভারি ফুর্তি! সেও ওদের সঙ্গে নাচে আর কী!

টুকটুকে একটি মালাকারের হাত থেকে চেরিল অনেক মালা কিনল,—আমার হাতেও দিল ক-গাছা। তারপর ছুটে গিয়ে আমরা লাইনে সামিল হলাম। পার হলাম মন্দিরদ্বার।

একেবারে মুখোমুখি। ঠিক সামনেই যুগল দেববিগ্রহ বিট্‌ঠল-রুক্মিণী। বাইরে দিনের আলো, সূর্য প্রায় মাঝ গগনে। কিন্তু গর্ভগৃহ অন্ধকার। তেলের মৃদু আলোতে ছায়া-ছায়া মূর্তি। অন্ধকারে অভ্যস্ত হতে চোখ কিছুটা সময় নিল।

কালো পাথরের বিগ্রহ,—কিন্তু মসৃণ কষ্টিপাথর নয়। তাছাড়া মাথা আর মুখটুকু শুধু বেরিয়ে আছে। সারা অঙ্গে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে জড়ানো রেশমী কাপড়। বিট্‌ঠলজীর পোশাকের রঙ গাঢ় হলুদ, রুক্মিণীর সবুজ। রাজা আর রাণীর মতো সাজ আর অলঙ্কার। দুপাশে রূপোর ধূপদান। পায়ের নিচে দীপের সারি। তার আলোয় আর পোশাকের হলুদ-সবুজে ধাঁধিয়ে যায় চোখ।

গর্ভগৃহ থেকে বার হয়ে এলাম নাটমন্দিরের আলোয়। সামনে দিয়ে লাইন চলেছে পাশাপাশি দু-সার। এক লাইন ঢুকছে, এক লাইন বার হচ্ছে। দু-ধার মোটামুটি ফাঁকা—পা পাতা যায়, পা ছড়িয়ে না হলেও পা গুটিয়ে বসা যায়।

চেরিল হাত ধরে টানল,—এসো সখা, এই সেই মন্দির, যা তুকারাম নিজের হাতে গড়েছিলেন,—তাই না?

শুধু কাব্য নয়, তুকারামের জীবনীও নিশ্চয়ই পড়েছে চেরিল। তাই এই প্রশ্ন।

তুকারামের দীনহীন জীবন, দারিদ্র্য চিরসাথী। বাপ মারা যাবার পর কিছু টাকা হাতে এল। বুদ্ধিমান হলে সেই টাকা খাটিয়ে আরো টাকা বানাতেন, বসবাসের জন্যে পাকা বাড়ি বানাতেন, কিন্তু বাদ সাধলেন বিট্‌ঠল,—বোকা তুকারামকে দিয়ে নিজের বাড়ি বানিয়ে নিলেন।

ইন্দ্রায়ণীতীরে এক ভাঙা মন্দিরের ভিতের ওপর তুকারাম নিজেব হাতে গড়লেন বিট্‌ঠল-মন্দির। তারপর আনাড়ী এক পাথর-পটুয়াকে ডেকে বললেন,—বিট্‌ঠল-রুক্মিণীর বিগ্রহ বানাও তো!

পটুয়া বললে,—বলো কি ভাই? আমার হাত যে এখনো পাকেনি! তুমি নামকরা ভাস্কর দ্যাখো।

তুকারাম বললেন,—আমি ভাস্করের নাম করবার জন্যে মন্দির গড়লাম নাকি? এখানে বসে যাঁর নাম আমি করব, তাঁর বিগ্রহ তুমিই গড়তে পারবে। নাও, শুরু করো!

তুকারামের তৈরি সেই মন্দির কবে কালের তিমিরে লুপ্ত হয়েছে। তারই বুকে গড়ে উঠেছে অনেক সুন্দর অনেক মহার্ঘ এ যুগের মন্দির। কিন্তু অপটু ভাস্করের হাতে-গড়া তুকারাম প্রতিষ্ঠিত সেই বিগ্রহ আজও আছে।

তাই চেরিলকে হেসে বললাম,—মোটামুটি ঠিকই বলেছ। এর ভিতের নিচে তুকারামের হাতে বসানো ইঁট-পাথর দু-চারটে আছে বৈকি।

মেঝেতে হাত বুলোলো চেরিল। হাজার লোকের পায়ের ধুলো ভরতি মেঝে। তারপর হাতটা কপালে ছুঁইয়ে বললে,—ঠিক তো। এই ঝকঝকে মেঝে, ঐ ছবিওয়ালা দেয়াল, রঙিন চূড়ো,—এসব তুকারাম গড়েননি। কিন্তু যাই বলো, আমার মনে হচ্ছে তুকারামের চরণধূলি এখনো এই মেঝেতে রয়েছে।

তারপর ঘুরে ঘুরে আমরা মন্দির দেখলাম। বড়ো সুন্দর, বড়ো মনোহরণ। মন ভরে ওঠে কারুকার্য দেখে।

ইঁট-সিমেন্টের কাঠামো। চূড়াটি খুবই ছোট। দেখবার মতো দেয়ালগুলি। সারা দেয়াল জুড়ে বালি-সিমেন্টের ফুলকারি,—ফুল আর লতার অপূর্ব কারুকার্য। দরজার মাথায় ফোটা ফুলের পাঁপড়ির মতো গোল খিলান। সেখান থেকে ছাদ পর্যন্ত আলিম্পনের কোমল রেখা খিলানে খিলানে উঠে গেছে। মাঝে মাঝে ফুটে আছে পদ্মগোলক। তার নিচে সুকুমার দেব-অলিন্দ। আর মন্দিরের ভেতরের দেয়ালের চিত্রাবলী থেকে তো চোখ ফেরানো যায় না। হাঁ করে দেখতে দেখতে কখন সময় কেটে যায়। আমাদেরও অনেক সময় কাটল।

আমি এবার শুধোলাম,—কিন্তু বিগ্রহ কেমন দেখলে বলো!

চেরিল দেয়াল থেকে চোখ নামিয়ে আনল। তার লাল টুকটুকে মুখ প্রসন্নতায় ভরা। বললে,—ভালো।

ভালো মানে? অন্ধকারে ভালো করে দেখতেই তো পেলে না! একগাদা কাপড়-জড়ানো গা, খসখসে কালো ভুতুড়ে মুখ,—ভালো

লাগলেই হোলো? সত্যি?

সত্যি, খুব ভালো।

আরো কিছু বলবে ভেবে আমি চুপ করলাম। চেরিলের মুখের দিকে তাকালাম। আস্তে আস্তে চেরিল বললে,—আমি তোমাদের বিগ্রহের ভালোমন্দ কী বুঝি বলো! এটুকু বুঝি যে মূর্তির ভালোমন্দ আছে, সুন্দর-অসুন্দর আছে,—কিন্তু বিগ্রহ তো অন্য। রূপ একটা থাকলেও সে তো রূপাতীত। ভালো কেন লাগল জানো?

বলো চেরিল।

আমি ঐ আধো-অন্ধকারে বিগ্রহ দেখলাম না। তুকারামের প্রভুকে দেখলাম। তুকারামকে দেখলাম। প্রভুর নামে লক্ষ গান যে রচনা করেছে সেই কবি-হৃদয়টিকে দেখলাম।

আর দুটি মন্দির দুদিকে। মূল মন্দিরের ডাইনে আর বাঁয়ে। বাঁদিকের মন্দিরে শ্রীরামচন্দ্র আসীন। বামে সীতা আর দক্ষিণে লক্ষ্মণজী। প্রায় মানুষ সমান শ্বেতপাথরের তিন বিগ্রহ,—কুঁদে-কাটা মুখ। প্রত্যেকেই দণ্ডায়মান, প্রত্যেকের অঙ্গে রেশমের রঙিন সাজ, জ্বলজ্বলে মুকুট আর অলঙ্কার।

ডানদিকের মন্দিরটি বড়ো আশ্চর্য—মন্দির বলে মনেই হয় না। এখানে কোনো ভিড় নেই, পূজা নেই,—নেই অর্ঘ্যদানের নির্মাল্য-লাভের ব্যাকুলতা। ঠাকুর নেই, পুরোহিত নেই,—নেই পূজাপাঠ, মন্ত্রোচ্চারণ। চকচকে দেয়াল,—তাতে এক লাইন রেখা নেই, ঝকঝকে মেঝে, তাতে এতোটুকু মালিন্য নেই। ভোগ নেই, প্রসাদ নেই। দর্শনার্থীরা সামনে থেকে উঁকি দিয়ে যাচ্ছে, ভেতরে ঢোকার আগ্রহটুকু দেখাচ্ছে না।

শুধু ঠিক চোখের সামনে একটি পিতলের বৃত্ত। সেই বৃত্তে বিশাল একটি মুখমণ্ডল। হাত নেই, পা নেই, আভরণ অলঙ্কার নেই। শুধু একটি মুখ,—তার আয়ত দুটি চোখ ভাবগম্ভীর করুণাঘন।

সেই মুখের সামনে তামার গোল পাত্রে ধূপশিখা। পাত্রটির গায়ে একটি শাদা মালা জড়ানো। আর একটিমাত্র লোক। হাঁটু মুড়ে হাতজোড় করে বসে আছে। আমাদের দিকে তার পিঠ ঘোরানো। তার মুখ দেখতে পাচ্ছিনে, গলা শুনতে পাচ্ছি। শান্ত গম্ভীর গলায় সে করছে নামগান,—

জয় জয় বিট্‌ঠল রামকৃষ্ণ হরি।

দেবমন্দির নয়, ভক্ত তুকারামের স্মারক-মন্দির। সামনে ঐ যে পিতলের মুখ,—ঐ মুখ তুকারামের। দেবদর্শন সাঙ্গ করে ভক্তদর্শন। বিট্‌ঠল-রুক্মিণী আর রামসীতার পর একচোখ তুকারামকে দেখে এস। পূজা নেই প্রণামী নেই পুণ্য নেই। শুধু দর্শনের আনন্দ। শুধু স্মৃতির উজ্জীবন।

চেরিল আর কথা বলল না। নাম-কীর্তনীয়ার পাশটিতে গিয়ে হাঁটু মুড়ে বসল। একদৃষ্টে তাকাল পেতলে তৈরি তুকারামের মুখের দিকে। তার মনের মধ্যে ভাবের খেলা।

ছায়াশীতল জনকোলাহলহীন শান্ত মন্দিরতল। এইখানে চুপ করে কিছুক্ষণ বসে রইল চেরিল। শ্রান্ত পা-ছুটি সে মুড়ে রেখেছে, হাতছুটি কোলের ওপর। বাইরে জনস্রোত বয়ে চলেছে। শত শত দর্শনার্থী আসছে, দেবদর্শন করছে, পূজা দিচ্ছে, নির্মাল্য-প্রসাদ কুড়োচ্ছে, আবার ফিরে যাচ্ছে। এই ভিড় ঠেলাঠেলি আর আসা-যাওয়ার একপাশে তুকারামের মুখের দিকে পলকহীন চোখে তাকিয়ে রয়েছে চেরিল। ভাবছে সাধক কবি তুকারামের মর্মকথা।

সন্ত জ্ঞানেশ্বরের আবির্ভাবের তিন শতক পরে তুকারাম আবির্ভূত হয়েছিলেন। তাঁর জন্ম সাল নিয়ে নানা মতান্তর আছে। মোটামুটি নির্ভুলভাবে ধরা যায় ১৫৯৮ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর জন্ম। ১৬৫০ খ্রীষ্টাব্দে বাহান্ন বছর বয়সে তিরোভাব।

তুকারাম ছিলেন চাষীর ছেলে কুনাবী। পূর্বপুরুষরা হাল-বলদ

নিয়ে মাঠে চাষ করতেন, বাপ নিয়েছিলেন দোকানীর পেশা। সেই পেশাতেই তুকারামের সংসার-জীবনের হাতেখড়ি। অল্প বয়সে বিবাহ, —একজোড়া স্ত্রী। তুকারাম হয়তো ভেবেছিলেন তুই স্ত্রী তুপাশে নিয়ে পৈত্রিক ব্যবসায়ের পিঠে চড়ে সুখে কালাতিপাত করবেন। কিন্তু শ্রীবিষ্ণুবিট্‌ঠলজী মুচকি হেসে বলেছিলেন,—

তুঃখ যদি না পাবে তো তুঃখ তোমার ঘুচবে কবে?

অশেষ তুঃখ। তুকারামের ব্যবসা লাটে উঠেছিল, অর্থকষ্টে ভিখারী হতে হয়েছিল, প্রথমা স্ত্রী আর এক পুত্র তুর্ভিক্ষের অনাহারে মরেছিল, দ্বিতীয় স্ত্রীর বুভুক্ষু মেজাজের গঞ্জনা শুনে শুনে জীবন বিষবৎ হয়েছিল। সব হারিয়ে ইন্দ্রায়ণীতীরের মন্দিরে তিনি নিয়েছিলেন রাতের আশ্রয়। দিন কাটাতেন অদূরে ভামনাথ পাহাড়ের শিখরে।

স্বপ্নের মধ্যে দেখা দিলেন নামদেব। বললেন,—তুমি গান রচনা করো।

কিসের গান?

প্রেমের গান, আত্মনিবেদনের গান।

কার সঙ্গে প্রেম?

বিট্‌ঠলের সঙ্গে।

কার পায়ে আত্মনিবেদন?

বিট্‌ঠলের পায়ে।

তা গান কেন? পূজা করি?

মূর্খ! পূজার মন্ত্র জানো? সে মন্ত্র তো পণ্ডিতের কাছে, ব্রাহ্মণের কাছে। গানের মন্ত্র সহজ ভাষায় সহজ সুরে সহজ তালে। সেই মন্ত্রের বলে সহস্র গান তুমি গেয়ে যাও।

কিন্তু গান রচনার শিক্ষা তাঁকে কে দেবে? তুকারাম অশিক্ষিত ছিলেন। বাপ-মা তাঁকে পাঠশালায় পাঠাননি। সংস্কৃত বা ফারসি কোনো ভাষাই তিনি জানতেন না। কখনো বিদ্যাভ্যাসের সুযোগ তিনি পাননি,—সাহিত্যশিক্ষা বা সাহিত্যবোধের তো কথাই নেই।

তুকারাম বড়ো জোর জানতেন তাঁর যুগের মারাঠী কথ্য ভাষা।

শিক্ষাগুরু তো ছিলই না, আধ্যাত্মিক বা নৈতিক জীবনে পথ দেখাবার মতোও কেউ ছিল না তাঁর। ন্যায়-অন্যায় কোন শিক্ষাই কারুর কাছ থেকে তিনি পাননি। কেউ শেখায়নি কোন্‌টা ভালো আর কোনটা মন্দ,—কী উচিত আর কী অনুচিত। বরং যা অন্যায় অনুচিত তাই সমাজ-সংসার চোখে আঙুল দিয়ে তাঁকে দেখিয়েছে। সেই শিক্ষা রপ্ত করতে পারেননি বলেই বন্ধু-প্রতিবেশী, আত্মীয়-পরিজন—এমনকি স্ত্রী পর্যন্ত তাঁকে হেয় করেছে।

অন্যায়কে অন্যায় দিয়ে রোধ করা যায় না। ক্রোধ-হিংসাকে ক্রোধ-হিংসা দিয়ে জয় করা যায় না,—এই আশ্চর্য শিক্ষা তাঁকে দিয়েছিল কে? সারা জীবন স্নেহভালোবাসার ছিটেফোঁটাও তুকা পাননি। কিন্তু ক্ষুধার্তের জন্যে তিনি অন্নভিক্ষা করতেন, ক্লান্ত পথিকের ভার তিনি বহন করতেন, পঙ্গুকে কাঁধে তুলে তিনি পদযাত্রা করতেন। এই নিষ্কাম পরাৎপরতার *নির্দেশ* পেয়েছিলেন কার কাছ থেকে? বিট্‌ঠল-প্রভুর কাছ থেকে—যাঁর মানসমূর্তি মর্মরে গেঁথে এই মন্দিরে তিনি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

তুকারাম গুরু পেয়েছিলেন স্বপ্নে। স্বপ্নের মধ্যে গুরু তাঁকে মন্ত্র দিয়েছিলেন। জ্ঞানেশ্বর যে মন্ত্র লাভ করেছিলেন সেই একই মন্ত্র। নামদেব যে মন্ত্র পাঠ করেছিলেন সেই একই মন্ত্র। একনাথ যে মন্ত্র জপ করেছিলেন সেই একই মন্ত্র—জয় জয় বিট্‌ঠল রামকৃষ্ণ হরি। অদ্বৈতবাদী জ্ঞানেশ্বরের অন্তর যে মন্ত্রে দ্রব হয়েছিল, সেই মন্ত্র তুকারামের হৃদয়ে ফুটিয়েছিল অজস্র কুসুম। সেই নামকুসুমের নিত্য মালা গেঁথে তুকারাম পরিয়েছিলেন তাঁর ইষ্টদেবের গলায়।

গান রচনা তো সহজ নয়। ভাষা লাগে, ভাব লাগে, ছন্দ লাগে, মিল লাগে, শিক্ষা লাগে। তুকারাম শিক্ষা পেয়েছিলেন পূর্বসূরীদের কাছ থেকে। জ্ঞানদেব আর নামদেব, কবীর আর একনাথ। জ্ঞানেশ্বরের গীতা আর অমৃতানুভব। কবীরের দোহাঁ আর নামদেবের

অভঙ্গাবলী, একনাথের ভাগবত আর ভাবার্থ রামায়ণ,—এরাই তাঁর *শিক্ষাগুরু। অনেক কষ্টে এসব রচনার ভাষা তিনি আয়ত্ত* করেছিলেন। ভাব তিনি হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন। বারবার পড়ে পড়ে এসব রচনার বহু অংশ তাঁর কণ্ঠস্থ হয়ে গিয়েছিল।

তারপর একদিন বিট্‌ঠলপ্রভুর দয়া হোলো। পুষ্পচয়ন সারা হয়েছে, এবার তুমি প্রেমের মালা গাঁথো,—আমি গলায় পরব।

এই মন্দিরে বসে তুকারাম রচনা করেছিলেন তাঁর প্রথম গীতি-মাল্য। এ মালা গাঁথতে কেউ শেখায়নি,—আপন মনে নিজে নিজে গেঁথেছি। ছ্যাখো তো কেমন অপটু হাতের উপহার!

তুকারামের মন্ত্র প্রেমের মন্ত্র। তুকারামের গান প্রেমের গান, তুকারামের জীবন প্রেমময় জীবন। বিদেহী তুকারাম দেহময় জীবময় জগৎ-সংসারে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন প্রেমের অমিয়ধারা।

সে প্রেম কেমন প্রেম?

ওরা বলে,—

ওরে তুকা,
তুই নাকি রে কৃষ্ণপ্রেমে আত্মহারা,
কৃষ্ণ ছাড়া আর কিছু নাই তোর?
কৃষ্ণই ধ্যান, কৃষ্ণই জ্ঞান,—
তবে কেন এমন মোহডোর?
জীবপ্রেমের মায়ায় কেন এমন বদ্ধ হলি?
হৃদয়-কুসুমকলি
তাঁর চরণে করবি কোথায় পরম সমর্পণ,—
জীবসেবার স্বপ্নঘোরে
রইলি নিমগন?
যেই প্রেম তোর কৃষ্ণে দেবার তরে,—
এই পৃথিবীর ধূলায় ধূলায় বিলাস কেমন করে?
যে দুটি হাত প্রভুর যুগল ভৃত্য

মানুষ সেবার তুচ্ছ ব্রতে
সে হাত রত নিত্য ?

মুচকি হাসেন ওদের কথা শুনে। মুখে মুখেই তৈরি আছে জবাব। সেই জবাব দিতে একটু দেরি হয় না।

তুকা বলে,—আমি বধূ,—
কৃষ্ণ আমার বঁধু,—
বঁধুর তরেই বুকে আমার
জমাট বাঁধা মধু।
শ্বশুরবাড়ির চাকায় আমি
বাঁধা আছি বটে,
শাউড়ি দেওর ননদ জায়ের
সেবায় সময় কাটে,—
ওদের ভালোবাসেন বঁধু
তাই তো আমি বাসি,
নইলে ওরা কেউ নয় মোর,
—একান্ত তাঁর দাসী ॥

এই তুকারাম।

কায়মনোবাক্যে কৃষ্ণ-চরণে আত্মসমর্পিত। কায়ার কৃষ্ণব্রত কী ? কৃষ্ণজীবের নিয়ত সেবা। বাক্যও নিরন্তর কৃষ্ণব্রতে রত,—নিরন্তর কৃষ্ণকীর্তন। আর মন ? কৃষ্ণবিরহ-যন্ত্রণায় অহর্নিশি জরোজরো, কৃষ্ণমিলন-সম্ভাবনায় অহর্নিশি রোমাঞ্চ-শিহর।

যাত্রী-উত্তাল বিট্ঠল মন্দিরের পাশে তুকারামের বিজন স্মারক-মন্দির। এখানে চুপ করে বসে তাঁরই কথা ভাবতে হয়, স্মরণপটে তাঁরই জীবনচিত্র ফুটে ওঠে।

তেমনি বুঝি চুপ করে বসে আছে চেন্নিল। দেহে স্পন্দন নেই,

মুখে ভাষা নেই। দেখাদেখি আমিও বসেছি পাশে,—আর এক পাশে ঐ অচেনা লোকটা।

একটু নড়েচড়ে বসল কিছুক্ষণ পরে। কাঁধের ঝুলিটা নামিয়ে রেখেছিল, তার মধ্যে হাত পুরে বার করল ক'টি ধূপকাঠি। ধূপপাত্রের মধ্যে রেখে একসঙ্গে সেগুলি জ্বেলে দিল। তাবপর ঐ অচেনা লোকটার মোটা গলায় নিজের মৃদু গলা মিশিয়ে উচ্চারণ করল,—

জয় জয় বিটৃঠল রামকৃষ্ণ হরি।

॥ ১১ ॥

তুকারাম বলেছেন ঠিকই। শাশুড়ী দেওর জা ননদ,—সবাই অচেনা, সবাই দূরের। প্রভু, চেনা শুধু তুমি, তুমিই আমার অন্তরঙ্গ। তোমার সেবাই আমি করব, শুধু তোমাকেই ভালোবাসব। তোমার ঘরের ঘরনী হব। তোমাকে ভালোবাসি বলেই তোমার সংসারকে ভালোবাসি, তোমার পরিজনকে ভালোবাসি।

আমারও বলতে গেলে তাই। দেবদেবতা আমার মাথায় থাকুন, আমি পথকে ভালোবাসি। হঠাৎ প্রেম নয়,—সারাজীবনের ভালোবাসা, পাকাপোক্ত সম্পর্ক। লুকোচুরি নয়,—নয় গোপন মিলন নিভৃত শৃঙ্গার লোকচক্ষুর অন্তরালে। কেউ আমাকে টানেনি, কেউ আমাকে ফুসলিয়ে বার করেনি। টেনেছে শুধু পথ,—কানে কানে গুনগুনিয়ে নয়, উদাত্ত আহ্বানে। আমার পথ চলাতেই আনন্দ। পথই আমার প্রেমিক প্রভু।

তাই পথের সাথী নমি বারংবার। পথকে ভালোবাসি বলেই পথের সাথীর প্রতি আমার এতো ভাব-ভালোবাসা, এতো টান। একলা এসেছি আলন্দীতে, একলা পৌঁছেছি হাজারো লোকের মাঝে সম্পূর্ণ সাথীহারা হয়ে। ছাখো পথের মজা,—ফুৎকারে উড়ে গেল

একলা থাকার বেদনা। প্রাণ খুশীতে টইটম্বুর, একজন নয়, দুজন নয়,—একগণ্ডা সাথী এরই মধ্যে।

চলতে চলতে আরো কতো সাথী জুটবে,—পথের সংসারে কতো পরিজন। কেউ ভালোবাসবে, কেউ হিংসে করবে। ঘরের বৌকে যেমন করে,—শাশুড়ী গঞ্জনা দ্যায়, জা রেশারেশি করে আবার দেওর-ননদ ভালোবেসে মিষ্টি কথা বলে। বৌ-এর কাছে সব সমান,—স্বামীর আদরটি তার চাই, তাই স্বামীর ঘরের সবাইকে আদর বিলিয়ে বেড়ায়।

পথের প্রভু, আমারও তাই। পথে পথে আমি ভাব বিলিয়ে বেড়াব পথসঙ্গীদের কাছে, তোমার কাছে নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছি যে সবার আগে! তোমাকে ভালোবেসে আমার পথের সংসার ভরে উঠুক!

একগণ্ডা সাথীর প্রথম সাথী সাধু কানহাইয়ালাল। পুরোনো দিনের পথসঙ্গী সে। অরণ্যঘেরা মেকল পর্বতসানুর নির্জন পাকদণ্ডী বেয়ে একদা তার সঙ্গে দিনের পর দিন আমি হেঁটেছি,—অনেক বছর পরে পথের ধারেই আবার তার দেখা পেয়েছি।

আর আছেন পূর্ণচৈতন্যজী মহারাজ। তিনিই টেনেছেন নেশার টানে, তিনিই জোটাবেন পরম পাথেয়। তিনি বুঝিয়েছেন এ পথ শুধু পথ নয়,—মহারাষ্ট্রের বৈষ্ণবী ধারা, প্রাণমন্দাকিনী। এই মন্দাকিনীর স্রোতে ভাসতে হবে, ধারাস্রোতে মনপ্রাণ ভাসিয়ে দিয়ে চলতে হবে।

কোথা থেকে কাছে এল চেরিল? আমার দেশ তার দেশ নয়, আমার ভাষা তার ভাষা নয়, আমার ধর্ম তার ধর্ম নয়। জানিনে কেন সে আমাকে ডেকেছে, আমার হাত ধরে টেনেছে, আমার পাশে এসে বসেছে। আমি তাকে খুঁজিনি, সেই আমাকে খুঁজেছে।

এবার জুটল আর এক নাছোড়বান্দা। এই দেহুতে। তুকারাম-মন্দিরের অচেনা নাম-গাইয়ে,—যার গলায় গলা মেলাল চেরিল।

মুগ্ধ চোখে চেরিলের দিকে একবার তাকাল,—তারপর আর কাটান-ছাড়ান নেই।

আমরা উঠে দাঁড়ালাম।

লোকটাও উঠে দাঁড়াল সঙ্গে সঙ্গে।

আমরা মন্দির ছেড়ে চললাম,—সেও চলল পাশে পাশে। মন্দির থেকে বেরিয়ে নদীর ঘাটের দিকে এগোলাম দ্রুত পায়ে। পেছন ফিরে দেখি সেও আসছে আমাদের অনুসরণ করে। ঘেঁসাঘেসি হতে দেরি নেই।

হ্যাঁ, সেই লোক। সেই ঝাঁকড়া চুল, সরু গোঁফ। কালো কুচকুচে বলিষ্ঠ চেহারা,—প্রায় ছফুট লম্বা।

ক-পা হাঁটলেই নদীর ঘাট। স্নানার্থীর শেষ নেই। কাঁচা রাস্তা, দুধারে ছোট বড়ো দোকানপাট। কড়া রোদ্দুর, দারুণ গরম। একটা ঝাঁকড়া গাছের তলায় মন্দিরের ছবি তুকারামের পট আর চটি-চটি বই বিক্রী হচ্ছে। গাছতলার দোকানের সামনে আমরা দাঁড়ালাম। লোকটার গতিও স্তব্ধ হোলো।

চেরিল আমার গা ঘেঁসে এল। চাপা গলায় ইংরিজিতে বললে,—লোকটা ত্যাখো কেমন,—ঠিক লেগে আছে। ছাড়বে বলে মনে হচ্ছে না!

মুখ ঘুরিয়ে চেরিলের দিকে চোখ পাকিয়ে তাকাল। গম্ভীর তার গলা,—একটু ভুল হোলো। আমি ইংরিজি জানি, তোমার ভাষা আমি বুঝতে পারি। তবে হ্যাঁ, সত্যিই তোমার সঙ্গ আমি ছাড়তে চাইনে।

অপ্রতিভ চেরিল মুখ খোলবার আগেই আবার তেমনি মেজাজী গলায় বললে,—কেন জানো মেমসায়েব? আই সীম টু লাইক ইউ।

আশ্চর্য্য! অচেনা কোনো মেয়ের সঙ্গে আলাপ জমাতে সরাসরি এমনি কথা দুনিয়ার কেউ কখনো ছেড়েছে নাকি?

চেরিলের মুখ দিয়ে বার হোলো,—অ্যাঁ?

এবার গম্ভীর মুখে একটু হাসি ফুটল। বাচ্চাকে যেন প্রবোধ দিচ্ছে এমনি গলায় বললে,—অবাক হচ্ছ কি মেমসায়েব? যাকে আমার পছন্দ তার সঙ্গ আমি সহজে ছাড়িনে। তাছাড়া তোমাদের আরো কিছু দেখবার বাকি আছে। চলো আমার সঙ্গে। হ্যাঁ, তার আগে ঘাটে এস, ইন্দ্রায়ণীর জল একটু মাথায় দিয়ে নাও।

রাস্তার পাশে পল্লী। বাড়িঘর ঘেরা একটি প্রাঙ্গণ। প্রাঙ্গণ জোড়া জনমানুষ,—ঘেঁষাঘেষি করে বসা।

আলন্দীর মন্দির কিংবা দেহুর মন্দিরের মতো নয়। লাইন করে এগোও, ঝাঁকি দর্শন সেরে ঝাঁকে ঝাঁকে বেরিয়ে পড়ো,—তা নয়। এখানে যে আসছে সে আর নড়ছে না। পা গুটিয়ে বসছে। কেউ বা হাত-পা ছড়িয়ে পুঁটুলি মাথায় দিয়ে গড়িয়ে পড়েছে। হাঁড়িকুঁড়ি নামিয়ে মধ্যাহ্নভোজনের ব্যবস্থাও করছে কোনো দল। কোনো দল নেচে নেচে গোল হয়ে ঘুরছে,—জুড়েছে নামগান।

মোটাগুঁড়ি ঝাঁকড়া-মাথা পিপুলগাছ বেশ কয়েকটা। তারই ছায়ায় জমায়েত। শরতের খণ্ড মেঘ মাঝে মাঝে সূর্যের মুখ ঢাকছে। মেঘের ছায়ায় নরম প্রশান্তি।

অদূরে প্রাচীন একটি বাড়ি,—উল্টো দিকে ইঁট বার-করা দেয়াল-ঘেরা একটা পাঠশালা। পাঠশালার দরজায় নাম লেখা আছে। অন্য বাড়িটির কোনো পরিচয় নেই। কিন্তু সেই ভাঙা বাড়িই আকর্ষণ,—এতো ভিড়, ভেতরে ঢোকে কার সাধ্য?

একটু দূরে দাঁড়িয়ে আমাদেরও দাঁড় করাল লোকটা। অল্প হেসে বললে,—ওরে বাবা, এর মধ্যে ঢুকলে সশরীরে স্বর্গলাভ। দূর থেকে দেখাই ভালো। কোথায় এসেছি জানো?

চেরিল আমার মুখের দিকে তাকাল। তার মনের ভাব আমি বুঝলাম। তাই চেরিলকে আড়াল করে তার হয়ে আমিই উত্তর

দিলাম। শুধোলাম,—কোথায়?

চোখ পাকিয়ে তাকাল। এই প্রথম যেন দেখল আমাকে। বললে,—জ্ঞানেশ্বরজীর নাম শুনেছেন?

শোনো কথা!

আমি বললাম,—আলন্দী থেকে আমরা আসছি।

অ, তাহলে নাম শুনেছেন। আলন্দীতে জ্ঞানেশ্বরজীর সমাধি আছে,—দেখেছেন?

যেভাবে শুরু করেছে ভালো লাগবার কথা নয়। তবে অচেনা মানুষ, পষ্টাপষ্টি বিরক্তি প্রকাশ করা ঠিক নয়, ইঙ্গিতই যথেষ্ট। নিরাসক্ত গলায় অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে বললাম,—দেখেছি বৈকি, কী হয়েছে তাতে?

ইঙ্গিত গায়ে মাখবার পাত্রই নয়। গড়গড় করে বলে যাচ্ছে, —জ্ঞানেশ্বরের সমাধি আছে আলন্দীতে। নিবৃত্তিনাথের আছে ব্রহ্মগিরিতে, নামদেবের পান্ধারপুরে, একনাথের পৈঠানে, রামদাসের সজ্জনগড়ে,—আর তুকারামের কোথায় বলুন তো?

এ প্রশ্নের উত্তর চট্ করে মনে পড়ল না।

উত্তর দিল চেরিল। নির্দ্বিধায় সে বলে উঠল,—তুকারামের সমাধি? তুকারামের সমাধি থাকবে কোত্থেকে?

কেন?

তুকারাম তো সশরীরে স্বর্গলাভ করেছিলেন।

চেরিলের কথা শুনে লোকটা এবার হাঁ!

অ্যাঁ মেমসায়েব, আপনি এও জানেন?

চেরিল বললে,—না জানার কী আছে?

আমারও সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল,—তুকারামের সশরীরে স্বর্গলাভের কথা। তাঁর সমাধি নেই, তাঁর মরদেহের নিদর্শন কোথাও নেই। তাঁর মৃত্যু নেই।

তাই বলে মৃত্যুকে ভয় পাননি তুকারাম। তাঁর একটি প্রিয় গানের

কটি কথাও ভাসা-ভাসা মনে পড়ল। এ গানে তুকারাম বলছেন,—

সারাটা জীবন ধরে
কতো পথ ঘুরেছে এ দেহ,—
জীবনের অবসানে
সব যাত্রা শেষ।
এক পথ আছে শুধু শ্মশানের পানে।
নিরাশ্রয় ষড়রিপু শোকে মুহ্যমান
আর্তনাদ করে বলে,—
কোথা তুমি, কোথা গেলে চলে ?
দেহ থেকে নাম থেকে রূপ থেকে
নিয়েছি বিদায়,
আমাকে চেনে না তারা আর,—
অনাসক্ত চিতার আগুন,
সে আগুনে দেহ হলে ছাই
দগ্ধ-পূত আত্মা পাবে বিট্‌ঠল চরণ।

ভিড়ের চাপ একটু কমেছে। চেরিলের কথা শুনে আগ্রহ বেড়েছে লোকটার। তার সঙ্গে চেরিল গেছে সামনের ঐ স্মৃতিগৃহে। আমি আর গা তুলিনি,—পিপুলের ছায়ায় বসে আছি পা ছড়িয়ে।

মৃত্যুকে চিনেছিলেন তুকারাম, কিন্তু মৃত্যু তাঁকে চেনেনি, স্পর্শ করেনি। বিট্‌ঠল চরণে পৌঁছবার জন্যে তুকারামের আত্মাকে মৃত্যুর তিমির পার হতে হয়নি। তুকারামের দেহ শ্মশানে পোড়েনি, সমাধিতে নীত হয়নি।

বিদেহী তুকারাম, দেহ থেকেও দেহমুক্ত। জীবন নশ্বর, জগৎ মায়া, দেহাশ্রিত ষড়রিপুর মায়াবন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে তাঁর চরণোপান্তে পৌঁছবার আকুলতা তুকারামের মনে নেই। থাকবে কেমন করে ? মরজীবনেই যে তিনি প্রভুকে পেয়েছেন ! দুঃখসুখের এই মরপৃথিবীতেই

দেহাশ্রিত আত্মার সিংহাসনে প্রভুকে বসিয়েছেন। জীবন থেকেও তুকারাম জীবন্মুক্ত।

প্রভু, তোমার সগুণ রূপের মোহেই আমি মজেছি। ইন্দ্রিয়ের বরণমাল্য গেঁথে নির্লজ্জা কামিনীর মতো দিনের আলোয় তোমার গলায় পরিয়েছি। বিটেবরী উভা কটাবরী হাত,—তোমার স্বপ্রকাশ মূর্তি দুচোখ ভরে দেখেছি। তোমার বন্দনাগান সারা জীবন তোমারই সংসারের পথে পথে আমি গেয়েছি। এই ভালো,—তোমার নির্গুণ রূপের লোভ আমাকে দেখিয়ো না।

তুমি লীলাময়, তাই তোমার লীলারসে আমার দেহমন ভরপুর। সেই রস তোমার ভরা সংসারে জনে জনে আমি বিলিয়ে বেড়াই। তুমি দুঃখ দিয়েছ, সেই দুঃখে বুক বেঁধে আমি ঘরে ঘরে দুঃখ লাঘবের ব্রত পালন করি। তুমি করুণা করেছ, সেই করুণার অঞ্জলি হৃদয়ের ঘটে ভরে আমি দ্বারে দ্বারে ছড়িয়ে দিই। এই কাজই করতে দাও, এমনি ভালোবাসতে দাও,—অন্ন যার অমৃত তাকে অমৃতের তৃষ্ণা দিয়ো না!

আমার প্রার্থনা শোনো নাথ,
আমাকে তুমি মুক্তি দিয়ো না।
সবাই চায় মুক্তি,
আমাকে রাখো বন্ধনের মাঝে।
আমার মন বৈষ্ণবের কুটীর,
আমার মাটির প্রদীপে
প্রেমের জ্যোতি।
সে জ্যোতির দ্বারে
পরম মোক্ষ জোড়হাতে দাঁড়িয়ে থাকে।
চাইনে মুক্তির অতীন্দ্রিয় শূন্যতা,—
আমি পেয়েছি তোমার নাম,

গেয়েছি তোমার গান,
বুকভরা তোমারই নিত্যামৃত।
তুকা বলে,—
নামই আমাকে দাও, প্রেমই আমাকে দাও,
দয়া করো,
মুক্তি দিয়ো না।

পরিণত বয়স হোলো তুকার। নামদেব শত কোটি অভঙ্গ রচনার প্রতিজ্ঞা সম্পূর্ণ করে যেতে পারেন নি। সেই প্রতিশ্রুতি পালনের ভার নিয়েছিলেন স্বপ্নাদিষ্ট তুকারাম। সহস্র সহস্র অভঙ্গ রচনা করেছেন। এই অভঙ্গাবলী তাঁর আধ্যাত্মিক আত্মজীবনী।

এখনো অভঙ্গ রচনা করেন। এক একটি গান বিকচ কুসুমের মতো নিবেদন করেন বিট্‌ঠল চরণে। কুসুম-সুরভিতে আকৃষ্ট হয়ে শত শত ভক্ত তাঁর কাছে আসে। শত ভক্তির ধারা তাঁর ভক্তি-মন্দাকিনীতে যোগ দেয়।

ক্রমে সায়াহ্ন ঘনিয়ে এল, নামল শেষের সন্ধ্যা। প্রদীপ জ্বলে, শাঁখঘণ্টা বাজে, দিগন্তে সন্ধ্যাতারাটি ফোটে। সেদিনও তাঁর জীর্ণ গৃহে বসে নামগান করছেন তুকারাম,—মুখে মুখে রচনা করছেন অভঙ্গের পদ। ভক্তমণ্ডলী ছুটে এসেছে তাঁর গানের আকর্ষণে। বিমুগ্ধ হয়ে শুনছে। মাঝে মাঝে নামগানে তারাও কণ্ঠ মেলাচ্ছে। নির্নিমেষ চোখে সন্তের নিবিষ্ট মুখের দিকে তাকিয়ে রয়েছে তারা। সে মুখে বিচিত্র ভাবের উদ্ভাস,—তার কিছু বা বুঝছে কিছু বুঝছে না।

প্রথম প্রহরে শুরু হয়েছিল গান। দ্বিতীয় প্রহর তৃতীয় প্রহর কাটল। চতুর্থ প্রহরেও তুকারাম গেয়ে চলেছেন। শেষ প্রহরের রাগিণীতে পরম আত্মনিবেদন।

তারপর পরিপূর্ণ স্তব্ধতা। আর বাক্য নয়, সুর নয়,—অন্তরের গভীরে শুধু নিঃশব্দ মন্ত্র, অনির্বচনীয় উপলব্ধি। এবার চোখদুটি বুজে

আসুক, অন্তরের গভীরে জাগুক তোমারই ধ্যানরূপ। দেহস্থিত জীবন আর দেহাতীত জীবনের যুগল চক্রবাল জুড়ে স্ফুট হোক তোমারই অদ্বৈত প্রকাশ।

বৈকুণ্ঠপতি মনের কথা বুঝেছেন। পূরণ করেছেন শেষ অভিলাষ। তিনিই পাঠিয়েছিলেন মর্ত্যে,—সাঙ্গব্রত সন্তানকে তিনিই এবার ফিরিয়ে নেবেন নিজের কোলে।

শেষবারের মত চোখ খুলল।

মরচক্ষে তুকা দেখলেন,—তিনি সামনে এসে উপস্থিত হয়েছেন। তাঁর পদ্মপাণি দিয়ে তুকার হাত তিনি ধরেছেন। তুকার চোখে কমল নয়ন রেখে তিনি আশ্বাস দিয়ে বলছেন,—তোমার মনোমন্দিরই আমার বৈকুণ্ঠ। তুমি দেহাতীত ভক্ত, দেহযন্ত্রণা তোমার জন্যে নয়। এই বর তুমি নাও, এস আমার সঙ্গে।

এই সেই গৃহ আমার সামনে,—মর্ত্যলোকের বিষ্ণুবৈকুণ্ঠ। এইখানেই সন্ত তুকারাম সশরীরে স্বর্গলাভ করেন। তাই এখানে বিপুল ভক্ত সম্মিলন।

আমি দেখলাম,—শীর্ণ কপাটের বাধা বাঁচিয়ে লোকটা চেরিলকে বার করে আনছে, শক্ত মুঠিতে চেপে ধরে আছে তার হাত। অন্য হাতে আটকাচ্ছে ভিড়ের চাপ। লোকটার গা দিয়ে দরদর ঘাম ঝরছে,—চেরিলেরও মুখ টকটকে রাঙা। তার কামিজে নোংরা দাগ। কিন্তু মুখ প্রসন্নতায় ভরা। অচেনা লোকটার প্রতি কৃতজ্ঞতা মাখানো চোখ।

আমার পাশে এসে বসল লোকটা। জামার হাতায় ঘামে ভেজা কপালটা মুছল। এতোক্ষণে একটু সহৃদয় গলায় আমার সঙ্গে কথা বলার সময় হোলো তার। বললে,—

ভাগ্যিস্ আপনি ভেতরে যান নি দাদা! ঠিক মারা যেতেন! উফ্!

চেরিল বললে,—ইস্! এমন উফ্-উফ্ করার মতো নয়! বুড়ো মদ্দ হাঁফাচ্ছে ছাখো?

চেরিলের গলায় কৌতুকের ছোঁওয়া লেগেছে।

বটে? আমি যদি সঙ্গে না থাকতাম প্রাণটা বাঁচত? মেমসাহেবের ঝুলি ভরতি পুণ্যি কিনা এখন,—তাই বড়ো দেমাক!

চেরিল লোকটার পাশে বসল। একটু গম্ভীর হোলো তার গলা।

তুমি অচেনা লোক, কিচ্ছু জানো না। আমার ঝুলিতে পুণ্যি নেই।

বলো কী? সারাদিনে এতো তীর্থ ঘুরলে,—একদানাও জমেনি?

কোন্ পাত্রে জমবে বলো? ভক্তিপাত্রে? আমার ভক্তি আছে নাকি?

চেরিলের কথায় আমিও অবাক্ হলাম। তার সঙ্গে আমার তুদিনের পরিচয়, কিন্তু এই তুদিনে তার ভক্তিময়ী রূপটিই আমার চোখে পড়েছে। পূর্ণ চৈতন্য মহারাজের কথকতার আসরে, দেব-মন্দিরে, সাধক-স্মারক তীর্থে। এই তো দেখলাম কী আকুলতা নিয়ে সে তুকারাম স্মৃতি-ভবন দর্শন করে এল। কতো একাত্মতার সঙ্গে সে শুনেছে নামগান, গলা মিলিয়েছে নিজে। তার কৌতুক হাসিও ভক্তিরসে ভরপুর! চেরিলের প্রাণে ভক্তি নেই?

চেরিল, বলো কী তুমি?

ঠিকই বলছি সখা, বোঝাটা শক্ত কিসের?

আমি হাঁ করে ওর মুখের দিকে তাকালাম।

চেরিল আবার বললে,—আমার ধর্ম আলাদা, জাত আলাদা। তোমাদের ঐ ঠাকুরের জন্যে আমার ভক্তি কিসের? পাথরের একটা নিষ্প্রাণ মূর্তি, আর ইট বাঁধানো কার একটা সমাধি,—একবার চোখে পড়ল আর সঙ্গে সঙ্গে ভক্তি আমার বুকের মধ্যে টগবগিয়ে উঠল?

আশ্চর্য! তাহলে তুমি কেন এসেছ চেরিল? অচেনা মানুষের ভিড়ে কেন তুমি ঘুরছ?

চেরিলের হাসিমুখ রোদের আভায় টুকটুকে হোলো, ঝিলিক দিল তার চোখের নীল। বললে,—

বলব? সঙ্গের জন্যে, আশ্রয়ের জন্যে। আমার প্রাণে ভক্তি না থাক, তাতে কী? আমি এসেছি ভক্তির মহাতীর্থে। ভক্তির স্রোত আমাকে ঘিরে রয়েছে। ভক্তমনের সঙ্গ আমি পাচ্ছি, শরণ নিয়েছি ভক্তি-পারাবারের তীরে। এই কি যথেষ্ট নয়?

বিমুগ্ধ বিস্ময়ে চেরিলের মুখের দিকে তাকিয়েছিল ঐ কালো লোকটা। নীরবে তার চোখ গিলছিল চেরিলকে। কান গিলছিল চেরিলের কথা। হঠাৎ আমার গায়ে কনুই-এর কড়া ধাক্কা দিল। তারপর হেঁকে উঠল,—

এই আজব চিজটিকে কোথা থেকে জোগাড় করলেন দাদা?

চেরিল মুখ ঘুরিয়ে ঝংকার দিয়ে উঠল,—

জন্তু কোথাকার!

হোহো করে জন্তু হাসল।

আমি কথা ঘুরিয়ে বললাম,—চেরিল, আজ সকালে তুকারামের একটি গান শুনিয়েছিলে, মনে পড়ে? নাও, এবার আর একটি গান শোনাও।

আপত্তি নেই, দ্বিধা নেই। একবার চোখ বন্ধ করে একটু ভেবে নিল। তারপর স্বচ্ছ স্নিগ্ধ কণ্ঠে ইংরেজি অনুবাদে শোনালো,—

প্রভু আমায় ঠাঁই দিয়েছেন
চরণ পরে,
প্রভু আমায় সব দিয়েছেন
ভুবন ভরে।
মধুর ভুবন মাঝে আমি
আপনহারা,—
সব পেয়েছি বুকের মাঝে
'আমি' ছাড়া।

সেই আমিকে ঢুকিয়ে দিয়ে
তাঁরই পায়ে
জন্মমৃত্যু এক হোলো মোর
অভিপ্রায়ে,—
ইন্দ্রিয় আর আত্মাতে মোর
বিভেদ তো নাই,
ভক্তিতে মোর হৃদয় ভরা
মুক্তি না চাই ॥

॥ ১২ ॥

অ্যাঁ? একেবারে নতুন মানুষ যে হে? তুমি এখানে কেন?

আপনাদের সহযাত্রী হব বাবা।

তাই নাকি? চেরিল তোমাকেও পাকড়েছে?

আজ্ঞে না, আমি পাকড়েছি ওঁকে।

তুমি পাকড়েছ? আমার চেরিল মাকে? তাহলেই হয়েছে!

চেরিল বললে,—সত্যিই বলছে বাপ্পা। দেহুর মন্দিরে দেখা। আমরা ডাকি নি, ও আমাদের ডাকবেই, আমরা সঙ্গে আনি নি, ও জোর করে আসবেই।

আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে মহারাজ বললেন,—মেয়েটা যা বলছে সত্যি?

হ্যাঁ সত্যি। তাই ওর নাম দিয়েছি নাছোড়বান্দা নাথুরাম।

ফিরতি বাসে লোকটা নাম-পরিচয় জানিয়েছিল। সবার আগে দৌড়ে বাসে উঠে পাশাপাশি একজোড়া সীট দখল করেছিল।

জানলার ধারটায় বোসো মেমসায়েব, আমি কিন্তু বসব তোমার পাশে,—কেমন?

পেছনের সীটে বসে ওদের কথোপকথন শুনেছিলাম।

অমন মেমসায়েব মেমসায়েব বলে হাঁকছ কেন? আমার নাম চেরিল।

চেরিল, চেরিল!

তারিয়ে তারিয়ে উচ্চারণ করে বলেছিল,—খাসা নাম, সুন্দর নাম, ডাকতে বেশ লাগে! কতো চেনা চেনা মনে হয়।

আহা কতো কালের চেনা আমার! কই, তোমার নামটি কি বলো তো হে!

নাথুরাম হে নাথুরাম। যারা আপনজন তারা নাথু বলে ডাকে। তা তুমি শর্টকাট করে নাথ বলেও ডাকতে পারো।

হেসে গড়িয়ে পড়ল চেরিল। আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে বললে,—শোনো সখা, লোকটার আবদার। বলতে হবে কিনা,—ও মাই নাথ, ও মাই লভ্, ও মাই ডিয়ার!

বলবে না মাই ডিয়ার চেরিল?—হাসতে হাসতে নাথুরাম বললে।

বয়েই গেছে! কে হে তুমি নাথ? উড়ে এসে জুড়ে বসলে কাছ ঘেঁসে?

নাছোড়বান্দা নাথুরাম মহারাজকে অনুরোধ করল,—আপনারা নিশ্চয় কালই যাত্রা করছেন বাবা। আপনাদের সঙ্গে আমিও যেতে চাই,—আমাকে দলে নেবেন?

আমি দলে নেবার কে হে? আমার কি কোনো দিঙী আছে নাকি? যে দিঙীতে আমাকে ঠাঁই দেবে, সেই দিঙীতেই আমি। দলে টানবার হলে তিনিই টানেন, দল ছাড়াবার হলে তিনিই ছাড়ান!

তাহলেও আমি আপনার সঙ্গেই আসব।

পূর্ণচৈতন্য কৌতুক-হাসি হাসলেন।—আমার সঙ্গে কেন বাবাজী? বলো আমার মা জননী চেরিলের সঙ্গে,—তাই তো তোমার মনোবাঞ্ছা হে?

আমি হোহো করে হাসলাম। নাথুরাম অপ্রতিভ।

মহারাজ আবার খুব সহজ হয়ে বললেন,—চেরিলকে তুমি

পাকড়েছ, বড়ো আশ্চর্যের কথা বললে হে! ওকে পাকড়াবে কে? ঐ তো ভিন্‌দেশ থেকে ছুটে এসে পাকড়ে বেড়াচ্ছে আমাদের। আমাকে পাকড়েছে, ওর এই বাঙাল সখাকে পাকড়েছে, পাগলা কান্‌হাইয়ালালটাকে পাকড়ে রেখেছে। তেমনি তোমাকেও পাকড়েছে ওই। ও না পাকড়ালে তুমি এসে জোটো কী করে? আবার যখন ছেড়ে যাবার মতি হবে তখন ওকে পাকড়ে রাখতে পারবে না কেউ। তাই না চেরিল?

এবার বড়ো নতুন লাগছে মহারাজকে,—যেন অন্য মানুষ। ব্রহ্মগিরির কঠিন শীতে তাঁকে দেখেছিলাম ঐ পর্বতচূড়ারই মতো নিঃসঙ্গ, পর্বতচূড়ারই মতো কঠোর। এখানে এই নদীতীরের জনপদে শেষ শরতের এই প্রসন্নতায় পূর্ণচৈতন্যের অন্য চেহারা অন্য মেজাজ। পাহাড়ী নদী যেন স্নিগ্ধ রূপ নিয়ে নেমে এসেছে শ্যামল উপত্যকায়। তাঁর কথা শুনে চেরিল মুখ নীচু করেছে। তার নত মুখের দিকে তাকিয়ে তাঁর দুচোখ দিয়ে স্নেহ ঝরে পড়ছে।

আমি একটা সূত্র পেলাম। শুধোলাম,—চেরিল আপনাকে কোথায় পাকড়াল মহারাজ?

এই তো ক-দিন আগে, নাসিকে। ত্র্যম্বক থেকে নাসিক হয়ে এখানে আসব। একটা দিন নাসিকে আছি,—দেখি গোদাবরীর ঘাটে একলা একলা ঘুরে বেড়াচ্ছে। সুন্দরনারায়ণ মন্দিরের সামনে মুখোমুখি দেখা। ছ্যাখো না, সেই থেকে আর ছাড়াছাড়ি নেই।

আমি চেরিলকে শুধোলাম,—নাসিকে তুমি কেন গিয়েছিলে চেরিল?

চেরিল মুখ তুলল। বাঃ, প্রথমেই তো নাসিক,—নাসিকে যাব না?

সেই তো বলছি,—এতো জায়গা থাকতে নাসিক কেন প্রথমেই? বোম্বাই নয় কেন?

বাঃ, ভারতবর্ষ দেখতে হলে সবার আগে নাসিকেই তো যেতে হয়।

কেন ? সেইটেই তো বুঝতে পারছিনে।

বুঝতে পারছ না ? ঝেঁকে উঠল চেরিল,—না আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছ ? তোমাদের আদি মহাকাব্য রামায়ণ,—সীতাহরণ তো নাসিকেই হয়েছিল, রাম-রাবণের মহাযুদ্ধের সূচনা তো নাসিকেই! নাসিক দিয়ে শুরু করব না ?

স্নেহের হাসি হাসলেন মহারাজ। বললেন,—শুনছ মেয়ের কথা ? এমনি কথা আমাকেও সেদিন বলেছিল গান্ধীস্মারক জ্যোতির সামনে দাঁড়িয়ে। তারপর বললে, নদীতীরের মন্দির-টন্দির সব দেখলাম, ওপারের পঞ্চবটী একটু আমাকে দেখাবেন বাপ্পা ?

আমি কপট ভয়ের গলায় বললাম,—ও বাবা, আবার বাপ্পা ? শুরুতেই ?

ঐ বাপ্পা ডাকেই তো আমাকে পাকড়াল।

কী কী দেখলে চেরিল বাপ্পার সঙ্গে ?

চেরিলের সব মুখস্থ। গড়গড়িয়ে বলে গেল,—দেখলাম সীতাগুম্ফা মারীচবধ আর সীতাহরণ। তারপর লক্ষ্মণরেখা পার হয়ে ঢুকলাম তপোবনে। তপোবনের আঁকাবাঁকা পথে হেঁটে পৌঁছলাম রামসীতার আদি পর্ণকুঠীতে।

আমি জোরে হেসে উঠলাম।

আমিও পঞ্চবটী দেখেছি চেরিল। ওসব তো বানানো!

চেরিলের স্বভাবই যেমন। দপ্ করে জ্বলে উঠল।

বানানোই তো! ভক্তি-বিশ্বাসকে জাগিয়ে রাখবার জন্যেই তো পরের যুগের মানুষেরা ঐসব প্রতীক বানিয়ে রেখেছে। নইলে গোদাবরীর তীরে রামসীতার সেই কুটীর আজও থাকবে নাকি ?

আমি আর একটু চটাতে চাইলাম ওকে। ব্যঙ্গ করে বললাম,—তা ঐসব মিথ্যে করে বানানো গুহা ছবি আর কুটীর দেখে তুমি ভুললে ?

চেরিল জবাব দিল;—রামায়ণ বানানো নয় ? ছাপাখানায়

ছাপানো দপ্তরি দিয়ে বাঁধানো নয়? আমি তো আবার ইংরিজী তরজমা পড়েছি। বাল্মীকির নিজে হাতে লেখা রামায়ণ কেউ চোখে দেখেছে? তাই বলে আমার বানানো রামায়ণ পড়া মিথ্যে?

অকাট্য যুক্তি। কোনো উত্তর নেই। আমার মুখে কুলুপ এঁটে দিয়ে চেরিল বললে,—তুমি কী যে মাঝে মাঝে বলো সখা? ভগবানকেও তো মানুষই বানিয়েছে—শুধু মাটি দিয়ে পাথর দিয়ে নয়, ভক্তি দিয়ে বিশ্বাস দিয়ে।

প্রসন্ন হাসিতে মহারাজের মুখ ভরে গেল। এই তো কথার মতো কথা।

চেরিল বলে চলল,—নাসিকে গোদাবরীর এপারে ওপারে পাথর-বাঁধানো ঘাট। মন্দিরের পর মন্দির, হাজার লোক স্নান করছে, পুজো দিচ্ছে। সন্ধ্যেবেলা দোকান-পসারের হৈচৈতে আরতির শাঁখঘণ্টা ডুবে যায়। ওখানকার বটের ছায়ায় নির্জন নদীর কুলুকুল কানে শুনলাম,—ক্রৌঞ্চবিরহ আর সীতাবিরহের বিলাপ ঐ কল্লোলের মধ্যে একসঙ্গে মিশে আছে।

চেরিলের মুখের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে আছে নাথুরাম। তার মুখে কথা নেই, চোখভরা বিস্ময়। তার ফ্যালফ্যাল চোখের দিকে চোখ পড়তে চেরিল একটু গুটিয়ে নিল নিজেকে। কথা ঘোরাবার জন্যে বললে,—নাথুরামের সঙ্গে একটু আলাপ করুন বাপ্পা।

পূর্ণচৈতন্য মহারাজ তরুণ আগন্তুকের দিকে তাকালেন, ভালো করে তাকে দেখলেন। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন,—কোথা হতে আসা হচ্ছে বাবা? কোথায় তুমি থাকো?

নাথুরাম বললে,—আপনি সজ্জনগড় গিয়েছেন? সমর্থ রামদাসজীর সমাধি?

গিয়েছি বৈকি।

ঐ সজ্জনগড় পাহাড়ের কোলে আমার জন্ম। এখন থাকি কোল্‌হাপুরে।

কী করা হয় বাবা ?

বাবার সামনে বিনীত বশংবদ নাথুরাম।

এমন কিছুই নয়। কোল্‌হাপুরে একটা স্কুলে পড়াই আর কলেজ লাইব্রেরিতে একটু বই-টই ঘাঁটি।

তা এই যাত্রায় যোগ দিয়েছ কবে থেকে ?

এখনো যোগ দেওয়া হয় নি। আপনার দয়ায় এই শুরু।

বাঃ, বেশ বেশ। এই প্রথম বার ? খুব ভালো হোলো তোমাকে সঙ্গী পেয়ে। তা হঠাৎ বুঝি মন হোলো ?

তা বলতে পারেন। হয়তো বিট্‌ঠলই ডেকেছেন।

বিট্‌ঠল ডেকেছেন ? মুখে হাসি ছড়িয়ে গেল মহারাজের,—বেশ বলেছ বাবা। তিনি না ডাকলে কেউ আসতে পারে ? শুরু করতে পারে ? কিন্তু যার শেষ নেই, তাকে ধরে থাকতে পারবে তো ? এ পথ যে বেশ কষ্টের বাবা !

এতোক্ষণ বিনয়ে মিউমিউ করছিল নাথুরাম। হঠাৎ চট করে একটু ছুঁইয়ে দিল, চমকে দিল মহারাজকে,—বলেন কী ? আমি পারব না ? নামদেব যদি পেরে থাকেন, আমি ভয় পাব ? এমন কী আর পাপীতাপী আমি,—বিড়ি-সিগারেটটুকুও তো ছুঁইনে !

আমার প্রিয়জন প্রচুর, সংসার আমার প্রেমের ডোর। বিরহ-স্বাদের লোভে আমি সংসার ছেড়ে পথে বার হই,—আবার ঘরে গিয়ে প্রেমকে নতুন করে পাব বলে। ঘরের প্রেম নায়িকার মতো আমার জন্যে প্রতীক্ষা করে।

তাই পথে বার হয়ে আমাকে নায়ক সাজতে হয় না। কিংবা ঘরের দেউড়িতে বসে অলীক নায়িকার গন্ধে গন্ধে পথে-বিপথে স্বপ্ন-ভ্রমণ করতে হয় না। আমি ভ্রমণের কথা চেনা-জানা লোককে শোনাতে ভালোবাসি, ভ্রমণ-রোমান্স্‌ ফাঁদিনে।

তা যদি পারতাম তাহলে নামদেবের নাম শুনে এমন উৎকর্ণ হতাম না। নাথুরামের মুখের দিকে অমন উৎসুক চোখে তাকাতাম না।

আমি তো নাথুরামের চোখ দেখেছি। যে চোখ দিয়ে বিভোল মুগ্ধতায় সে চেরিলের মুখের দিকে তাকিয়েছে। কই, আমি তো নিজের চোখ বুঁজে মনের মধ্যে এক ত্রিভুজ প্রেমের জাল বুনতে পারলাম না?

কেন পারলাম না?

মায়া-ভ্রমণের কল্পনায়ক নই বলে। আমি যে ভ্রমণ-মধুকর। তাই অসুরদেহ নাথুরামের দিকে তারিফের চোখে তাকালাম।

মহারাজ তার পিঠ চাপড়িয়ে বললেন,—চমৎকার, চমৎকার বলেছ বেটা! বেশ জানশুন্ আছে দেখছি তোমার। নাও হে, নামদেবের যাত্রার কাহিনীটি সবাইকে শুনিয়ে দাও তো,—দেখি কেমন পারো!

বুদ্ধিমান ছেলে নাথুরাম, শক্তিমান ছেলে। এক ধাক্কায় আগল ভেঙেছে। এবার বাবু হয়ে জাঁকিয়ে বসল। শুরু করল নামদেবের কাহিনী।

পাথরের মতো দেহ,—তেমনি পাথরেরই মতো মন। পেশীতে যেমন অমিত শক্তি, বুকে তেমনি ভয়ংকর নৃশংসতা। দয়া নেই, মায়া নেই, বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ নেই। লুঠ করতে পারে, ঘর পোড়াতে পারে, খুন করতে পারে নির্বিশেষে।

বাপ ছিল ভক্তিপথের পথিক,—কাজে দরজি। কাপড় সেলাই পেশা আর হরিনাম নেশা। মাও ভক্তিমতী। তাদের ছেলে কিনা এই,—খুনে ডাকাত?

সংসারের সঙ্গে সম্পর্ক নেই, সমাজ থেকে একঘরে। কুছ-পরোয়া নেই তাতে,—ঠ্যাঙাড়ে হয়ে ঘুরে বেড়ায়, পথের ধারে ঘাপটি মেরে বসে থাকে। লুঠেরা গুণ্ডাদের নিয়ে দুর্দান্ত একটা দল বানিয়েছে,—সেই দলের দলপতি।

পথিকেরা যায় পথ বেয়ে। কেউ একলা, কেউ দলেবলে। কেউ শূন্য হাতে, কেউ ধনরত্ন নিয়ে। অতর্কিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে। খুন জখম

লুটপাট করে শক্ত ঘাঁটির মধ্যে আত্মগোপন করে। নিশিরাতে হানা দেয় গৃহস্থের বাড়ি। সর্বনাশ করে নিরীহ পরিবারের।

ভক্তি আছে বৈকি প্রাণে। সে ভক্তি মানুষের নয়, দানবের। মাঝে মাঝে ভক্তির ধমকে দেবীমন্দিরে গিয়ে পূজা দেয়। দেবীর করুণাময়ী মাতৃকামূর্তি চোখে পড়ে না। তার চোখে দেবী বিভীষণা মাতঙ্গিনী,—ধ্বংসরূপিণী। সেই দেবী তার আরাধ্যা,—সেই দেবীর বরেই সে মত্ত মাতঙ্গের মতো বিভীষণ।

দূরের এক যাত্রীদল ক-দিন আগে আশ্রয় নিয়েছিল পাশের এক গ্রামে। হানা দিয়েছিল তাদের ওপর। আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল বাড়ির পর বাড়ি। সর্বস্বান্ত করেছিল পরিবারের পর পরিবার। বইয়ে দিয়েছিল রক্তগঙ্গা।

তারপর মন্দিরে এসেছে মায়ের পুজো দিতে। খোলা কৃপাণ হাতে নিয়ে। ডাকাত সর্দারের মুখোমুখি হবে কে? অন্য পূজার্থীরা দূরে দূরে,—পুরোহিত ঠকঠক করে কাঁপছে। সবাই মনে মনে ভাবছে,—কখন ফিরে যাবে, বিদায় হলে বাঁচি।

কোনোদিকে তাকাল না। সোজা এগিয়ে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়াল বিগ্রহের সামনে। চোখ বোঁজা,—অঞ্জলিবদ্ধ হাতে রক্তপুষ্পের অর্ঘ্য। ঠোঁট দুটি নড়ছে,—কী মন্ত্র পড়ছে সেই জানে। টুঁ শব্দটি করছে না কাছাকাছি কেউ।

চারদিক নিস্তব্ধ। মাতৃমূর্তির সামনে সটান দাঁড়িয়ে দুর্দান্ত দস্যুর দানব মনের নীরব আত্মনিবেদন। কেবল একটি শিশু কাঁদছে,—তার মা তাকে চুপ করবার জন্যে তাড়না করছে।

সেই কান্নার শব্দে কান ঝালাপালা,—ভুল হয়ে যায় মন্ত্রোচ্চারণে। এক লাফে এসে দাঁড়ালো তাদের সামনে,—মাকে লাগালো কড়া ধমক।

থামাতে পারো না ছেলেকে? কাঁদছে কেন তোমার বাচ্চা?

ম্লানমুখী অল্পবয়সী এক বিধবা। মুখ তুলে তাকাল দস্যুর দিকে। বললে,—কাঁদছে খিদেয়।

খিদেয়? তা খাবার দিচ্ছ না কেন?

খাবার নেই বলে।

খাবার নেই? এ কেমন কথা? মা না তুমি? খাবার কিনে খাওয়াচ্ছ না কেন?

কোথা থেকে কিনব? পয়সা নেই,—ভিক্ষে করতে এখনো শিখিনি।

চোখে জল নেই। প্রাণে যদি শোক থাকে দৃঢ়কঠিন গলায় তার কোনো প্রকাশ নেই। দস্যু ভালো করে তাকাল জননীর অনবগুণ্ঠিত মুখের দিকে। এ মুখ তো ভিখারিণীর নয়!

কর্কশ গলাটা একটু নামিয়ে বললে,—ভিক্ষে করবে কেন তুমি? কেউ নেই তোমার?

না, কেউ নেই। সব ছিল,—এখন আর কেউ নেই। কিছু নেই।

কী করে হারালে?

হারালাম দস্যুর হাতে। সে আমার স্বামীকে মেরেছে। সর্বস্ব লুঠ করেছে, আগুনে পুড়িয়েছে আমার ঘরসংসার।

একটি কথাও বলল না আর। মনে ভেসে উঠল কৃতকর্মের স্মৃতি,—চোখের সামনে দেখল কৃতকর্মের ফল। এই নারী আর শিশু,—সর্ববঞ্চিত, সর্বহারা। এই সর্বনাশের জন্যে দায়ী কে?

ধীর পায়ে ফিরে এল মাতৃমূর্তির সামনে। পূজা সম্পূর্ণ হয় নি, বাধা পড়েছিল কান্নায়। এবার শেষ করতে হবে পূজা,—মায়ের পায়ে শেষ অঞ্জলি।

ডানহাতের কৃপাণটি তুলল মাথার ওপর। তারপর সেই কৃপাণকে নামাল নিজের ঘাড়ে।

হাঁ-হাঁ করে ছুটে এল পুরোহিত আর পূজার্থীরা। ভিড়ে ভিড়,—নাটমন্দিরে রক্তপ্লাবন।

প্রাণে মরেনি একেবারে। অনেক শুশ্রূষার পর জ্ঞান হোলো। চোখ খুলে দেখে ঐ বঞ্চিতা জননীর কোলেই মাথা রেখে শুয়ে আছে।

এ আর-এক রত্নাকর। কার জন্যে তুমি হিংসা করো, লুণ্ঠন করো, হত্যা করো? কার জন্যে পরের সম্পদ কেড়ে নিয়ে নিজের ঝুলি ভরাও? কে নেবে তোমার পাপের ভাগ? কেউ নেবে না,—তোমার পাপের বোঝা তোমাকেই বইতে হবে।

একটু সুস্থ হয়ে আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল দস্যু। স্খলিত পায়ে মন্দিরের বাইরে এল। পথের ধারে একটা বটগাছ। তার ছায়ায় এসে বসল। প্রসারিত পথ ডাইনে বাঁয়ে। কোন্ পথে এখন সে যাবে?

কানে এল কীর্তনের গান আর মন্দিরার সুর। একটি দল আসছে। খালি গা, খাটো শ্বেত বসন, গলায় তুলসীমালা, কপালে চন্দন তিলক। প্রত্যেকের হাতে একজোড়া করে খঞ্জনী। খঞ্জনী বাজিয়ে গান করে নেচে নেচে চলেছে। দলের মাথায় উড়ছে কয়েকটা গেরুয়া নিশান।

এমনি দল আগেও সে অনেক দেখেছে, ওদের না থাকে টাকাকড়ি, না থাকে পণ্যের পসরা। ওদের ধরেও লাভ নেই, মেরেও লাভ নেই। ডেকে কথা বলতেও কখনো ইচ্ছে করেনি ওদের সঙ্গে। তাচ্ছিল্য করে মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছে কেবল।

এবার কী মনে হোলো। উঠে দাঁড়িয়ে এগিয়ে গেল। ক্লান্ত গলায় বললে,—তোমরা কারা?

আমরা বারকরী।

তার মানে?

আমরা নির্দিষ্ট সময়ে ঘর থেকে বার হয়ে আসি,—তীর্থযাত্রা করি। এই ব্রত আমরা বারবার প্রতিবার পালন করি,—তাই আমাদের নাম বারকরী।

তোমরা সন্ন্যাসী?

সন্ন্যাসী হব কেন? আমরা সংসারী,—আমাদের দেবতা বিষ্ণু-ভগবানও সংসারী। প্রিয়তমা পত্নী রুক্মিনী দেবী যে তাঁর পাশে!

তোমরা কি সব ব্রাহ্মণ?

না, ব্রাহ্মণ তো সবাই নই। কেউ ব্রাহ্মণ, কেউ ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য। কেউ আবার অচ্ছুৎ। বারকরীর কি জাতিভেদ থাকে? আমাদের প্রভু যে আচণ্ডালকে কোল দিয়েছেন!

কোন্ পথে তোমরা যাবে?

ভক্তির পথে, প্রেমের পথে, বৈরাগ্যের পথে। এ পথের নাম ভাগবতের পথ।

কোন্ তীর্থে পৌঁছবে?

বারকরীর তীর্থে। বিট্‌ঠলতীর্থ পাণ্ধারপুরে।

বারকরীরা আর দাঁড়াবে না। বেজে উঠল মন্দিরার টুংটাং। ঐ মন্দিরাধ্বনি বুকের মধ্যেও বুঝি বেজে উঠল লোকটার, আকুল গলায় বললে,—শোনো, শোনো, আমাকে তোমাদের সঙ্গে নেবে?

বাঃ, কেন নেব না? আমরা তো সঙ্গী কুড়িয়ে কুড়িয়েই পথ চলছি!

কিন্তু তোমরা জানো না, আমি যে দস্যু,—আমি খুনী, আমি মহাপাপী!

বটে? তাই নাকি? বুঝেছি,—তোমার ভাণ্ড এখনো পক্ব হয়নি। তাতে কী? সময়ে সবই হবে। পা মিলিয়ে চলো আমাদের সঙ্গে। গলা মেলাও আমাদের নামগানে। আর দেরি কোরো না।

দস্যু ভিড়ল বারকরীদের দলে। চলল পাণ্ধারপুর উদ্দেশ্যে। গলা ছেড়ে গান করতে করতে,—

জয় জয় বিট্‌ঠল রামকৃষ্ণ হরি।

॥ ১৩ ॥

এই রত্নাকরই মহারাষ্ট্রের শ্রেষ্ঠ সাধক-কবি পরম বিট্‌ঠলভক্ত সন্ত নামদেব। ত্রেতাযুগের দস্যু রত্নাকর ত্রাণ পেয়েছিলেন রামনাম জপ করে। দীর্ঘকাল রামতপস্যা করে। তাঁর তপোকঠোর নিস্পন্দ দেহ

বল্মীকে ঢেকে গিয়েছিল। তাই তাঁর অপর নাম বাল্মীকি। কলির এই রত্নাকরও পাপ থেকে মুক্ত হয়েছিলেন নামের গুণে,—রামকৃষ্ণ বিট্‌ঠল নাম। তাই তাঁর নাম নামদেব।

তবে নামদেব নিভৃতে বসে তপস্যা করেননি। প্রভুর নাম কণ্ঠে নিয়ে তিনি পথে বেরিয়েছিলেন, পথে হেঁটেছিলেন। বাল্মীকি রামায়ণ রচনা করেছিলেন, যার শ্লোকসংখ্যা চব্বিশ হাজার। নামদেব নিয়েছিলেন লক্ষ অভঙ্গ রচনার অঙ্গীকার। অভঙ্গ গান গেয়ে গেয়ে তিনি প্রভুর নাম ছড়িয়ে দিয়েছিলেন সংসারের পথে পথে। বারকরীদের সঙ্গে যাত্রা করে তিনি পৌঁছেছিলেন পান্ধারপুরে বিট্‌ঠলজীর শ্রীচরণে। তারপর সেই চরণস্পর্শ করে বিট্‌ঠল নাম কণ্ঠে নিয়ে পরিভ্রমণ করেছিলেন সারা উত্তর ভারত। আবার ফিরে এসেছিলেন বিট্‌ঠল-চরণে পান্ধারপুরে। সেইখানেই তাঁর শেষ জীবন কেটেছিল,—সেখানেই সম্পূর্ণ হয়েছিল তাঁর আশি বছরের পরমায়ু।

নাথুরাম স্পষ্ট কথার মানুষ। তার মনে মুখে দু-কথা নেই। পাপীতাপী সে নয়,—এ কথা হেঁকে বলতে তার কুণ্ঠা নেই। এ প্রসঙ্গে নামদেবের সঙ্গে নিজের তুলনা করতে তার আটকায় না। খুনে দস্যু যদি বারকরীর দলে ভিড়ে তরে যেতে পারে তাহলে নাথুরাম পারবে না কেন?

আমরা সবই যদি পারি, ঐ তাগড়া জোয়ান মারাঠা ছেলেটা পারবে না? মহারাজ তাকে পরীক্ষা করতে চেয়েছিলেন, নামদেবের কাহিনী আউড়ে পরীক্ষায় বহুত নম্বর পেয়ে সে পাস করেছে, মহারাজ তাকে বাজাতে চেয়েছিলেন,—সে একেবারে টং টং করে বেজেছে।

তবু পরীক্ষা শেষ হয়নি। নাথুরাম ছুঁইয়েছে ভালো, আওড়েছে ভালো। কিন্তু তাতেই সে একেবারে উৎরোয়নি।

নাথুরামের পিঠ চাপড়ে পূর্ণচৈতন্য বললেন,—বেশ বলেছ বাবা।

তবে বারকরীর দলে ভিড়ে যাত্রা করা সোজা, বারকরী হওয়া সোজা না।

বিট্‌ঠল আর বারকরী,—এ দুটি শব্দের পাশাপাশি ঠাঁই। বিট্‌ঠল প্রভু, আর বারকরী ভক্ত। বারকরী, বারকরী,—আলন্দীতে পা দিয়ে অবধি কতোবার যে নামটা কানে এসেছে!

চেরিল শুধোলো,—কেন বাপ্পা, বারকরী হতে হলে কী করতে হয়?

কিছুই করতে হয় না মা, বারকরী হতে হয়!

বারকরী হওয়া কি খুবই শক্ত?

কীসের শক্ত মা?

আমি শুনেছি এদেশের শ্রেষ্ঠ তীর্থ হিমালয়। তীর্থযাত্রীরা পাহাড়ী পথে দিনের পর দিন হেঁটে হেঁটে হিমালয়ের দুর্গম তীর্থে যায়, —সে পথে আহার জোটে না আশ্রয় জোটে না,—পদে পদে মৃত্যুভয়। কতো লোক পথেই মরে থাকে, সহযাত্রীরা ফিরে তাকাবারও অবকাশ পায় না। বারকরীর পথ কি এমনি দুর্গম? এমনি ভয়ংকর?

পাগল! চলো না দেখবে। দলে বলে থাকবে, সহজ রাস্তায় নেচে নেচে গান করে করে যাবে,—পায়ে কাঁটাটি ফুটবে না!

আর খিদে পেলে? ঘুম পেলে?

খিদে মেটাবার খাশা খাদ্য জুটবে, ঘুম এলে গা ছড়িয়ে ঘুমোবে নিরাপদ আশ্রয়ে। সবচেয়ে বড়ো কথা, কানাকড়ি খরচটি নেই। সব খরচ জোগাবেন বিট্‌ঠল।

তবে?

তবে আর কী? নির্ভয়ে নিরুপদ্রবে যাত্রা শেষ করবে। কিন্তু তাই বলে বারকরী হবে না।

কান্‌হাইয়ালালের দেখা এ পর্যন্ত পাইনি। সে ছিল তাঁবুর মধ্যে। বোধহয় মহারাজ আর তাঁর ঘনিষ্ঠ সঙ্গীদের সান্ধ্যসেবার ব্যবস্থায় সে রত ছিল। গৃহস্থ না হয়েও গৃহস্থালিতে তার আগ্রহ,—ঐ কাজটিতে সে পটু। হাসিমুখে দায়িত্ব পালন।

এতোক্ষণে সে পাশে এসে বসেছে। কথার পৃষ্ঠে কথা শুনছে। শুধোলো সে,—মহারাজ, বারকরী হই আর না হই, কাল থেকে বারকরীদের সঙ্গে থাকতে হবে, চলতে হবে, দিনরাত কাটাতে হবে। তাই তার আগে একটু বারকরীতত্ত্ব আমাদের বুঝিয়ে বলুন।

পূর্ণচৈতন্যজীর কথা মন দিয়ে শোনবার জন্যে আমরা নড়েচড়ে বসলাম।

পূর্ণচৈতন্য বললেন,—

শোনো তাহলে। প্রথমেই মনে রেখো বারকরী কোনো তত্ত্ব নয়, কোনো দর্শন নয়। বারকরী কোনো বিদ্যাও নয়। বারকরী কোনো মহান্ গ্রন্থ লেখেনি। কোনো গ্রন্থপাঠ তার না করলেও চলে। বারকরী একটি ব্রত, একটি প্রতিজ্ঞা—যা সারাজীবন ধরে পালন করতে হয়।

কী সে ব্রত মহারাজ?

খুবই সরল খুবই সহজ এই ব্রত। বারকরী হতে হলে কোনো দীক্ষা নিতে হয় না, কোনো অনুষ্ঠান করতে হয় না। শুধু মনে মনে একটি সংকল্প করতে হয়। সংকল্প কী জানো?

বলুন মহারাজ!

পথে বার হব, পায়ে পায়ে হাঁটব, প্রভুর নাম করতে করতে চলব আর পান্ধারপুরে পৌঁছে বিট্‌ঠলমুখ দর্শন করব।

ব্যাস, এইটুকু?

হ্যাঁ এইটুকু।

পূর্ণচৈতন্যজী যে ব্রতের কথা বললেন বারকরী কথাটির মধ্যেই তার মর্মার্থ। বারি আর করী,—দুটি আলাদা শব্দ এক হয়ে বারকরী হয়েছে। বারি অর্থ বারবার,—যখন খুশি নয়, নিয়মিতভাবে বারবার। পরপর তিনবার চারবার নয়,—সারা জীবন ধরে নিয়ম অনুসারে প্রতিবার। আর করী মানে যে করে। যে সারাজীবন ধরে নিয়মিত-ভাবে একটি নির্দিষ্ট কাজ করে সে বারকরী।

নির্দিষ্ট কাজটি কী? সহজ কাজ, কিন্তু সামান্য কাজ নয়। নির্দিষ্ট দিনে পান্ধারপুরে পৌঁছতে হবে। বিট্‌ঠলপ্রভুর কাছে সন্নিহিত হতে হবে। সেদিনটি হবে একাদশী তিথি। কাছাকাছি যারা থাকে, প্রতি একাদশীতেই তাদের অসুবিধে নেই। দূরে যারা থাকে, তারা দেবদর্শন করবে বছরে অন্তত দুবার,—দুটি নির্দিষ্ট দিনে। আষাঢ়ের শুক্লা একাদশী আর কার্তিকের শুক্লা একাদশী তিথিতে।

প্রভু, তোমায় বুকের মাঝে
নিত্য আছি ধরি,
প্রতি কাজে প্রতি খেলায়
তোমায় স্মরণ করি।
আষাঢ়ে আর কার্তিকেতে
সব ছেড়ে যাই তোমায় পেতে,
একাদশীর নয়ন আমার
দর্শনে দাও ভরি,—
বারংবারের ব্রত নিয়ে
আমি বারকরী॥

কারা এই বারকরী? মহারাষ্ট্রের কোন্ সমাজে তাদের উদ্ভব? যাদের যাত্রার সঙ্গে সামিল হয় আমরাও পথে হাঁটব, কী তাদের পরিচয়?

ভারতবর্ষের পথ উদাসীন পথিকের অচেনা নয়। পথকেই ঘর করেছে এমনি মানুষ এদেশে বিরল নয়। তারা আজ এখানে আছে কাল নেই।

পূর্ণ চৈতন্যজী বারকরী, তাই বলে সব বারকরীই কি তাঁর মতো? পূর্ণ চৈতন্য বুঝিয়ে বললেন,—

বারকরীরা উদাসীন নয়, বৈরাগী নয়, সত্যি কথা বলতে সাধু সন্ন্যাসীদের খুব তারা পাত্তা দেয় না। বারকরীর চাল আছে, চুলো আছে, ঘরসংসার সবই আছে। গৃহপরিবারের প্রতি তার টনটনে

মায়া আছে। তার কাজ আছে, পেশা আছে,—সংসারাশ্রমের কর্তব্য সম্বন্ধে তার সুপক্ক বোধ আছে। সন্ন্যাসাশ্রমের প্রতি তার বিন্দুমাত্র আসক্তি নেই।

সমাজবদ্ধ জীব বারকরী, কিন্তু সম্প্রদায়বদ্ধ নয়। বারকরী ধর্ম-গোষ্ঠী নয়, তার কোনো কেন্দ্রীয় বা শাখা সংস্থা নেই, কোনো মঠ নেই, কোনো মঠাধিপতি নেই। তার বসনে ভূষণে কোনো নির্দিষ্ট চিহ্নও নেই,—যা তাকে বারকরী বলে আলাদা করে চিহ্নিত করবে।

সংবৎসর যে যার ঘরে থাকে আলাদা হয়ে, নিজের নিজের কোট আগলে। পথে বার হলে সব একাকার। রাজা যাবেন রথে, সেনাপতি অশ্বারোহণে, শ্রেষ্ঠী যাবে শকট সাজিয়ে আর চাষী শ্রমিক পায়ে হেঁটে। এই তো দস্তুর। কিন্তু এ দস্তুর বারকরী যাত্রার নয়। সকলেরই চরণ সম্বল। রাজা প্রজা ধনী গরিব,—সব এক।

এক হয়ে পথে হাঁটতে পারো তো বারকরী হও,—মালকরী হও।

মালকরী আবার কে? মালকরী গলায় মালা দেয়। কীসের মালা? তুলসীর মালা। এই মালার কাছে রত্নমণির স্বর্ণহারও তুচ্ছ। কেন না এই মালা বিষ্ণু-বিট্‌ঠলের প্রিয়তম অলঙ্কার। সংসারে বসে নিজের নিজের জাতিবর্ণ নিয়ে গুমর করো, কে উচ্চ আর কে নীচ সেই ভাবনায় মনের ভাঁড়ার ভরিয়ে তোলো,—কিন্তু যখন বারকবী হয়ে পথে বেরিয়েছ, তখন আর সেটি চলবে না। তখন সকলেরই মুখে ভগবানের নাম, সকলেরই বুকে তুলসীর মালা। সকলেরই মন ধোয়া-মোছা পরিষ্কার। এই তুলসীর মালা কণ্ঠে ধারণ করে বলে বারকরীর আর এক নাম মালকবী।

বারকরীর পথ ভাগবতের পথ। তাই বারকরী যাত্রার আর এক নাম ভাগবতী যাত্রা। বারকরীকে শুধোও,—কোথায় চলেছ? উত্তরে শুনবে, ভাগবতী যাত্রায় চলেছি। উত্তর ভারতের সন্তদের নামে নানা পন্থ আছে,—ভক্তরা বিভিন্ন পন্থের পন্থী বলে নিজেদের ঘোষণা করেন—যেমন নানকপন্থী, কবিরপন্থী, রামানন্দপন্থী। কিন্তু মহারাষ্ট্রের

বারকরীরা কোনো বিশেষ সন্তনামের সঙ্গে পন্থনাম জড়ায়নি। তারা শুধু ভাগবতপন্থী।

ভাগবতী পথ গাড়িঘোড়ার রাস্তা নয়। সাধনা বা মোক্ষলাভের মার্গও নয়। কোনো সম্প্রদায় বা গোষ্ঠীরও গণ্ডিরেখা নয়। ভাগবতের পথ জীবনের পথ, জীবনযাত্রার পথ। এ পথ রাজপুরুষের নয়, তত্ত্বজ্ঞানী পণ্ডিতের নয়। মুমুক্ষু সাধকের নয়, বিবাগী সন্ন্যাসীর নয়,—এ পথ সাধারণ মানুষের। ভক্তির পথ, প্রেমের পথ, মানুষে মানুষে মিলনযাত্রার পথ। এই পথে যারা যায় তারা কাড়াকাড়ি করে না, হানাহানি করে না, লোভে জ্বলে না, মাৎসর্যে পোড়ে না। তারা সকলকে এক করে সকলের সঙ্গে এক হয়ে ভালোবাসায় ভেসে যায়।

বারকরীদের এই পথ দেখিয়েছে কে? দেখিয়েছেন বিট্‌ঠল প্রভু আর তাঁর ভক্ত সন্তমণ্ডলী। মহারাষ্ট্রের বুকে সন্তগণ যুগে যুগে অবতীর্ণ হয়েছেন,—সাধারণ মানুষের ঘরে তাঁরা জন্মেছেন, সাধারণ মানুষের ভাষায় কথা বলেছেন, ডাক দিয়েছেন সাধারণ মানুষকে। কেমন জাতের কেমন ঘরের মানুষ এই সন্তরা?

শ্রেষ্ঠ সন্ত জ্ঞানেশ্বর ছিলেন ভ্রষ্ট সন্ন্যাসীর অভিশপ্ত পরিবারের আশ্রয়হারা সন্তান। শ্রেষ্ঠ প্রচারক নামদেব ছিলেন নামগোত্রহীন, দরজির ঘরে পালিত পুত্র। যিনি দস্যু নামদেবকে দলে টেনেছিলেন,—সেই বৃদ্ধ ভক্তের নাম গোরা, পেশায় কুম্ভকার। একজন ছিলেন সাঁওতা, তিনি ছিলেন বাগানের মালী,—আর সেনা ছিলেন নবাবের ক্ষৌরকার।

আর চোখা? জাতে সে মহার, চণ্ডালের থেকেও নীচ। মরা জন্তুর সৎকার করা তার কাজ। এই ঘৃণ্যতম অচ্ছুৎকে বিট্‌ঠলজী দয়া করেছিলেন। নীচতম জাতির এই হীনতম মানুষের অন্তরে তিনি পেতেছিলেন তাঁর সিংহাসন।

শুধু সাধক সন্ত নয়,—সাধিকারাও ছিলেন বৈকি। দুটি বিশিষ্ট নাম,—জনাবাঈ আর কান্‌হোপাত্রা। জনাবাঈ ছিলেন দাসী,—চির-

ব্রহ্মচারিণী। নারী বলে দাসী বলে প্রভুর শরণ থেকে তিনি বঞ্চিত হননি। মহারাষ্ট্রের ভক্তি-সাহিত্যের তিনি শ্রেষ্ঠা কবয়িত্রী। আর কান্‌হোপাত্রা ছিলেন গণিকাকন্যা নটিনী। তাঁর দেহের অর্ঘ্য তিনি সমর্পণ করেছিলেন বিট্‌ঠল ভগবানের পাদপদ্মে।

জ্ঞানেশ্বর-নামদেবকে ঘিরে এই বারকরী-ব্রতনিষ্ঠ বিট্‌ঠলভক্ত সন্তমণ্ডলী বিকশিত হয়েছিল। তাঁরা বিট্‌ঠল সম্প্রদায় নামে খ্যাত হয়েছিলেন।

মহারাজ ঠিকই বলেছেন। বারকরীদের পেছনে পেছনে আমরা যাব, বারকরীদের মাড়ানো পথ আমরা মাড়াব, বারকরীদের সঙ্গে সঙ্গে তাদের অভিলষিত গন্তব্যেও আমরা পৌঁছব,—তবে বারকরী আমরা হব না, হতে পারব না। এ যাত্রা আমাদের একবারের কৌতূহল। সারাজীবনের ব্রত নয়।

কিন্তু সাতারা জেলার সজ্জনগড়ের ছেলে নাথুরামের উদ্দেশ্য অন্য। শুধুমাত্র চেরিলের টানেই সে এখানে এসে জোটেনি। ব্রত-সংকল্প তার মনে। তাই সে প্রশ্ন করল,—কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞাসা করি মহারাজ! মনুষ্য-জীবনে জোয়ার-ভাঁটা তো আছেই,—বারকরী যদি কোনোবার যাত্রা করতে অপারগ হয়, তাহলে কি তার পাপ হবে? শাস্তি হবে?

পাপ? পাপপুণ্যের কথা বলতে পারব না। তবে শাস্তি হবে বৈকি!

শাস্তি হবে? দেবে কে?

সেই তো মুশকিল বাবা,—শাস্তিটা দেবে কে? বারকরী হতেই হবে, এ হুকুম তাকে কেউ দেয়নি। একবার যাত্রা না করলে সংঘ থেকে নাম কাটা যাবে এমনি সংঘই নেই, সংঘের কর্তাও নেই। তার ত্রুটিবিচ্যুতি নিয়ে কার মাথাব্যথা? তবু তাকে শাস্তি দেবার মনিব আছে বৈকি!

কে সে মনিব মহারাজ?

বারকরীর বিচ্যুতির জন্যে কেউ তাকে তাড়না করে না, তাড়না করে তার অন্তর,—কেউ তাকে শাস্তি দেয় না, তার মন ভোগ করে বিট্‌ঠলবিরহ-বেদনার শাস্তি।

আমি ফস্ করে বললাম,—কিন্তু লাভ? কী লাভ এই বারকরী যাত্রায়?

মহারাজ আমার প্রশ্ন শুনে হাসলেন।

চেরিলকে বললেন,—তোমার সখা বাঙালী হলে কী হয়। ব্যবসায়বুদ্ধি বেশ পাকা। কারবারে নামবার আগেই লাভ লোকসান খতিয়ে দেখতে চায়। তাহলে সত্যি কথা বলি বাবা,—লাভ তোমার শূন্য!

সে কী? তীর্থ করব, সুফল পাব না?

এ তো সুফলের তীর্থ নয় ভাই, পাবে কোথা থেকে? তোমাদের গঙ্গাসাগর তীর্থ,—সেখানে লোকে একবার যায়, সাগরের জলে পাপের বোঝা নামিয়ে পুণ্যের ঝুড়ি মাথায় করে ফিরে আসে। এ যে ব্রত,—সারাজীবনের নিত্য নিয়মিত ব্রত,—খালি হাতে যাও, খালি হাতে ফিরে এস!

সাধু কানহাইয়ালাল এ কথায় বড়ো খুশী। সে পথে পথে ঝুলি কাঁধে ফেরে,—তার ঝুলির ভার বাড়েও না কমেও না। সাড়ে তিন বছর ধরে নর্মদা পরিক্রমা করেছে,—প্রবৃত্তি-নিবৃত্তিহীন পরিব্রজ্যার মূল্য সে বোঝে।

উৎফুল্ল গলায় সে বললে,—লাভ নেই, লোকসানভী নেই, পুণ্য নেই, পাপও নেই,—এই তো আসল তীর্থের পথ।

ঠিকই বুঝেছ বাবা তুমি,—কিন্তু ঐ ব্যবসাদার বাবু তীর্থ বলতে অন্য কিছু বোঝেন। সুফল না পেলে তাঁর চলবে না।

চেরিল কোনো কথা বলছে না,—তবে আলোচনা মন দিয়ে শুনছে। জানিনে কোন্ সুফলের আশায় সে এ দলে ভিড়েছে। এবার আমার অপ্রতিভ মুখের দিকে তাকিয়ে শুধু শব্দ করে হাসল সে।

মহারাজ আবার বললেন,—

ক্রিয়া না করলে তো ফল হয় না। তীর্থে পঞ্চক্রিয়া আছে। সেই ক্রিয়া থেকেই সুফল হয়। কী বল তো এইসব তীর্থক্রিয়া? স্নান দান তর্পণ পূজা আর শ্রাদ্ধ,—এইসব কর্ম কে কতোটা করতে পারে তাই নিয়ে তীর্থযাত্রীদের রেশারেশি, কে কতোটা সুফল কুড়োবে তাই নিয়ে কাড়াকাড়ি! পাঁচ সিকের পুজো আর পাঁচশো টাকার পুজো কি এক? এমনি বেহিসেবি কথা বললেই হোলো!

নাথুরাম হাঁটু চাপড়ে সায় দিলে,—ঠিক কথা মহারাজ, বললেই হোলো?

জ্ঞানী লোকেরা বলেছেন কৃষ্ণদর্শনের ফল কৃষ্ণদর্শন,—তার বেশি এক কানাকড়িও নয়। বারকরীরা তীর্থ করতে যায়, শুধু প্রভুর সান্নিধ্য অনুভব করতে যায়। সেই আনন্দ-অনুভূতির জন্যে সে বারে বারে যায়। সেই অনুভূতি আস্বাদন করে সে বারে বারে ফিরে আসে। আবার যায়, আবার আসে,—তাতে তার পাপপুণ্যের ওজন বদলায় না।

আমি কপট ক্ষোভ প্রকাশ করলাম। বললাম,—কিন্তু আমি তো বারকরী নই,—আমি তীর্থযাত্রী। কিছুই জুটবে না আমার? তা হলে কেন যাব?

জুটবে বৈকি, কিছু না কিছু জুটবে।

জুটবে? কী জুটবে মহারাজ?

খুব গম্ভীর নিরাসক্ত গলায় মহারাজ বললেন,—স্নানের পুণ্যটুকু তুমি পাবেই।

তাঁর উত্তরে আর কথা বলার ধরনে হেসে উঠল নাথুরাম।

চন্দ্রভাগায় স্নান?

না, কেবল চন্দ্রভাগায় নয়। আমার দিকে পূর্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে পূর্ণচৈতন্য বললেন,—এই জন্যেই তোমাকে এতো করে আসতে বলেছিলাম। এই বারকরী যাত্রায় চলো আমার সঙ্গে,—যাত্রাশেষে সংগম-স্নানের পুণ্য তুমি পাবে।

সংগম ? সংগম কোথায় ? কোন্ সংগমে ?

পান্ধারপুরে। এই মারাঠা দেশের লোকসাধনার মহাসংগমে।

॥ ১৪ ॥

আলন্দী থেকে বারকরী যাত্রা ঠিক দিনেই শুরু হয়েছে। হবে নাই বা কেন ? শত শত বছর ধরে নির্দিষ্ট ব্যবস্থা,—নট নড়ন-চড়ন, রুটিন বাঁধা। কবে কখন যাত্রা শুরু হবে, পান্ধারপুর কদিনে পৌঁছতে হবে, প্রতিদিন কতোটা করে চলতে হবে, প্রতি সন্ধ্যায় কোথায় আশ্রয় নিতে হবে, সব একেবারে পাকা। কখনো এদিক-ওদিক হয়নি, আজই বা হবে কেন ?

পান্ধারীনাথের সকাশে এই বারকরী যাত্রা কবে আরম্ভ হয়েছিল ইতিহাস তার কোনো সাক্ষ্য দেয় না। জ্ঞানেশ্বর বারকরী দলের সঙ্গে পান্ধারপুরে আসেননি। নিবৃত্তিনাথ তাঁর কানে শুনিয়েছিলেন বিট্‌ঠল মন্ত্র। সেই মন্ত্রের টানে তিনি এসেছিলেন গুরুর হাত ধরে, —ছোট ভাইবোন সোপান আর মুক্তাকে সঙ্গে নিয়ে। বারকরী যাত্রার আরম্ভ তারও আগে।

আলন্দীতে জ্ঞানেশ্বরের সমাধি লাভের পর বাকি তিন ভাইবোন মহারাষ্ট্রের দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়েন ও বিট্‌ঠল নাম প্রচার করেন। নিবৃত্তিনাথ সমাধিস্থ হন নাসিকের পশ্চিমে ত্র্যম্বক তীর্থে, সোপানের সমাধি পুনা জেলায় শাসবদে, মুক্তাবাঈ দেহ রাখেন খান্দেশে মেহুন নামক স্থানে। তাঁদের প্রচার বারকরী যাত্রায় প্রেরণা দেয়।

বারকরীরাই নামদেবকে পথ দেখায়। তিনি পান্ধারপুরে প্রথম আসেন এক বারকরী দলের সঙ্গে। পান্ধারপুরে তিনি জ্ঞানেশ্বরের সঙ্গে মিলিত হন। তার অনেক কাল আগেই পান্ধারীনাথ বারকরীদের টেনেছেন।

যা ছিল ক্ষীণা নির্ঝরিনী, তাকে বিশালা নদীতে রূপান্তরিত করেন নামদেব। নামদেব ছিলেন জ্ঞানেশ্বরের চার বছরের বড়,—পরমায়ু

জ্ঞানেশ্বরের প্রায় চারগুণ। ১২৭০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর আবির্ভাব, ১৩৫০ সালে আশি বছর বয়সে তিরোধান। সুদীর্ঘ জীবন তিনি দিকে দিকে পরিক্রমা করেন। অসংখ্য অভঙ্গ তিনি রচনা করেন, বিট্‌ঠল-চারণ হয়ে দেশে দেশে সেই গান গেয়ে তিনি ফেরেন। তাঁর গানের সুরে বিট্‌ঠল মহিমায় দিগন্ত মুখরিত হয়ে ওঠে।

দূর-দূরান্তের পথে পথে গান গেয়ে গেয়ে তিনি বেড়ান। ওরা তাঁর উত্তরীয় ধরে টান দেয় বলে,—কোথা থেকে তুমি আসছ?

নামদেব বলেন,—আমি আসছি ভূ-বৈকুণ্ঠ থেকে।

ভূ-বৈকুণ্ঠ? সে আবার কী?

জানো না? বৈকুণ্ঠের মত শ্রীবিষ্ণুর আর প্রিয় এক নিবাস মর্ত-ভূমিতেও আছে।

তাই নাকি?

শোনো তাহলে। পণ্ডিতরা বলে, ঈশ্বর নিরাকার নির্গুণ। মানুষই তাঁকে আকারের বন্ধনে বেঁধেছে গুণের বন্ধনে বেঁধেছে,—সগুণের মায়াসাজ পরিয়ে মোহের চোখ দিয়ে তাঁকে দেখতে চেয়েছে। কিন্তু ভগবান নিজে তা বলেননি। তিনি তাঁর সগুণ সাজ সেধে পরেছেন।

ওরা নামদেবের কথা শুনে মাথা নাড়ে। ঠিকই তো, ঠিকই তো!

নামদেব তখন ওদের কানে পুণ্ডলিকের উপাখ্যান শোনান। বলেন,—বলো তো, কেমন অবতার শ্রীবিট্‌ঠল? আপন সাধে যেখানে তিনি অবতীর্ণ হয়েছেন সেই স্থানই তো ভূ-বৈকুণ্ঠ!

কোথায় সে স্থান?

সেখান থেকেই তো আমি আসছি, তার নাম পান্ধারপুর,—ভীমা নদীর দক্ষিণ তীরে।

মানব-মহিমার প্রেমিক দেবতা বিট্‌ঠলের কথা মানুষের দ্বারে দ্বারে নামদেব শুনিয়ে বেড়ান। দূরের মানুষ অচেনা মানুষ তাঁকে জড়িয়ে ধরে, তাঁর অভঙ্গসুধা পান করে তৃপ্ত হয়। বিনিময়ে তাঁকে দেয় ক্ষুধার অন্ন রাতের আশ্রয়।

প্রেমময় বিট্ঠলকে ছেড়ে বেশিদিন নামদেব দূরে দূরে থাকতে পারেন না। বিট্ঠল বিচ্ছেদজ্বালা বেশিদিন তিনি সইতে পারেন না,—বারে বারে পথে বার হন, বারে বারে ফিরে ফিরে আসেন।

বিট্ঠলের নামে ঘোরা, বিট্ঠলের নামে ফেরা। মিলন-বিরহের জোয়ার-ভাঁটা।

ফিরবার সময় নামদেবকে ওরা বলে,—আবার আসবে না? আবার দেখা হবে না তোমার সঙ্গে?

হবে বৈকি! তবে শুধু আমাকে দেখে কী হবে? চলো পান্ধারপুরে, দেখবে পরম প্রভুকে পরম তীর্থে।

কবে যাব?

যেদিন খুশি, যখন খুশি। তবে বছরের দুটি তিথি তাঁর বড়ো প্রিয়—আষাঢ়ের আর কার্তিকের শুক্লা একাদশী।

পাব তো তোমাকেও?

পাবে বৈকি। প্রভুর রশি বড়ো বিচিত্র রশি। রশি যখন থাকে আলগা তখন ঘুরে ঘুরে বেড়াই। আবার রশির টানে তিনিই কাছে টেনে নেন। এ দুটি দিনে তাঁর রশির টান বড়ো কঠিন টান।

বিদায় নেবার মুখে নামদেব আবার বলেন,—যাবে না বোন? যাবে তো ভাই?

যাব যাব, নিশ্চয় যাব। বিট্ঠলতীর্থ দেখতে যাব, তোমাকেও দেখতে যাব।

নামদেবকে পথে বার করেছিলেন জ্ঞানেশ্বর।

নামদেব দস্যু, আর জ্ঞানেশ্বর পণ্ডিত,—পান্ধারীনাথের সকাশে দুজনের মিলন। মুহূর্তে একের শক্তি সম্বন্ধে অপরের উপলব্ধি।

জ্ঞানেশ্বর বললেন,—কাব্য-সুরধুনীর ভগীরথ তুমি ভক্তি-রত্নাকর নামদেব,—আমি তোমাকে প্রণাম করি।

নামদেব বললেন,—পরমপ্রজ্ঞা তুমি জ্ঞানশীর্ষ জ্ঞানদেব,—তোমাকে আমি প্রণাম করি।

দুজনে দুজনকে আলিঙ্গন করলেন। জ্ঞান আর ভক্তির ধারা এক সাগরে বিলীন হোলো।

জ্ঞানেশ্বর বললেন,—ভারতের বিভিন্ন তীর্থে আমি যাব, আমার পান্ধারী প্রভুকে দিকে দিকে দর্শন করে কৃতার্থ হব। তুমি আমার সঙ্গে চলো।

নামদেবের মন মানে না। সে মন দানব মন হয়ে অনেক ঘুরেছে, অনেক ছুটেছে,—আর নয়।

অমৃত স্রোতস্বিনীর সুবর্ণ তীরবর্তী এই পান্ধারপুর, পুণ্ডলিক-প্রিয় প্রেমরমণীয় শ্রীবিট্‌ঠলধাম,—এই পান্ধারী সকাশ ছেড়ে কোথায় আমি যাব? কোন্ নদীতে স্নান করব, কোন্ তীর্থ দর্শন করব, কোন্ দেবতার পূজা দেব? বাঞ্ছাকল্পতরুর ছায়া ছেড়ে কোন্ অরণ্যে কোন্ মরুভূমিতে ভ্রমণ করব, শালগ্রামকে পরিত্যাগ করে কোন্ পথে পথে আমি নুড়ি কুড়িয়ে বেড়াব?

জ্ঞানদেব বললেন,—চন্দ্রভাগার অমৃত লহরী সব স্রোতস্বতীর কোলেই সঞ্চার করতে হবে। সব বৃক্ষেই সঞ্জীবিত করতে হবে কল্পতরুর প্রসাদ। সব পাথরেই আঁকতে হবে তাঁর নাম, সব মানুষের কানেই শোনাতে হবে তোমার গান,—এই তো তোমার ব্রত।

জ্ঞানেশ্বরের হাত ধরে নামদেব নির্গত হলেন পথে। চলার ছন্দে ছন্দে নামদেবের কাব্যধারা উদ্বেলিত হতে লাগল। শ্রীবিট্‌ঠলের নাম, পান্ধারপুরের মাহাত্ম্য আর ভাগবতের মহিমা প্রচার করে বেড়ালেন দুই সন্ত পথিক।

কবির বলেছেন,—

সংস্কৃত হ্যায় কূপজল
ভাষা বহতা নীর।

সেই বদ্ধকূপের ধারে মুষ্টিমেয় উচ্চকোটি মানুষের কড়া পাহারা। খবরদার, এ জলে তোদের অধিকার নেই, এর ধারে-কাছে তোরা আসবিনে। তোরা হীন, তোরা দীন, তোরা মূর্খ,—তোদের ছোঁয়ায় এ জল অপবিত্র হবে, এ জলে তোদের ছায়া পড়াও পাপ। যা, তোরা ঐ নদীতে যা!

নদীর স্রোত আছে, নদী কলকল বয়ে চলেছে, নদীর ঘাটে ঘাটে অসংখ্য লোকের জটলা,—নদীর জলে ছোটবড়ো সকলেই ডুব দেয়। নদীতে নৌকা চলে ভাঁটা থেকে জোয়ারে,—সাধারণ মানুষের ভাষাও তেমনি। এ ভাষা মুখের ভাষা। এ ভাষা বাদবিচার করে না, ব্যাকরণের আগলে বাঁধা পড়ে না। আপামর জনসাধারণের মর্ম এই ভাষার স্রোতে ভেসে চলে,—চলমান থাকে জনসমাজের ঘাটে ঘাটে।

জ্ঞানেশ্বর মুক্তির দিশারী। তিনি প্রথম সংস্কৃত ধর্মগ্রন্থকে লোকভাষায় রূপান্তরিত করলেন। গীতা জ্ঞানেশ্বরীর মাধ্যমে তিনি হিন্দুর ধর্মশিক্ষাকে সাধারণ মানুষের কাছে অবারিত করে দিলেন।

কিন্তু ভাষার আগল ঘুচিয়ে দিলেও জ্ঞানের পথে ক-জন হাঁটতে পারে? ও পথ তো সকলের পথ নয়! সর্বসাধারণের পথ কই? সেই পথ দেখাবার জন্যেই পাশাপাশি পথে বেরিয়েছিলেন জ্ঞানী আর অজ্ঞান, দার্শনিক আর ডাকাত,—জ্ঞানেশ্বর আর নামদেব। এ পথ চওড়া পথ, এ পথ মস্ত পথ,—গণমানুষের পথ। এ পথে ব্রাহ্মণশূদ্র, উচ্চনীচ, ধনীদরিদ্র, পণ্ডিতমূর্খ, পুণ্যাত্মা আর পাপী পাশাপাশি হাঁটে। এ পথ ভক্তির পথ, প্রেমের পথ। ভাগবতী পথ, সহজ পথ।

পিতৃপুরুষের পেশায় দরজি,—নামদেব বেদও জানেন না পুরাণও জানেন না। গীতাও জানেন না ভাগবতও জানেন না। কণ্ঠে তাঁর মায়ের কোলে শেখা ভাষা, প্রাণে তাঁর ভক্তিকাতরতা।

তিনি সংস্কৃত মন্ত্র আবৃত্তি করছেন না, জ্ঞানের গম্ভীর বাণী ছড়াচ্ছেন না,—গান গাইছেন। মাতৃভাষায় নিজেরই রচিত গান, ভক্তির মূর্ছনায় নিজেরই রচিত সুরে।

মন যে আমার মাপকাঠি গো
জিহ্বা আমার কাঁচি,—
আয়ুর কাপড় মনে মেপে
জিভ দিয়ে তাই কাটি।
তাই তো আমার কাঁচির জিভে
সারা জীবন তাঁরই নাম।
তাঁর বাসনার সোনার সুচে,
প্রেম রাঙানো আয়ুর কাপড়
ভক্তি ধবল রূপার সুতায়
নিত্য সেলাই করি,—
এমনি করে কাল কাটে মোর
গেয়ে গেয়ে তাঁরই নাম॥

পথে পথে ভ্রমণ-সাধনা আর সর্বভূতে সর্বজীবে ঈশ্বর দর্শনের শিক্ষা। নামদেবের গুরুলাভের অভিজ্ঞতাও একই রকম। কুম্ভকার গোরা নামদেবের মনোভাণ্ডটি টিপেটুপে দেখলেন,—বললেন,—এঃ, এখনো কাঁচা আছে যে!

কাঁচা ভাণ্ডটি পাকা হবে কেমন করে? আকুল নামদেবের মন। জ্ঞানদেব বিধান দিলেন,—গুরু ধরো,—গুরু না হলে চিত্তভাণ্ড পাকে না। গুরুই পাকাবেন।

কাকে ধরব? কে হবে আমার গুরু? কোথায় পাব তাঁকে?

যাও, দূরের ঐ গ্রামে থাকে বিসোবা খেচর, তাকে গিয়ে ধরো।

বিসোবা ব্রাহ্মণ নন, পণ্ডিত নন,—যোগী মহাযোগী নন। এক পাগল-পাগল গ্রাম্য সাধু। বদমেজাজী উদাসীন মানুষ।

ঐ খেচড়ার দ্বারস্থ হলেন নামদেব। গিয়ে দেখেন আজব কাণ্ড! ইয়া এক শিবলিঙ্গের মাথায় পা তুলে খেচড়া দাঁড়িয়ে আছেন।

সর্বনাশ! এই হবে গুরু? এর কাছে পাঠিয়েছেন জ্ঞানেশ্বর?

না হয় লেখাপড়া শিখিনি, শাস্ত্রটাস্ত্র কিছুই জানিনে। না হয় শুধু ডাকাতিই করেছি এতোদিন। জ্ঞান দিয়ে পারিনি,—মনোভাণ্ডটি ভক্তি দিয়ে আর্তি দিয়ে তো ভরেছি! আমার গুরু হবে এই লোক,—এই ভক্তিশ্রদ্ধাহীন নির্লজ্জ নাস্তিক?

ডাকাতি গলায় গাঁক গাঁক করে উঠলেন নামদেব,—নামাও পা শিবের মাথা থেকে।

বটে? চোখ পাকিয়ে নামদেবের দিকে তাকালেন বিসোবা। পা নামাতে হবে? তাহলে পা কি আকাশে তুলব?

আকাশে কেন? মাটিতে নামিয়ে রাখো।

মাটিতে পা নামালেন বিসোবা। পায়ের নিচেই একটি শিবলিঙ্গ। এক পা হেঁটে আবার পা রাখলেন। সেখানেও একটি শিবলিঙ্গ। অসংখ্য শিবলিঙ্গ মাটি ফুঁড়ে উঠেছে,—যেখানে পা রাখেন সেখানেই। শিবলিঙ্গের মাথায় ছাড়া পা রাখার কোনো জায়গা নেই।

গুরুর পায়ে লুটিয়ে পড়লেন নামদেব।

ঐতিহাসিকেরা বলেন, যজ্ঞের উৎস উত্তর আর ভক্তির উৎস দক্ষিণ। আর্য-বৈদিক সংস্কৃতি উত্তর ভারত থেকে দাক্ষিণাত্যে বিজয় অভিযান করেছিল আর ভক্তির ভাগবতী ধারা কল্লোলিত হয়েছিল দাক্ষিণাত্য থেকে আর্যাবর্তে। পণ্ডিতদের মতে পুণ্ডলিক মারাঠী ছিলেন না। তিনি ছিলেন কানাড়ার অধিবাসী। দক্ষিণ থেকে বিট্‌ঠল ভক্তি মহারাষ্ট্রে এসে পৌঁছয়। মহারাষ্ট্র থেকে বিট্‌ঠল ভক্তির বাণীকে উত্তর ভারতে নিয়ে যান জ্ঞানেশ্বর আর নামদেব। ভীমা-চন্দ্রভাগার তীর থেকে তাপ্তি-নর্মদার তীরে। তারপর গঙ্গা-যমুনার মহান্ ক্ষেত্রে। সেখান থেকে আরো দূরে—পঞ্চনদের উপত্যকায়। শুধু মারাঠীতে নয়, উত্তর ভারতের লোকভাষাতেও নামদেব গান রচনা করেন,—উত্তর ভারতের সাধারণ মানুষ সে গান কণ্ঠে তুলে নেয়।

ভক্তিসাধনার দুই পরম সাধক চলেছেন অচেনা পথে। বিট্‌ঠল

নাম তাঁদের মুখে,—বিলিয়ে চলেছেন বিট্‌ঠল ভক্তিরসামৃত। কখনো গ্রাম, কখনো জনপদ, কখনো রাজধানী। কখনো কৃষকের কুটীর, কখনো শ্রেষ্ঠীর গৃহ, কখনো নৃপতির প্রাসাদ। যেখানে তাঁরা যান, ব্যাকুল জনতা তাঁদের কাছে আসে।

প্রভু, আমাদের পথ দেখাও!

কীসের পথ?

মুক্তির পথ।

পথ কেন? ঘর কি দোষ করল?

তোমরা যে পথে বেরিয়েছ?

জ্ঞানেশ্বর হেসে বলেন,—আমরা ঘরে ফিরে যাব বলেই তো পথে বেরিয়েছি,—প্রভুর ঘরে, একবার তিনি টান দিলেই।

না প্রভু, ওরা বলে,—ঘরই বন্ধন, পথই মুক্তি।

বটে? এমন বুদ্ধি কে দিলো? আমার গুরু শ্রীনিবৃত্তিনাথ যে জ্ঞান আমাকে দিয়েছেন, সেই সহজ জ্ঞানকে উপলব্ধি করো। ঘরে বসে হরিনাম করো। হরিনামই জ্ঞান, হরিনামই ধ্যান, হরিনামই ত্রাণ। নামই তীর্থ, নামই সুখ, নামেই আত্মারাম।

প্রভু, অমৃতসম তোমার বচন। তার অর্থ কিন্তু যেমন সহজ, তেমনি নিগূঢ়। চিত্তবৃত্তি নিরুদ্ধ করে নাম জপ,—এ কী সহজ কথা?

হেসে বলেন নামদেব এবার,—চিত্তবৃত্তি নিরুদ্ধ করবে কেন? উন্মুক্ত করবে।

বলো কী?

ঠিকই বলি। নাম জপ করবে কেন? নামগান করবে। এই যে তুমি দোকানী, ভাঁড়ারে তোমার হাজারো রকমের জিনিস—যা কিনছ বেচছ, দু-বেলা নাড়াচাড়া করছ,—কিন্তু সঞ্চয় করতে চাও কী বলো তো? —শুধু অর্থ। তাই না? এই যে কচি বৌটি—শ্বশুর-শাশুড়ীর সেবা করছে, ননদ-ভাজের কথা শুনছে,—কিন্তু মন পড়ে আছে স্বামীর জন্যে। কখন নিশুতি হবে, সারাদিনের কাজের শেষে কখন স্বামীর ঘরের

খিলটি আঁটবে। এই যে তুমি ছাত্র,—দুর্গাপূজার ঢাক বাজাবে, কালী পুজোয় বাজি পোড়াবে,—কিন্তু অঞ্জলি দেবে মা সরস্বতীর পায়ে, তাই না? সব কাজ করবে, সব সম্পর্ক মানবে,—কিন্তু মনটি নিবিষ্ট করে রাখবে তাঁর পায়ে। তিনিই যে সত্যি, আর সবই যে মায়া। মায়ারাজ্যে থাকবে আর বিচরণ করবে মনোরাজ্যে!

এ কী সম্ভব? আমাদের মতো সংসারীর পক্ষে?

বলো কী গো? পাখির পক্ষে সম্ভব, ফুলের পক্ষে সম্ভব, আর মানুষের পক্ষে সম্ভব না? চাতক থাকে মাটিতে কিন্তু মেঘভাঙা জলটুকু না হলে তার চলে না। চকোর আকাশে ওড়ে, কেন না চাঁদটি তাকে পেতেই হবে। আর ছাখো না, পদ্মফুল জল থেকে মাটি থেকে রস টানে,—কিন্তু যখন ফোটে তখন তাকিয়ে থাকে সূর্যের পানে। ঠিক নয়?

হিমালয় থেকে নদী যেমন নেমে আসে, নিগূঢ় তত্ত্ব তেমনি নামদেবের মুখ থেকে সহজ বাণী হয়ে ঝরে পড়ে।

নামদেব যোগী নন, তিনি ভক্ত। সংসারীর আশা-নিরাশা থাকে, সুখদুঃখ থাকে, তৃপ্তি-অতৃপ্তি থাকে। কিন্তু ভক্তির অমৃতস্পর্শে নামদেবের মনে কোনো নিরাশা নেই, দ্বন্দ্ব নেই, অতৃপ্তি নেই। প্রেমিকের বুকে তিনি যেন প্রেমিকা, মায়ের কোলে শিশু।

আমি রান্না করি বাসন মাজি ঘর ঝাঁট দিই,—জানি তুমি বুকে তুলে নেবে। আমি হাসি কাঁদি, খেলা করি, মাটিতে লুটিয়ে ধুলো মাখি,—জানি তুমি কোলে তুলে নেবে। তোমার প্রেমে তোমার স্নেহে আমার রোদন-হাসি দুঃখসুখ এক হয়ে গিয়েছে।

পরিব্রজ্যা শেষ করে পরিণত বয়সে বিট্‌ঠল-চরণে আশ্রয় নিলেন নামদেব। প্রভুর পায়ে গানই তাঁর নিত্য অর্ঘ্য। নিত্য নতুন গান রচনা করে প্রভুর সামনে নেচে নেচে গান করাই তাঁর পূজারতি।

আর কথা নয়, উপদেশ নয়। আত্মনিবেদনের সহজ সঙ্গীতবাণী :

প্রভু, ভক্ত নিয়ে এ কী তোমার খেলা!

একদিন নেই একটি কাণাকড়ি,
পরদিন দাও ধূলির মধ্যে
নবীন সোনার ধান,—
এমনি তোমার ভালোবাসা
এমনি তোমার লীলা।
পক্ষীরাজের পিঠে একদিন চড়াও,
পরদিন দাও ধূসর পায়ে
পথে হাঁটার ক্লান্তি,—
এমনি তোমার দানের বাহার
এমনি তোমার লীলা।
রাজ শয়নে এক রাত সে শোয়,—
পরের রাতে রুক্ষ মাটির
কঠিন শীতল শয্যা,—
এমনি তোমার প্রেম-মাধুরী
এমনি তোমার লীলা।
দুঃখ সুখের রথের চাকায় বেঁধে
জন্ম থেকে জন্মান্তরে
পার করে দাও প্রভু,—
নামদেব তো ঠিক বুঝেছে
অবুঝ তোমার লীলা॥

॥ ১৫ ॥

ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠতে আমার দেরি হয়েছিল। খোলা দরজার পাশে শুয়েছিলাম। শেষ রাতে হিম লেগেছিল প্রচুর, চাদর ঢাকা সারা গা জড়িয়ে ধরেছিল কুয়াশার কুড়েমি। তবু সূর্য ওঠার অনেক আগেই উঠেছিলাম।

ঘুম ভাঙাল নাথুরাম। মহারাজের তাঁবুতে সে রাত কাটায়নি,—আমার পাশে আশ্রয় নিয়েছিল প্রবাসীগৃহে। অনেক রাত পর্যন্ত বকর-বকর করেছিল পাশে শুয়ে। তারপর প্রত্যুষে ধাক্কাধাক্কি করে আমাকে জাগিয়ে দিয়ে সরে পড়তে দেরি করেনি।

আমি যখন তৈরি হয়ে পথে বার হলাম তখন ধর্মশালায় ঘুমন্ত আর কেউ নেই। তখন মন্দিরের চূড়ায় সূর্যের ছোঁয়া লেগেছে, নদীর বুকে কুয়াশার সর গলতে শুরু করেছে। পথঘাট ছায়া-ছায়া।

মন্দিরের পেছনে নদীর ঘাট। সেই ঘাট বেয়ে এগিয়ে নাথুরাম নিশ্চয়ই এতোক্ষণে মহারাজের তাঁবুতে পৌঁছেছে। সেখানে চেরিল আছে, কানহাইয়ালাল আছে,—আছে আরো দলবল। তাঁবু গুটিয়ে সবাই পথে বার হবে। আমি আর সেদিকে পা বাড়ালাম না। পায়ে পায়ে মন্দিরের দিকে এগোলাম।

মন্দিরের সামনে চওড়া রাস্তায় শোভাযাত্রার ব্যবস্থা হচ্ছে। প্রস্তুতি গভীর রাতে শুরু হয়েছিল,—এখন প্রায় সম্পূর্ণ,—একটু পরেই যাত্রা শুরু হবে। শোভাযাত্রার মাঝখানে জ্ঞানেশ্বরজীর পালকি।

মস্ত একটি শকট। তার ওপর সুন্দর একটি চতুর্দোলা বসানো হয়েছে। চতুর্দোলার মাথায় সোনালি রঙের রেশমী চাঁদোয়া। গোল ডাণ্ডাগুলি রূপো দিয়ে মোড়া। চাঁদোয়া ঘিরে লাল সবুজ ঝালর,—চাঁদোয়ার মাঝখানে নানা রঙের ফুললতা সাজানো চক্র,—সূচীশিল্পের আশ্চর্য নমুনা। চাঁদোয়ার চারধার জুড়ে সোনালি-রূপালি জরির মালা। তার মাঝে মাঝে মালা আসল ফুলের,—গন্ধ ভরা আর নরম, হলুদ আর লাল।

পালকির পাটাতন জুড়ে টকটকে কার্পেট। সেই কার্পেটের ওপর সোনালি ফ্রেমে বাঁধানো জ্ঞানেশ্বরজীর রঙিন প্রতিকৃতি। সামনে জ্ঞানেশ্বরজীর রৌপ্যনির্মিত পাদুকা। গন্ধপুষ্পে ঢাকা,—ধূপপাত্র থেকে নির্গত সুরভিত ধূম।

যাত্রার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে বারকরীরা। পদাতিক যাত্রীর প্রস্তুতি আর এমন কী! ঝুলিটিকে কাঁধে নিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেই হোলো। যতো ভিড়ই বাড়ুক, পথও তো দীর্ঘ। অতএব হুড়োহুড়ি নেই, জায়গা নিয়ে কাড়াকাড়ি নেই, পাশাপাশি সামনে পেছনে যে যেখানে দাঁড়িয়ে যাও।

বারকরীদের পোশাক-আশাক একেবারে শাদামাটা,—কোনো চটক নেই, বৈচিত্র্য নেই, রঙের বাহার নেই। শাদা পিরান আর শাদা খাটো ধুতি। মেয়েদের পরনে শাদা শাড়ি, বড়ো জোর গায়ে জড়ানো একটা শাদা চাদর। পায়ে ক্যাম্বিসের জুতো কিংবা চপ্পল। অনেকেই নগ্নপদ। অনেকের হাতে হালকা একটা লাঠি। কাঁধে একটি ঝোলা। লাঠির একটা মুখ ঝোলার মধ্যে,—অন্য মুখের মাথায় হলুদ বা শাদা নিশান। কাঁধের লাঠিতে হাত না লাগালেও চলে,—তাই তুই হাতে তুই মন্দিরা। কারো গলা থেকে ঝুলছে শালু-মোড়া মৃদঙ্গ।

সাধু-শোভাযাত্রা নয়। পূর্ণচৈতন্যজীর মতো মুক্তকচ্ছ গেরুয়াধারীর সংখ্যা খুবই কম। বারকরীদের মাথায় জটা নেই, গায়ে ভস্মবিভূতি নেই, পরনে বাঘছাল হাতে চিমটে নেই, মুখে বোম-বোম নেই। গঞ্জিকা সেবন কারণ পান বারকরীদের জন্যে নয়। বারকরীদের সঙ্গে একটি মাত্র ভাগবতী প্রতীক,—গলায় তুলসীর মালা। কারো কপালে শ্বেতচন্দনের বৈষ্ণবতিলক।

বারকরীরা দলে দলে ভাগ করা। চেনা লোক দল বাঁধে, অচেনা কোনো একটা দলে জুটে যায়। দূরদূরান্তের গ্রাম থেকে যাত্রায় যোগ দেবার জন্যে বারকরীরা এসেছে। একই গ্রামের লোক মিলে একটা দল গড়েছে। শহরের দোকানী-ব্যাপারীরা বেঁধেছে নিজেদের দল। কোনো দল চাষী গৃহস্থের। আবার কাজ পালানো উকিল-মাস্টার-কর্মচারীরা একদলে এসে জুটেছে। এক একটি দলের নাম দিণ্ডী। এককালে দল হোতো জাত নিয়ে,—উঁচু জাতের দল, নিচু জাতের দল। তেমনি দল-ভাগাভাগি ঘুচে যাচ্ছে। তেমনি ঘুচে যাচ্ছে

ধনী-দরিদ্রের ভাগাভাগি। কারো আছে জুড়ি গাড়ি, কারো চরণই ভরসা। তাতে কী? বারকরীর পথে যে চলে চরণ সম্বল করেই তাকে চলতে হয়। আলন্দী থেকে পান্ধারপুর—রাজাই হও আর ফকিরই হও,—এ পথ পায়ে পায়েই ক্ষইয়ে দিতে হবে।

আবার এক-এক দল গড়েছেন তীর্থ-রাখালরা। তীর্থ-রাখালের দলে বারকরী নেই, আছে তীর্থযাত্রীরা। বার বার যাত্রার সংকল্প তাদের নয়,—তারা একবারেরই যাত্রী। যেমন কেদারবদরীর যাত্রী, গঙ্গাসাগর যাত্রী। তীর্থ-রাখালদের দলে বেশির ভাগই গ্রামবাসী, অধিকাংশই স্ত্রীলোক। গ্রামীণ যাত্রীদলকে কুড়িয়ে কুড়িয়ে দল করে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়ান তাঁরা,—দেখান শোনান, তীর্থক্রিয়াদি করান। নীতি-দুর্নীতির ওপর নজর রাখেন, পয়সাকড়ির ব্যাপারে ম্যানেজারি করেন। তীর্থশেষে আবার যাত্রীদের পৌঁছে দেন যার যার আস্তানায়।

বড়ো রাস্তা পেরিয়ে নদীতীরে আর যাওয়া হোলো না। সব উৎসব সব আয়োজন যে চোখের সামনেই। অঙ্গন ছেড়ে প্রান্তরে কে যাবে? এখানেই আমার বন্ধুদের পাব, দল পাব। শোভাযাত্রার শুরু থেকে শেষের মধ্যে কোথাও না কোথাও। কোনো না কোনো দিণ্ডীতে। ঠিক সাড়ে ছটা। শিঙা বেজে সচকিত করেছে ভোরের আকাশ,—যাত্রা শুরু হতে বেশি দেরি নেই।

শোভাযাত্রার প্রথমে দুই ঘোড়া,—লাল আর শাদা। সওয়ারদেরও অনুরূপ পোশাক। হাতে ঝকঝকে রূপোলি দণ্ড,—দণ্ডের মাথায় মস্ত পতাকা। সওয়ার পিঠে নিয়ে ঘোড়া দুটি নাচতে নাচতে এসে দাঁড়াল। তাদের পিছনে শুভ্র বসন শুভ্র কেশ এক প্রৌঢ় বারকরী এসে দাঁড়ালেন। তাঁর হাতে বীণা। তাঁর দুপাশে দুজন করে তরুণ বারকরী। দুজনের গলা থেকে ঝুলছে মৃদঙ্গ, দুজনের হাতে মন্দিরা।

পাশাপাশি দাঁড়ালেন পাঁচজন। পিছনে জন কুড়ি-পঁচিশ লোকের

একটি দল। বারকরী যাত্রার প্রথম দিণ্ডী বা দল। সামনের বীণা-বাদক দিণ্ডীর নেতা। এই মুখ্য দিণ্ডীর ঠিক পিছনে জ্ঞানেশ্বরজীর পালকি। পাদুকা-শকটের পিছনে দিণ্ডীর পর দিণ্ডী।

বারকরী শোভাযাত্রায় দিণ্ডীর বিন্যাসই প্রধান ব্যবস্থা। কঠোর নিয়মানুবর্তিতার সঙ্গে এই ব্যবস্থা করেন মূল পরিচালক সমিতি। কোন্ দিণ্ডীর পর কোন্ দিণ্ডীর স্থান প্রথমেই তা তাঁরা নির্দিষ্ট করে দেন। সারা যাত্রাপথে কোথাও এই নির্দেশের ভাঙাভাঙি নেই। আবার দিণ্ডীর যিনি কর্তা, তাঁর ওপর দিণ্ডীর পরিচালন ভার। তাঁর নির্দেশে বিশিষ্ট দায়িত্ব পালন করেন দিণ্ডীর সদস্যরা। কারুর ওপর ভার আহার্যের ব্যবস্থার, কারুর ওপর ভার দিনশেষের আশ্রয়ের। কোনো কোনো সভ্য আছেন দুর্ঘটনাগ্রস্ত বা অসুস্থের পরিচর্যার জন্যে। জিনিসপত্রের পরিবহন ও তদারকির দায়িত্ব কোনো সদস্যের ওপর নির্দিষ্ট।

সারাদিনের অভঙ্গ-কীর্তনে প্রতিটি দিণ্ডী পালা করে যোগ দেয়। সান্ধ্য আশ্রয়েও গভীর রাত পর্যন্ত কীর্তন নামগান ও সদালোচনা হয়। কোন্ দিনের সান্ধ্য উৎসব কোন্ দিণ্ডী পরিচালনা করবে, তারও রুটিন বাঁধা থাকে। সান্ধ্যসভার প্রধান ভাষ্যকারকে সম্বর্ধনা করাও নির্দিষ্ট দিণ্ডীর সদস্যদের দায়িত্ব। তাছাড়া বারকরী নন এমন যাত্রীরাও বিশেষ বিশেষ দিণ্ডীতে আমন্ত্রিত হন। রবাহূত বা আমন্ত্রিত সাধারণ বা সম্মানী অতিথি যাত্রীদের সঙ্গ সেবা ও আশ্রয়দান নির্দিষ্ট দিণ্ডীর কর্তব্য।

দিণ্ডীতে দিণ্ডীতে আর প্রতি সদস্যের মধ্যে যেন সৌজন্য ও সম্প্রীতি বজায় থাকে, কলহ বা বিশৃংখলার আভাসটুকু পর্যন্ত দীর্ঘ যাত্রায় কোনো দিন কখনো যেন না ফুটে ওঠে, আনন্দময় শান্ত শৃঙ্খলায় যেন প্রতিটি পদক্ষেপ সুমার্জিত হয়,—সেদিকে দিণ্ডীর নেতা আর যাত্রার পরিচালকদের সজাগ দৃষ্টি। কবে কখন কোন্ দিণ্ডী গান গাইবে,—এমনকি সঙ্গীত-মালিকাগুলি পর্যন্ত আগে থেকে

সন্নিবিষ্ট করা থাকে। যাতে সঙ্গীতমুখর যাত্রা কখনো যেন নিস্তব্ধতায় নিষ্প্রাণ বা কোলাহলে অপবিত্র না হয়।

বারকরী নয়,—এমন মানুষের সংখ্যাও এই শোভাযাত্রায় কম নয়। নানা উদ্দেশ্যের নানান রকমের মানুষ। অবশ্য অসৎ উদ্দেশ্যের কেউ নয়। কেউ আমারই মতো, বারবার নয়, অন্তত একটিবার বারকরীদের সঙ্গে পান্ধারপুর যাবে, অন্তত একটিবারের আনন্দ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করবে। আবার অনেকে পান্ধারপুর পর্যন্ত যাবেই না। পুণার সাবিত্রী মন্দিরে পূজা দেওয়া, শাসবদে সোপানদেবের সমাধি দর্শন করা বা জেজুরি পেঁৗছে খাণ্ডোবা তীর্থে যাত্রা সম্পূর্ণ করা তাদের মানসিক।

আবার কেউ বা স্বেচ্ছাসেবী, কেউ বা সরকারী বা নগরপালিকার কর্মচারী,—এক জনপদ থেকে পরবর্তী জনপদ পর্যন্ত বারকরী যাত্রাকে পৌঁছে দেওয়ায় তাদের ডিউটি সীমাবদ্ধ।

সারিবদ্ধ পদাতিক যাত্রীর পেছনে শকটের সার। অনেক গো-শকট। তারা যাত্রীদের জিনিসপত্র বহন করছে। বারকরী যাত্রীদের দ্রব্যের বাহুল্য নেই। অনাড়ম্বর পদচারী তারা। প্রধান জিনিস বলতে রাতের শয্যা,—চাদর শতরঞ্চি, খুব বেশি তো একটা বালিশ। কিছু বাসন-কোসন। ক-টা বাড়তি জামাকাপড়ের পুটুলি। এক একটি দিণ্ডীর সদস্যদের মালপত্রের জন্যে ক-টা করে গরুর গাড়ি।

আর আছে লরী। এ ব্যবস্থা পরিচালক সমিতির। লরীতে ভারি জিনিস,—যেমন রাত্রিবাসের তাঁবু, গ্যাসের আলো, পানীয় জল, জ্বালানি, প্রাথমিক চিকিৎসার সরঞ্জাম। স্থানীয় কর্তৃপক্ষ আর প্রভাবশালী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় এই ব্যবস্থা হয়েছে। লরীর সার এখন পেছনে থাকলেও পরে সামনে এগিয়ে যাবে। পদাতিকদের অনেক আগে নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছে অপেক্ষা করবে।

কর্মব্যস্ত দিনের শুরু। কিন্তু সারা আলন্দীতে আজ কোনো কাজ নেই। রাস্তাঘাট দোকান-বাজার ফাঁকা, নদীতীর ফাঁকা, মন্দির পর্যন্ত পূজার্থীহীন। সব মানুষ মন্দিরের সামনের রাস্তায়। বারকরী

যাত্রীদের লাইনের দু-পাশে। নারী পুরুষ, যুবাবৃদ্ধ,—সবাই ছুটে এসেছে। সন্ত-পাদুকা আর বারকরী যাত্রা দেখবার জন্যে। উপচে পড়া ভিড় নিয়ন্ত্রণ করতে স্বেচ্ছাসেবীরা হিমসিম খাচ্ছে।

আলন্দী তীর্থে সারা বছরই যাত্রীর আনাগোনা। সব বছরেই দু-বার করে বারকরী যাত্রার সময় সারা জনপদে মেলা লেগে যায়। বারকরী যাত্রার পর মেলা ভাঙবে। নদীতীরের আর রাস্তার ধারের অস্থায়ী দোকানগুলি উঠে যাবে, ফাঁকা হয়ে যাবে যাত্রীনিবাস। নাটমন্দিরে ঠাসাঠাসি আর থাকবে না, থাকবে না পুরোহিতের ব্যস্ততা। পুণা আর দেহুর মোটর বাসগুলি যাত্রীর ভারে কুঁজো হয়ে হাঁসফাঁস করে আর ছুটবে না। ইন্দ্রায়ণী তীরের এই জনপদের জীবন আবার শান্ত-মন্থর হয়ে যাবে।

কালই বদলে যাবে চেহারা, আজকের চেহারা আলাদা। আজ সন্ত-পাদুকা দর্শন, সন্তযাত্রা দর্শন। এ দর্শনে মহাপুণ্য।

বারকরী যাত্রায় পাপক্ষালন হয় না, পুণ্যলাভও হয় না। অন্তত পাপমোচনের আশায় বা পুণ্যসঞ্চয়ের আকর্ষণে কোনো বারকরী সারা জীবনের জন্যে এই যাত্রাব্রত গ্রহণ করে না। তবু আজো হাজার হাজার লোক এই ব্রত পালন করে চলেছে।

ব্রত গ্রহণে যেমন পুণ্য নেই, ব্রত থেকে নিষ্ক্রান্তিতেও তেমনি পাপ নেই। সেই জন্যে এই যাত্রায় নতুন মানুষের সদাই আমদানি, আবার পুরোনো মানুষের অন্তর্ধান। পাঁচবার বা সাতবার যাত্রা করে অনেকেই বিরত হয়, আবার নতুন যাত্রীরা এসে যাত্রাকে পুষ্ট করে। তারাও কয়েক বছর ধরে এই সংস্কার পালন করে হারিয়ে যায়, তাদের ফাঁককে পূরণ করে নতুন যাত্রীদল।

যে পথ বেয়ে সন্তরা গিয়েছিলেন সেই পথ বেয়েই যাত্রীরা যায়। যে ধূলিতে সন্তের পদরজ মিশে আছে সেই ধূলি তারা অঙ্গে মাখে। যে গান সন্তরা গেয়েছিলেন সেই গান তারা গায়। যে সুরের মাধুরী

যে ছন্দের দোলা সন্তযাত্রার আকাশে ছড়িয়ে ছিল, সেই সুর সেই ছন্দকে তারাও আকাশে ছড়িয়ে দেয়। সন্তদের অনুসরণ করত ভক্ত-মণ্ডলী। এখন অনুসরণ করে সন্ত পাদুকাকে। সন্ত পাদুকাকে অনুসরণ করে সন্তের গান গেয়ে গেয়ে তারা প্রাণের মধ্যে সন্ত-সান্নিধ্যকে অনুভব করে।

সন্তদের প্রাণের ঠাকুর শ্রীবিষ্ণুবিট্‌ঠল। তিনি ভীমা নদীর তীরে পান্ধারপুরে আসীন। সেই ঠাকুরের ডাক সন্তরা কানে শুনেছিলেন,—পুষ্পগন্ধের আহ্বানে দূরদূরান্তের মৌমাছি যেমন ফুল্লকাননে ছুটে যায় তেমনি তাঁরা গিয়েছিলেন বিট্‌ঠল সন্নিধানে। আজো সেই ডাক, সেই সুরভি, সেই আকর্ষণ। আজো যাত্রীরা তেমনি ছোটে বিট্‌ঠল সন্নিধানে।

পূর্ণ চৈতন্যজী যাই বলুন,—বারকরী যাত্রায় পুণ্য আছে বৈকি। কয়েকবারই যাই, আর প্রতিবারই যাই,—দীর্ঘ পথ পায়ে পায়ে হাঁটব, পরিক্রমার নিয়মকানুন পালন করব, কৃচ্ছ্র সাধন মেনে নেব, আর যাত্রার অবসানে পান্ধারপুরে পোঁছে বিট্‌ঠল বিগ্রহ দর্শন করব,—এতে পুণ্য হবে না? তীর্থযাত্রাই বলো, দর্শনই বলো, পূজা-আরাধনাই বলো,—পুণ্যকামনা ছাড়া কী? কিন্তু পুণ্যের ফল তো পুণ্য নয়? সংসারী মানুষের পুণ্যলাভের জন্যে এত আকূতি কেন? মোক্ষের জন্যে নয়,—স্বর্গের জন্যে। মরজীবনের অবসানে স্বর্গলাভের জন্যে। মোক্ষে বাসনা-কামনার বিলয়, গৃহী মোক্ষ চায় না। স্বর্গে বাসনা-কামনার পরিপূর্ণতা,—তাই গৃহীর কাম্য স্বর্গ।

পুণ্যের পাথেয় দিয়ে স্বর্গলাভের কামনা মহারাষ্ট্রের সন্তরা করেননি। বারকরী সাহিত্যে মোক্ষের আকিঞ্চন নেই, স্বর্গেরও আকূতি নেই। এই সংসার অনিত্য, ইহজীবন মায়া মাত্র, জীবনের পরপারই জীবাত্মার লক্ষ্য,—এমনি দার্শনিক তত্ত্বকথা বারকরী কবিরা বলেননি। বারকরীর কাব্যে মৃত্যুর উল্লেখ প্রচুর আছে,—মৃত্যু যে জৈব বাসনার অর্গল মোচন সে ঘোষণা আছে। কিন্তু স্বর্গলোভে ইহজীবনে পুণ্য

সঞ্চয়ের প্রলোভন কোথাও নেই। পুণ্য শুধু বিট্‌ঠল সান্নিধ্যের। তাঁকে পেতে হবে। একান্ত আপনার ঘরের মানুষ করে তাঁকে পেতে হবে। তিনি এপারেও আছেন ওপারেও আছেন। ওপারে তিনি বৈকুণ্ঠরাজ। এপারে ভক্ত হৃদয়ের ভূবৈকুণ্ঠে তিনি রাজাধিরাজ। ওপারে তিনি কোলে নেবেন,—এপারেও নেবেন। সারাদিন খেলা করি, ধূলোকাদা মাখি, দিনের শেষে তাঁর কোলে আশ্রয় নিই। তিনি পুণ্যময়, তাঁকে পাওয়াই পুণ্য।

বারকরীদের কথা থাক, অগণিত অন্য যাত্রীদের কথাও না ভাবলে চলবে,—যাত্রাপথে দাঁড়িয়ে আমার নিজের কথাই একটু ভাবি।

এ লাইনে আমি দাঁড়িয়েছি কেন? এই অজানা জনসমুদ্রের ভিড়ে আমি এসে জুটেছি কেন? আমি পূর্ব ভারতের লোক,—আমার ভাষা আলাদা, আচার-ব্যবহার আলাদা। এ দলে আমার কোনো বন্ধু নেই। নিজের ভাষায় কথা বলবার একটি লোক নেই। কেউ নেই যে আমার মাতৃভাষা বুঝবে, আমার সঙ্গে মাতৃভাষায় কথা বলবে। মারাঠী ভাষায় জ্ঞান আমার যৎসামান্য,—যা মোটামুটি জানি তা হোলো সর্ব-ভারতীয় লোক ভাষা। টুটিফুটি হিন্দী ভাষা। সেই সম্বল করেই পথে বেরিয়েছি। ভিড়ের সঙ্গে সামিল হয়েছি।

কোন্ পুণ্যের লোভে?

আলন্দী থেকে পান্ধারপুর। যাত্রাপথের একটা মানচিত্র কিনে নিয়েছি আলন্দী বাজার থেকে। সরকারী মানচিত্র নয়। কোনো পাকা কারিগরের নিপুণ হাতের কাজ নয়। স্কেলের হিসেব নেই। মাপের ঠিক নেই, রেখার সমতা নেই। ভুসো কালি, ঝাপসা অক্ষর। সরু মোটা রেখার পাশে পাশে কয়েকটি জায়গার নাম। পুণা, শাসবদ, জেজুরি, ভালহা, লোনান্দ, তারদগাঁও, ফলটন, বারদ, মালসিরাস, ভেলাপুর, শেগাঁও, ওয়াখ্‌রি,—পান্ধারপুর।

আলন্দী থেকে যাত্রাপথ দক্ষিণ দিকে। ইন্দ্রায়ণীর তীর থেকে

যাত্রা শুরু করে পথে মুলা আর নীরা দুটি নদীকেই অতিক্রম। মুলার দেখা পুণায়, নীরাকে অতিক্রম লোনান্দে। নীরা পর্যন্ত পথ পশ্চিম-ঘাট পর্বতমালার ফাঁকে ফাঁকে। পুণা আর শাসবদের মাঝখানে চড়াই-উৎরাই পর্বত ঘাট। তারপর মালভূমি থেকে সমতল নিম্নভূমির দিকে। নীরা পার হয়ে আর দক্ষিণে নয়। নদীর দক্ষিণ তীর ধরে সোজা দক্ষিণ-পশ্চিমে।

এই যাত্রায় পান্ধারপুর ছাড়া আর তিনটি প্রসিদ্ধ স্থান আমরা পাব। প্রথমে পুণা,—মহারাষ্ট্রের সাংস্কৃতিক রাজধানী। তারপর শাসবদ,—সেখানে জ্ঞানেশ্বরের কনিষ্ঠ ভ্রাতা সোপানদেবের সমাধি। শাসবদের পরে জেজুরি,—মহারাষ্ট্রের প্রসিদ্ধ তীর্থ,—খাণ্ডোবা মন্দিরের জন্যে বিখ্যাত।

পুণা-হুবলি দক্ষিণগামী রেলপথের গায়ে গায়ে আমাদের যাত্রা-পথের ক-টি জায়গা পড়বে। শাসবদ রোড স্টেশন থেকে কিছু দূরে শাসবদ জনপদ। খাণ্ডোবাতীর্থ জেজুরী রেল লাইনের ওপরেই। ভালহা-লোনান্দও রেল লাইনের ধারে। লোনান্দ থেকে রেলের সঙ্গে সম্পর্ক শেষ। রেলের দেখা একেবারে পান্ধারপুর পৌঁছে। পুণা-শোলাপুর লাইনে একটি জংশন স্টেশন কুরদুবাড়ি। কুরদুবাড়ি থেকে শাখা রেলপথে পান্ধারপুর রেল স্টেশন।

পুণা থেকে দুটি রাজবর্ত্ম,—একটি দক্ষিণে, একটি দক্ষিণ-পুবে। এই দুটি সড়ক মহারাষ্ট্রের সঙ্গে দক্ষিণ ভারতের সংযোগ ঘটিয়েছে। প্রথম সড়কটি বোম্বাই থেকে শুরু। পুণা সাতারা কোলহাপুর ছাড়িয়ে ঢুকেছে মহীশূর রাজ্যে। দ্বিতীয় সড়কটির পুণা থেকে আরম্ভ,—শোলাপুর পেরিয়ে অন্ধ্রের সঙ্গে সংযোগ।

বারকরী যাত্রীরা এই দুটি রাজবর্ত্মের কোনোটিতেই পদচারণ করবে না। তাদের পথ রাজপথ নয়, সাধারণ মানুষের পথ। সে পথের ধারে বিশাল শহর নেই। সে পথে দ্রুত ধাবমান যন্ত্রযান নেই। বারকরী পথ অরণ্যের মধ্যে দিয়ে, শস্যক্ষেত্রের পাশ দিয়ে, নদী-উপত্যকার ধার দিয়ে,—স্নিগ্ধ শান্ত গ্রামাঞ্চলের ওপর দিয়ে।

রেলযাত্রীদের জন্যে রেলওয়ে ম্যাপ, রোড ম্যাপ মোটর-বিহারীদের জন্যে। কিন্তু পদযাত্রী যে পথে চলে,—সে পথের মানচিত্র কই? কেদারবদরীর পায়ে-হাঁটা পথের মানচিত্রের সরকারী সংস্করণ কী কখনো ছাপা হয়েছিল? রেল যখন ছিল না, রাজবর্ত্ম যখন ছিল না,—চৈতন্যদেবের পদচিহ্ন অনুসরণ করে গৌড়ীয় বৈষ্ণবরা যখন নবদ্বীপ থেকে নীলাচল যাত্রা করত পদব্রজে, তখনকার সেই গৌরদাণ্ডের কি কোনো মানচিত্র ছিল?

দরকার ছিল না মানচিত্রের। তীর্থযাত্রী মানুষ পায়ে পায়ে যে পথ বানিয়েছিল, সেই পথের নিশানা ছিল মানুষের মনে,—এক প্রজন্ম থেকে আর এক প্রজন্মে। তেমনি বারকরী যাত্রারও কোনো পাকা মানচিত্র নেই। না থাকলেও অসুবিধা নেই। গত সাতশো বছর ধরে এই পথ মানুষের স্মৃতিপথে আঁকা আছে। বংশানুক্রমে এ পথ বারকরীর মর্মে, বারকরীর রক্তে। তবু স্থানীয় ছাপাখানায় ছাপা স্থানীয় বাজারে কেনা কাঁচা মানচিত্রটি আমার মতো আগন্তুক যাত্রীর কাজে লাগবে।

ক-মাইল হাঁটব এই বারকরী শোভাযাত্রার পিছনে পিছনে? অন্তত দেড়শো মাইল তো বটেই। কতোদিন ধরে হাঁটব,—ক-দিনে পৌঁছব শেষ লক্ষ্যে? শেষ যাত্রায় জ্ঞানেশ্বর পান্ধারপুর থেকে আলন্দী পৌঁছেছিলেন এগারো-বারো দিনে। পূর্ণিমা থেকে কৃষ্ণা একাদশী পর্যন্ত। দিনে চোদ্দ মাইল হাঁটা এমন কিছুই না,—বিশেষ করে সমতল রাস্তায় দলে বলে। তবে বারকরী যাত্রার সময় আজকাল দীর্ঘতর হয়েছে। কবে যাত্রা আরম্ভ আর কবে শেষ,—পথে কখন এবং কোথায় বিশ্রাম পরিচালক সমিতি আগে থেকে তা নির্দিষ্ট করে দেন। নির্দিষ্ট ক-টি স্থানে দু-একদিনের বিরতিও হয় পথ চলার। সেসব স্থানের মাহাত্ম্য বারকরী দলকে এক বা একাধিক দিন আটকে রাখে। আবার চলা শুরু হয়। ঘড়ির কাঁটার মতো রুটিন। আমাদের যাত্রারম্ভের দিন কুড়ি পরে নির্দিষ্ট শুভদিনেই আমরা পান্ধারপুর পৌঁছব।

এই কুড়িটি দিন আমি কাটাব কী করে? কী খাব? কোথায় শোব? কার সঙ্গে কী কথা বলব? কে রাখবে আমার সুবিধা-অসুবিধার ওপর নজর? যদি অসুখে বা দুর্ঘটনায় পড়ি,—কে আমাকে দেখবে?

এসব কথা এখন না ভাবলেও চলবে।

ঐ তো সন্ত পাদুকায় মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করছে যাত্রীরা। যাই, আমিও ছুটে গিয়ে মাথা ঠেকাই! ঐ তো বারকরীরা নিজের নিজের দিণ্ডীতে জমায়েত হচ্ছে। যাই, আমিও খুঁজে নিই আমার সঙ্গীদের।

॥ ১৬ ॥

একজন টুকটুকে ফরসা আর একজন কুটকুটে কালো।

তাহলে কী হয়, পোশাকের রঙে আমরা কাছাকাছি। চেরিলের কুর্তা-পাজামা সোনালি-হলুদ আর আমার পাঞ্জাবি-পাজামা গেরুয়া। চেরিলের পোশাকের রঙের রহস্য জানিনে। আমি আমার জামা-কাপড় গেরিমাটিতে ছুপিয়ে নিয়েছি প্রত্যক্ষ প্রয়োজনে। গেরুয়া পোশাক পথযাত্রীর সুবিধেজনক ইউনিফর্ম,—ময়লা ধরে কম। ধরলেও রঙের আড়ালে চাপা থাকে।

এই কাছাকাছি রঙের টানেই চেরিল নাকি কাছাকাছি এসেছে আমার। আবার রংছুট হয়ে যাবার মন হয়েছে তার। শখ হয়েছে, বারকরী সাজবে। তার পোশাকটি নাকি একেবারে বেমানান,—কটকট করে চোখে ফোটে, মনের মধ্যেও পিন ফোটায়। তাই মসৃণ সোনালি রঙের কুর্তা-পাজামা ছেড়ে সে পড়বে কর্কশ শাদা কাপড়ের জামা আর শাড়ি। সেই সঙ্গে গলায় পরবে তুলসীমালা আর কপালে আঁকবে তিলক। হাতে নেবে একটা দণ্ড।

মহারাজকে বলতে লজ্জা। তাই ফিসফিসিয়ে শোনালো আমার:

কানে,—বলো তো সখা, আমার ইচ্ছেটা ভালো নয়? এ যেন কেমন কেমন লাগে নিজেকে। শাদা জামা আর শাদা শাড়ি পরে বাপ্পার পাশে হাঁটব,—কেমন দেখাবে বলো তো?

আমি মুচকি হেসে বললাম,—কিন্তু তাহলে ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে যাবে যে!

হারিয়ে যেতেই তো চাই সখা,—মিলিয়ে যেতে চাই। সকলের সঙ্গে সমান হয়ে যেতে চাই। কতো মেয়ে বারকরী হয়ে পথে যাবে, আমি হতে চাই তাদেরই একজন।

আর তোমার হাতে ঐ যে দণ্ড,—ওটার মাথায় একটা নিশানও বেঁধে নেবে তো?

হাততালি দিয়ে চেরিল বলেছে,—ঠিক বলেছ,—এটা আমার মনে পড়েনি,—নিশ্চয়! বলো না সখা, খুব ভালো হবে না?

নাথুরাম ঘুরঘুর করছিল পাশে। আমি বলি,—ঐ নাথুরামের মতটা নাও। নাথুরাম বারকরী হতে এসেছে, ঐ ঠিক বলবে। কী হে নাথুরাম, তুমি তো বারকরী হবে,—তাই না?

এক মুহূর্ত থমকায় নাথুরাম। তারপর আমতা আমতা করে বলে,—তা আমি যদি বারকরী হই মেমসায়েব হবে না?

শোনো কথা লোকটার। কী শুনতে কী শুনে কী বলতে কী বলে,—মানে বোঝা দায়। আমি ধমকের গলায় বলি,—বলছ কী? তুমি তো বারকরী হবে বলেই এসেছ! তোমার সঙ্গে চেরিলের বারকরী হবার সম্পর্কে কী?

সম্পর্ক নেই? বোকাবোকা দন্তবিকশিত মুখে নাথুরামের উত্তর,—বলেন কি দাদা? মনে করুন সারা জীবন ধরে প্রতি বছর এই দিনটিতে মেমসায়েবের সঙ্গে মুখামুখি দেখা। কে কোথায়,—কুড়ি বছর পরেও এমনি দিনে বুড়োবুড়ি এই রাস্তায় মন্দিরা বাজিয়ে নেচে বেড়াচ্ছি। জয় বিট্‌ঠল,—একবার ভাবুন তো সম্পর্কটা?

বলেই হাসিতে ফেটে পড়ল নাথুরাম। আমিও অট্টহাসি

হাসলাম। এর পর আর চেরিলের বারকরীর ভেক ধরা চলে না। বড়ো জোর রাগে গুম হওয়া চলে।

তাই সেই পরিচিত বিচিত্র বেশেই চেরিল চলেছে আমাদের পাশে পাশে। কেবল পায়ে পরেছে একটা গেরুয়া ক্যাম্বিসের জুতো। গলায় তুলসী মালার কণ্ঠী—সেই সঙ্গে আরো কয়েক গোছা সরু মোটা পুঁতির মালা। মালাগুলি মোটামুটি আমারই পছন্দ। আর হাতে এক জোড়া মন্দিরা,—নাথুরামের উপহার।

দিণ্ডীর পর দিণ্ডী, বারকরীর দল। আমরা যারা বারকরী নই, সখের যাত্রী, আমরা কোথায় দল পাব? আমাদের ঠাঁই মিলবে কোন্ দিণ্ডীতে? মহারাজই আমাদের আশ্রয় দিয়েছেন। তাঁর নেতৃত্বে যে দিণ্ডীটি গড়ে উঠেছে তাতে নিয়মিত বারকরীর সংখ্যা থেকে আমাদের মতো যাত্রীর সংখ্যা কম নয়। যে বারকরী আর যে বারকরী নয়, দুজনের প্রতিই তাঁর সমান স্নেহ। তাই তাঁর একপাশে নাথুরাম আর একপাশে চেরিল। যাত্রার সঙ্গে সঙ্গে গান শুরু হয়েছে। একই পথে প্রতিটি দিণ্ডী চলেছে,—অনুসরণ করছে একই গান। সেই গানই মহাবাজের বৃদ্ধ কণ্ঠে। দু-পাশে মন্দিরা বাজাচ্ছে চেরিল আর নাথুরাম। তাদের পিছনে অনেক বারকরী। গলায় মৃদঙ্গ, হাতে মন্দিরা। কারো আঙুলে বীণার পিড়িং পিড়িং।

আমি ঝাড়া-হাতপা। বীণা মন্দিরা মৃদঙ্গ—কিছুই নেই। কটা অকিঞ্চিৎকর জিনিসে ভরা ছোট ব্যাগটার ভার থেকেও মুক্ত হয়েছি। হাতে হাতে সেটি পৌঁছে গেছে নির্দিষ্ট গো-শকটে। আমার সামনে পথ, এই পথে দলে বলে হাঁটব। পিছিয়ে না পড়লেই হোলো।

অচেনা পথ, তবু যেন অচেনা নয়। কতোদিনের জানাশুনো, কতো দিবসরাত্রির সহচর। অচেনা পথে পা বাড়াতে আমার রোমাঞ্চ হয়,—দয়িত-মিলনের রোমাঞ্চ। কতোকালের চেনা বন্ধু—অচেনা রূপ ধরে এসে দাঁড়িয়েছে,—পুরোনো প্রেম নতুন সবুজের সাজ

পরে হাতছানি দিচ্ছে। হঠাৎ চোখ তুলে যাকে অচেনা বলে মনে হয়, চির চেনা সে অন্তরের অনুভবে।

প্রতিদিন ভোরে ওরা সকলের গলায় একটি করে মালা পরিয়ে দেয়। ফুলের মালা, দিনান্তে শুকিয়ে যায়, আবার নতুন মালা পরায় নতুন ভোরে। আর একটি মালা চেরিল দিয়েছে। এ মালা শ্বেততুলসী কাঠের,—কখনো শুকোবে না। সারা যাত্রাপথে গলায় ঝুলবে। যাত্রাশেষেও স্মৃতি হয়ে থাকবে।

বারকরীর সঙ্গে চলছি, কিন্তু বারকরী হওয়া আমার হোলো না। পথযাত্রা তার নির্দিষ্ট নিয়মিত ব্রত। মনের স্থির মানচিত্রে মোটা দাগের বন্ধনে তার পথ বাঁধা। সেই পথে তার সারা জীবনের যাওয়া-আসা। আমি তেমন নই। জন্মভোর একই ব্রত নিয়ে একই পথে চলার লোক আমি নই। আমার বিচিত্রগামী মনকে পথ তার বিচিত্র রূপ নিয়ে ভোলায়। এক পথের শেষে আমি নতুন পথে হাঁটি। অচেনা পথের বৈচিত্র্যে আমি পথভোলা। বালানন্দ ব্রহ্মচারীর জীবনী আমাকে ডেকেছিল নর্মদাযাত্রায়। গৌরদাণ্ড দিয়ে নীলাচল-ভ্রমণের প্রেরণা দিয়েছিল চৈতন্যচরিতামৃত। আর গতবার যদি ব্রহ্মগিরিতে পূর্ণ চৈতন্য মহারাজের সঙ্গে দেখা না হোতো তাহলে এই বারকরী যাত্রায় যোগ দেবার কথা ভাবতেই পারতাম না।

কানহাইয়ালাল বললে,—এটি বুক পকেটে রাখুন দাদা। অনেক সুবিধে হবে।

উল্টেপাল্টে দেখলাম। শুধোলাম,—

কোথায় পেলে কানহাইয়ালাল?

আলন্দী বাজারে। কটা কিনে নিলাম,—তার একটা আপনার জন্যে।

ছোট একটা পুস্তিকা,—দিশী কাগজ, সুতো দিয়ে হাতে বাঁধাই। দেবনাগরী অক্ষরে লেখা,—নাম অভঙ্গ-মালিকা।

কানহাইয়ালাল বললে,—হাঁটতে হাঁটতে পকেট থেকে বার করে পাতা উল্টোবেন,—নইলে ঠিক জমবে না।

ঠিকই বলেছে কানহাইয়ালাল। বড়ো উপকার করেছে সে।

আমি না বুঝি ভাষা, না জানি সুর। কিন্তু ছন্দে ছন্দে ভেসে চলেছি। মৃদঙ্গ-মন্দিরার তালে তালে মেতে উঠেছে অবুঝ মন। ছন্দ জেগেছে পায়ে। সেই ছন্দের আনন্দ শত-শত যাত্রীর পায়ে পায়ে আমার পা-কে টেনে নিয়ে চলেছে।

প্রত্যূষ থেকে রাত্রি পর্যন্ত, দিনের পর দিন। উদয়-সূর্য থেকে অস্তরবির অভিমুখে। শুধু যাত্রীচরণকে অনুসরণ করে নয়, সুরছন্দের তরঙ্গদোলায় দুলে দুলে। সারাজীবনের পথচলার সঙ্গে এ চলার কোনো সম্পর্ক নেই,—এ এক অভূতপূর্ব অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞতা।

অন্ধকার থাকতে থাকতে ঘুম ভাঙে। রাতের সাময়িক আশ্রয় ছেড়ে পথে নেমে আসি বারকরীদের পিছনে পিছনে। তখন পাখিদের ঘুম ভাঙছে, কাননে কাননে ফুল ফুটছে, অরুণ আলোর ছোঁয়া লাগছে নিমপিপুলের উঁচু ডালে।

পথের মাঝখানে সন্ত-পালকী। সেই পালকী ঘিরে বারকরীরা দাঁড়ায়, প্রভাতী বন্দনা গায়, সন্তপাদুকাকে প্রণাম করে, সন্তপটে মালা ঝোলায়। সন্তচরণে মালা ছুঁইয়ে এ-ওর গলায় পরে।

তারপর শিঙা বাজে। সেই শিঙা গৃহস্থদের ঘুম ভাঙায়। ঘুম-চোখে সবাই ছুটে আসে। যে চাষী মাঠে যাত্রা করেছিল যে রাখাল গোষ্ঠে চলেছিল, সে ছুটে আসে। যে পড়ুয়া বইখাতা খুলে বসেছিল, সে ছুটে আসে। যে বধূ উনুনে আঁচ দিচ্ছিল সে ছুটে আসে। ছুটে আসে সদ্য-ঘুমভাঙা তরুণ-তরুণী, দাওয়ায় বসা বৃদ্ধা-বৃদ্ধা। তারা জয়ধ্বনি করে বারকরীদের বিদায় দেয়।

বারকরীরা হাঁটে, দিনের পর দিন। সূর্য যখন মধ্যগগনে তখন ছায়াশীতল আশ্রয়, সাময়িক বিশ্রাম। স্বল্প আহার। তারপর আবার হাঁটা, দিনান্ত পর্যন্ত। সূর্য তখন পাটে, পাখিরা ফিরছে কুলায়ে।

ধেনুরা ফিরছে গোয়ালে, কৃষক ফিরছে কুটীরে। গৃহবধূ অঙ্গনে জ্বালছে প্রদীপ,—মন্দিরে বাজছে আরতির শঙ্খঘণ্টা।

তখন বারকরীদের দিনের যাত্রা শেষ। রাতের আশ্রয়ের জন্যে নির্দিষ্ট জায়গায় জমায়েত। সান্ধ্য কর্তব্যের শুরু। সন্তপাদুকাকে পালকী থেকে নামিয়ে এনে সান্ধ্য মন্দিরে স্থাপন করা। সান্ধ্য পূজারতি বন্দনাগান। তারপর আহার ও বিশ্রাম। বিশ্রাম মানে নিদ্রা নয়,—গভীর রাত পর্যন্ত গান, পাঠ, কথকতা, ধর্মালোচনা।

পরদিন প্রত্যূষে আবার যাত্রার শুরু।

আমার সঙ্গে ক্যালেণ্ডার নেই, আমি দিনের হিসেব রাখিনে, খবর রাখিনে শনি-মঙ্গলবারের। বারকরীস্রোতে ভেসে চলেছি, তরণী যেমন ভেসে চলে,—নদীর বুকে শিহর তুলে, তরঙ্গে তরঙ্গে ছলছলানি জাগিয়ে। তেমনি সুর আর ছন্দের তরঙ্গে তরঙ্গে চলা। যতোক্ষণ চলা ততোক্ষণ গান গাওয়া। এক মুহূর্ত গানের বিরাম নেই। গানের স্তব্ধতা চলার যতি।

কথা নয় গান। গান কেন? গানেই সংযম। গানের সঙ্গে সুর আর তাল। সুরে চিন্তার সংযম, তালে গতির সংযম।

কানহাইয়ালাল তাই অভঙ্গ-মালিকা কিনেছে কয়েক কপি। এক একটি আমাদের হাতে হাতে দিয়েছে। তার প্রথম গানটি গেয়ে প্রতিদিনের যাত্রা সুরু। জ্ঞানেশ্বরজী রচিত—'রূপ পহাতা লোকানি':

তোমার মূরতি মোর নয়নে প্রকাশ
আনন্দের নাহি মোর শেষ।
হে প্রভু বিট্‌ঠল তুমি হে প্রিয় মাধব
অন্তরূপী অনন্ত অশেষ॥
জ্ঞানদেব কহে,—মোর পূর্ব জনমের
সীমাহীন সুকৃতির ফলে
হৃদয়-সায়র মোর আলোকিত হোলো
তোমার প্রেমের শতদলে॥

মুখ্য দিণ্ডীর বীণাবাদক গানের সূত্রধার। তিনি গান আরম্ভ করেন। প্রথম কলিটি শেষ হবার আগে প্রতিটি মানুষ গলা মেলায়। দিণ্ডী থেকে দিণ্ডীতে গানের সুর ছড়িয়ে পড়ে। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত প্রতিটি বারকরীর কণ্ঠে সেই গান একসঙ্গে ধ্বনিত হয়।

ছেদ নেই। একটি গান শেষ হলেই আর একটি গানের শুরু। ছেদহীন ত্বরিত যাত্রার সঙ্গে সঙ্গে এক গান থেকে আর এক গান সমবেত কণ্ঠে গিয়ে পৌঁছোয়। এমনি গানের পর গান শতকণ্ঠে কেমন করে গাইছে? সুর কাটছে না, তাল কাটছে না। এক গান শেষ হতে না হতে পরের গানটি ধরতে একটু দ্বিধা হচ্ছে না। কবে কোথায় বসে এই চলমান সংগীত-সভার রিহার্সাল দিয়েছে ওরা?

রিহার্সাল লাগে না। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে এই গানগুলি লোকমানসের অক্ষয় ধন হয়ে রয়েছে। গীতিমালার গ্রন্থনাও আজকের নয়। কথা ভুল হবার নয়, সুরতালের বিচ্যুতি হবার নয়। অপরিবর্তন ধারায় যুগ যুগ ধরে বয়ে চলেছে। এই সুর-স্রোতস্বিনী বেয়েই প্রতিবারের বারকরী যাত্রা।

প্রতিদিনের যাত্রা দুটি ভাগে ভাগ করা। প্রভাতী আর বৈকালী যাত্রা। অভঙ্গ-মালিকাও দুভাগে ভাগ করা। প্রভাতী যাত্রায় পাঁচটি মালিকা। প্রথম মালিকায় দশটি গান। জ্ঞানেশ্বর রচিত বিট্‌ঠল-বন্দনার পর-পর আটটি গান তুকারাম রচিত। গানে গানে বিট্‌ঠলচরণে আত্মনিবেদনের আকূতি।

হে প্রভু কমলাপতি
এ কী তোমার ধরণ।
কেঁদে কেঁদে কাল কাটে মোর
পাইনে তোমার চরণ॥
অনাথ আতুর দীনাতিদীন
তোমার শরণ মাগি।

দিবানিশি তোমার আশায়
অশ্রু-চোখে জাগি ॥
পথের ধূলোয় লুটিয়ে আছি
ধরো আমার করে।
এই অভাগা ভক্তজনে
রাখো চরণপরে ॥
সনকাদি হে সাধুজন
শোনো এ মিনতি।
বলো কোথায় পথ আছে মোর
কোথায় আমার গতি !
বৈকুণ্ঠের গতি যিনি
পতি তিনি মোর।
তাঁর বিহনে বিরহ-রাত
হয় না আমার ভোর ॥
আগল-বাঁধন সব ছুটেছে,
পায়ে তোমাদের পড়ি,—
পথ দেখিয়ে দাও আমারে
কোথায় আমার হরি ॥
চির নির্ভর চির বন্ধু
চির আমার প্রভু।
খুঁজব তোমায় অচিন পথে
ফিরব না আর কভু ॥
কবে দেখা দেবে আমায়,—
তোমায় চোখে রাখি,
দৃষ্টি আমার তৃপ্ত হবে
অন্ধ হবে আঁখি ॥

এই মালিকার শেষ গানটির রচয়িত্রী কবয়িত্রী জনাবাঈ। মাতৃরূপে বিট্‌ঠলপ্রভুর বন্দনা—

পিতা নও মাতা তুমি
বিট্‌-বিহারিণী
পান্ধারীবাসিনী।
তোমার চরণতলে
ভীমা চন্দ্রভাগা
গঙ্গা প্রবাহিণী॥
নামদেব-শিষ্যা আমি
তোমারি তনয়া
নাম জনাবাঈ।
তোমার কোলেতে রাখো
হৃদয় আমার,
পায়ে দাও ঠাঁই॥

এক একটি মালিকার শেষে কিছুক্ষণ ধরে শুধু নামগান,—জয় জয় বিট্‌ঠল রামকৃষ্ণ হরি, রামকৃষ্ণ হরি, রামকৃষ্ণ হরি। তারপর আর একটি মালিকার আরম্ভ।

দ্বিতীয় মালিকায় বারোটি গান। এই মালিকার প্রথম গানটিও জ্ঞানেশ্বরজীর রচনা,—'যোগীয়া দুর্লভ' :

ধ্যানমগ্ন যোগীগণ যারে নাহি পায়
দেখি সেই পরম ঈশ্বরে।
নয়ন সমুখে তাঁর পুণ্য আবির্ভাবে
নয়ন নাহিক আর সরে॥
ভেদি মায়াকুহেলির আবরণ পাশ
প্রকাশ অদ্বৈত রূপ তাঁর।

আবার বিচিত্র বেশে সংখ্যাতীত রূপে
মর্ম্মমাঝে তাঁহারি বিস্তার॥
জ্ঞানদেব বলে,—যোগী, কী তত্ত্ব তোমার,
কী দর্শন আমারে শিখাবে?
যে মন্ত্রে বাঁধিবে মোরে নিত্যাভ্যাস ব্রতে
সে মন্ত্র কি তাঁহারে মিলাবে?

তৃতীয় মালিকাটির নাম বাসুদেব মালিকা। কৃষ্ণবাসুদেবের বন্দনা-গানে এই মালিকাটির চয়ন। সংগীত রচয়িতারা ভিন্ন ভিন্ন।

তৃতীয় মালিকা শেষ হতে না হতে সূর্য প্রায় মাথার ওপর। ভোরের কুয়াশা কখন সরে গেছে, শুকিয়ে গেছে পথের শিশির। চারদিক রোদে পুড়ছে। শেষ শরতের ভ্যাপসা গরম,—ঘামে ভিজে গেছে সারা দেহ। শরীরে ক্লান্তি, জঠরে ক্ষুধা, কণ্ঠভরা তৃষ্ণা। প্রত্যূষ থেকে বিরামহীন ছোটা, ছন্দে ছন্দে দৌড়ে দৌড়ে এগোনো,—পা আর চলতে চাইছে না। ধূলো উড়ছে,—জ্বালা ধরেছে চোখে, ঝাপসা হয়ে আসছে দৃষ্টি। এখনো কতোটা যেতে হবে, বিশ্রাম কতো দূরে?

তাই এবারের মালিকাটিতে শুধু অন্ধ আর খঞ্জের গান। গানের পর গানে একই বেদনা, একই দুর্বলতা, একই আকূতি! সে গানের সুর চোখের জলে ভিজে,—শ্লথ চরণের শ্রান্ত পরিক্রমায় সে গান বেতালা। আর্ত কবিকণ্ঠ—

প্রভু, আমি খঞ্জ, আমি অন্ধ, আমি বিকল।
আমি হাঁটতে পারিনা, দুচোখে আমার অন্ধকার।
প্রভু, আমি ক্লান্ত, আমি ক্ষুধার্ত, তৃষ্ণার্ত,
—আমি তোমার প্রসাদ-ভিখারী।
তুমি আমাকে পথ দেখাও, হাতে ধরে নিয়ে চলো
তোমার অমৃত নিকেতনে।

পঞ্চম মালিকায় কৃষ্ণগোপীলীলা। এই মালিকা শেষ হওয়ার সঙ্গে প্রভাতী যাত্রায় বিরতি। মধ্যাহ্নের বিশ্রাম, দ্বিপ্রাহরিক সেবা।

বৈকালী যাত্রায় গানের সংখ্যা বিরল। কথা আর সুরতালের বৈচিত্র্য সকালবেলাই জমে ভালো। তাই বিকেলবেলার পদযাত্রায় নামকীর্তনই প্রধান। প্রথমে অবশ্য তুকারাম-চরিত বিট্‌ঠল বন্দনা,—'সুন্দর তেঁ ধ্যান উভেঁ বিটেবরী' ঃ

সুন্দর তুমি বিট বিরাজিত
কটিপাশে দুটি পাণি।
কণ্ঠে তোমারি তুলসীর মালা
পীতধড়া পরিধানী॥
শ্রবণ যুগলে মকরকুণ্ডল
কণ্ঠে কৌস্তুভমণি।
তোমার শ্রীমুখ পরমানন্দ
সর্বসুখের খনি॥
তব গুণগানে তব রূপ পানে
সকল তৃষার ক্ষয়।
পাণ্ডুরঙ্গ শ্যামল কান্তি
সর্ববেদন লয়॥
তোমার শ্রীমুখ সর্বসিদ্ধরূপ
চির মঙ্গলময়।
তুকা বলে,—মোর ধ্যানে দাও তব
অনন্ত পরিচয়॥

এই গানটি শেষ হবার পর হরিপাঠ। হরিনামে দ্বৈত অদ্বৈত ভেদাভেদ নেই। পরম অদ্বৈতবাদী শংকর আর ভক্তিরসপ্রাণ

মহাপ্রভু উভয়েই উদ্ধৃত করেন,—হরের্ণাম হরের্ণাম হরের্ণামৈব কেবলম্‌। কেননা কলিযুগে হরিনাম ভিন্ন নাস্ত্যেব গতিরন্যথা। তাই সারাদিনের যাত্রার শেষ জ্ঞানেশ্বরজীর হরিপাঠাচে অভঙ্গমালার গানে গানে।

এমনি করে দিন অতিবাহিত হয়। ঘন হয়ে আসে অন্ধকার। প্রত্যূষ থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত বারকরীরা মুক্ত মনে পথে হেঁটেছে। বাক্য থেকে চিন্তা থেকে পরিবেশ থেকে মুক্তি। সারাদিন মুহূর্তমাত্র সংসারচিন্তা করেনি। সংসারস্মৃতিকে মনের কোটরে আবদ্ধ রাখেনি। হয় সে স্থিতমুখে গান করেছে, না হয় স্মিতমনে ধ্যান করেছে।

আকাশে তারা, দুধারে অন্ধকার, দূরান্তে নাগরিক আলো। জনপদের আলো,—ওখানে পৌঁছলে দিনের যাত্রাশেষ, রাতের আশ্রয়। ঐ আলোর উদ্দেশ্যে ক্লান্তপদ বারকরীরা হরিপাদ গাইতে গাইতে চলেছে।

সন্তপাদুকার অনেক পিছনে আমাদের দিণ্ডী। পূর্ণচৈতন্যজী মহারাজের হাতের বীণায় এখনো সুরঝংকার। দুপাশে হাঁটছে নাথুরাম আর চেরিল। বাক্যে দুজনেই পটু,—একজন বাক্যবাগীশ আর একজন বাগীশ্বরী। কিন্তু কারো মুখে কথা নেই। শুধু জ্ঞানেশ্বরী হরিপাদের এক একটির মাঝখানে সমবেত নামমন্ত্রে যোগ দিয়ে সুর করে গাওয়া,—

হরিমুখে ম্হনা হরিমুখে ম্হনা
পুণ্যাচী গণনা কোন করী।
মুখে হরিনাম মুখে হরিনাম
পুণ্য গণনা কেবা করে ?

॥ ৭ ॥

বন্ধু কানহাইয়ালাল। পুরোনো বন্ধু, পুরোনো পথসঙ্গী। সেবারের সেই মুণ্ড মহারণ্য যাত্রার মতো এবারের এই বারকরী যাত্রার নিত্য সহচর। এক কপি অভঙ্গ-মালিকাই শুধু আমার হাতে তুলে দেয়নি,—অশুদ্ধ উচ্চারণ আর ভুল সুরের লজ্জা ভাঙিয়ে বারকরী গানে তার গলার পাশে আমার গলাকেও টেনেছে।

নীরা নদী তখন আমরা পার হচ্ছি। বারকরীর দল দিনে দিনে ভারি হচ্ছে। দিণ্ডীর সংখ্যা বাড়ছে। নদীতে যেমন বিভিন্ন উপনদী যোগ দেয় তেমন। আমাদের দল দারুণ অভ্যর্থনা পেয়েছে পুণায়। শিবাজী উদ্যানে বিশাল সভা, সভামণ্ডপ ঘিরে তাঁবুর পর তাঁবু। প্রত্যূষ থেকে গভীর রাত পর্যন্ত গান, বক্তৃতা, ধর্মালোচনা। সেখানে দুদিন স্থিতি। আরো অন্তত দুশো যাত্রীর যোগদান। শাসবদে সোপানদেবের সমাধিমন্দিরের পাশে বারকরীদের রাত্রিবাস। সেখানেও কয়েকটা নতুন দিণ্ডী। জেজুরিতে দুরাত্রি বাস। খাণ্ডোবা মন্দির দর্শন ও পূজার্চনা। জেজুরি থেকে অন্তত দেড়শো জন নতুন যাত্রী আমাদের দলকে পুষ্ট করেছে। এবার নীরা নদীর তীরে লোলান্দ।

বারকরী যাত্রার এক মস্ত জংশন স্টেশন লোলান্দ। দক্ষিণের অসংখ্য যাত্রী এই লোলান্দ পর্যন্ত ট্রেনে আসে। এখানে এসে জমায়েত হয়। দিণ্ডী সাজিয়ে অপেক্ষা করে আলন্দীর বারকরীদের জন্যে। তারপর মূল দলের সঙ্গে মিলে যায়, জ্ঞানেশ্বর পাদুকার সঙ্গে সঙ্গে যাত্রা করে। সারা পথে বারকরী দলে নতুন নতুন দিণ্ডী এসে মেশে, যাত্রীদল সবচেয়ে পুষ্ট হয় লোলান্দে।

লোলান্দ থেকে পূর্বাভিমুখী পথ বেশ প্রসন্ন। নদীর তীরে তীরে উপত্যকার মধ্যে দিয়ে। পশ্চিমঘাটের অরণ্য আর পার্বত্য

পথের বন্ধুরতা আর নেই। চড়াই নেই, উৎরাই নেই, জঙ্গল নেই, পাকদণ্ডী নেই। সমতল পথের দুধারে শ্যামল তৃণক্ষেত্র। গ্রামের পর গ্রাম। সেই পথে নেচে গেয়ে এগিয়ে যাওয়া।

লোলান্দের সান্ধ্য উৎসবসভা থেকে আমি পায়ে পায়ে চলে গিয়েছিলাম নদীর ঘাটে।

পকেট থেকে বার করেছিলাম কাগজ-কলম।

কে?

আমি দাদা।

ওঃ, কানহাইয়ালাল? এসো এসো।

কানহাইয়ালাল পাশে এসে বসল।

আমি বললাম,—সভা ছেড়ে উঠে এলে যে?

দর্শনের সেই অধ্যাপক গুরুগম্ভীর লেকচার দিচ্ছেন,—ও আমার ভালো লাগল না।

আমি মুচকি হাসলাম। কানহাইয়ালাল আবার বললে,—কী করে যে মহারাজের সঙ্গে ভিড়ল? গলা নয় তো? যেন করাত দিয়ে কাটছে!

ঠিক, আমি বললাম,—বক্তৃতা নয় তো? দ্বৈতাদ্বৈতের মাঝখানে করাত চালিয়ে চালিয়ে সহজ বুদ্ধিকে দু-টুকরো করছে!

যা বলেছেন দাদা। ন্যায়ের সঙ্গে অন্যায়ের লড়াই বুঝি, ধনীর সঙ্গে গরীবের, ভোগের সঙ্গে ত্যাগের লড়াই বুঝি—কিন্তু দার্শনিকদের এই দ্বৈতের লড়াই বুঝিনে। অথচ দেখুন, হাজার হাজার বছর ধরে সমানে এই একই কচকচি চলে আসছে! কেন বলুন তো?

বোঝার কিছু নেই বলেই কানহাইয়ালাল। যারা বুঝেছে তারা আব কচকচি করেনা।

ঠিক বলেছেন,—তারা তখন গান গায়। এই বারকরীগুলো খাসা, তাই না?

ঠিক। সারা বছর কাজকর্ম করো, সংসারধর্ম করো, তারপর

কদিন সব ছেড়েছুড়ে গান গেয়ে গেয়ে বেড়াও। তখন আর কথাটি বোলো না।

হাসল কানহাইয়ালাল। আয়েস করে একটা বিড়ি ধরাল। তারপর বললে—শুধু গান নয় দাদা, গালগল্পও ভালো। যেমন সাধুসন্তের গালগল্প মাঝে মাঝে আমরা শুনি। কিন্তু একটা কথা বলি,—গান আর গল্প ছেড়ে অন্য কাজ নিয়ে আপনি ব্যস্ত কেন?

অন্য কাজ? আমার আবার অন্য কাজ কী কানহাইয়ালাল?

এই যে অবসব পেলেই কাগজে পেনসিল ঘসা? কী লেখেন এতো?

চিঠি লিখি।

চিঠি লেখেন? কাকে?

কাকে আবার? নিজেকে।

আমি ঘর ছেড়ে যখন পথে পথে ঘুরি তখন অবসর পেলে কাগজ ভর্তি করি। ডাকের নীলচে কাগজ কয়েকখানা করে আমার পকেটে জমিয়ে রাখি। সেইসব কাগজে পথের খবর পথসঙ্গীদের চরিত্র-চিত্রণ দর্শনীয়ের বিবরণ লিখি। একটা কাগজ ভর্তি হলে তার মুখ এঁটে নিজেরই নাম নিজেরই ঠিকানা লিখে হাতের কাছের ডাকবাক্সে ফেলে দিই। জ্ঞাতব্য দ্রষ্টব্য আব স্মর্তব্য বিষয়বস্তুতে ভারাক্রান্ত মোটা ডায়েরী-খাতা অনেক ভ্রমণকারীর সঙ্গেই থাকে। সে-ভার থেকে আমি মুক্ত। যেখানে বসে যা কিছু লিখি, আমার হাত থেকে ডাকবিভাগ নিজের হাতে তুলে নেয়, আমার পাকা ঠিকানায় পৌঁছে দিয়ে আসে। এ আমার নিজস্ব টেকনিক।

কানহাইয়ালালকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে বললাম,—বুঝলে, ফিরে গিয়ে দেখব, সব চিঠি আমাব টেবিলে সাজানো আছে।

তখন আপনার চিঠিগুলি নিয়ে আপনি কী করবেন?

খুলে খুলে পড়ব। এই বারকরী যাত্রার কথা মনে পড়বে। দিনের পর দিন এই দুরূহ পথে কতো কষ্ট করে হাঁটছি তার কথা,

পূর্ণচৈতন্যজীর স্নেহের কথা, তোমার আর নাথুরামের ভালোবাসার কথা, কতো অচেনা মানুষের কতো বিচিত্র ব্যবহার দেখলাম,—সে সব কথা।

কানহাইয়াল মুচকি হাসল।

চেরিলকে মনে পড়বে না? তার কথা লেখেননি?

লিখেছি বৈকি, অনেক লিখেছি। পাতার পর পাতা ভর্তি করেছি তাকে নিয়ে। মেয়েটার কিছুই জানিনে,—জানিনে বলেই লেখার শেষ হয় না।

একলা পড়বেন?

একলা কেন, যখন ফিরে যাব তখন কতো বন্ধুস্বজন কতো চেনাশুনো আমার কাছে আসবে। সবাই ছেঁকে ধরবে, আমার ভ্রমণের গল্প শুনতে চাইবে। তাদের এই চিঠিগুলো পড়ে পড়ে শোনাব।

গল্পই বটে, ভ্রমণের গল্প। শুধু গল্প বলাই নয়, গল্প লেখা। এই ভ্রমণের গল্প আমি লিখব, তারই চ্যাপটার সাজিয়ে সাজিয়ে একটির পর একটি চিঠি আমি লিখে চলেছি। বাঁধনহারা কল্পনাকে চিঠির নৌকোয় সাজিয়ে একের পর এক নৌকো ছেড়ে দিচ্ছি ডাকবাক্সের ঘাটে।

বাদ সাধল কানহাইয়ালাল। কলম-বাগানো হাতটা চেপে ধরল,—দাদা, রাগ না করেন তো বলি, এই হর্‌রোজের কেরানিগিরিটা আর করবেন না। এ কম্মটা ত্যাগ করুন।

কেন কানহাইয়ালাল?

এ যে বাঁধা চাকরি দাদা। চাকরি করবার জন্যে তো আপনি আসেননি।

রাগ না করি, একটু বিরক্ত হতে বাধা কিসের?

বলো কী কানহাইয়ালাল? আমি চাকরি করছি? প্রতিদিনের পদযাত্রার এই রোজনামচা—এর দাম তুমি কী বুঝবে? আমি তো

আর বারকরী হয়ে বারে বারে আসব না। এই লেখা ভবিষ্যতে যখনই পড়ব তখনই এই পথ মনের বুকে স্পষ্ট ছবি হয়ে ফুটে উঠবে।

না ফুটুক। কী লাভ? কীই বা দাম? পথের ছবি মনে আবার কেউ রাখে? বিশেষ করে বারকরীর পথ?

বারকরীদের পথ মনে রাখার নয়?

না দাদা, বারকরীদের মনটি মনে রাখার,—সেই স্মৃতি লেখার অপেক্ষা করে না।

কানহাইয়ালাল যখন কথা শুরু করেছে তখন লেখা আর এগোবে না। রাগ-বিরক্তি দেখিয়েও নিস্তার নেই। কলম-কাগজ পকেটে পুরলাম। বললাম,—

রইল আমার লেখা। এখন তোমার বক্তব্য শুনি।

হেসে ফেলল কানহাইয়ালাল। তার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে। বললে,—না শুনে যাবেন কোথায়? অকর্তব্যকে কর্তব্য করলে বক্তব্য শুনতেই হয়।

তারপর কথা ঘুরিয়ে বললে,—

পুণাতে বারকরী সভার গেটে একটা মানচিত্র দেখেছিলেন,—মনে পড়ে?

মনে পড়ল। ঠিক তোরণের সামনে রাজ্যের একটা বিশাল মানচিত্র টাঙানো ছিল। বিভিন্ন বারকরী দলের যাত্রার উৎসের নাম লেখা ছিল তাতে,—পাশে-পাশে সন্তের নাম। একটুকরো শাদা কাগজে সে মানচিত্রের একটা কাঁচা কপিও করে নিয়েছিলাম। পকেট থেকে বার করে কানহাইয়ালালের চোখের সামনে মেলে ধরলাম।

চলেছে। সারা রাজ্যের উত্তর পশ্চিম পূব দক্ষিণ থেকে সন্তগণের পাদুকা চলেছে পান্ধারপুরের অভিমুখে। পাদুকা বহন করে চলেছে আমাদেরই মতো দিণ্ডীতে দিণ্ডীতে ভাগকরা বারকরীর দল। আমাদেরই মতো পায়ে হেঁটে গান করতে করতে।

ত্র্যম্বক-নাসিক থেকে আসছে নিবৃত্তিনাথের পাদুকা। শাসবদ থেকে সোপানদেবের পাদুকা,—মেহুন থেকে মুক্তাবাঈএর পাদুকা। আলন্দী থেকে যেমন জ্ঞানেশ্বরজীর পাদুকা নিয়ে আমরা চলেছি,—তেমনি দেহু থেকে তুকারামের পাদুকাবাহী আর একটি দল যাত্রা করেছে। সাতারার সজ্জনগড় দুর্গ থেকে রামদাস স্বামীর পাদুকা নিয়ে একদল আসছে। দৌলতাবাদ থেকে আসছে জনার্দন স্বামীর আর পৈঠান থেকে একনাথজীর পাদুকা। তাছাড়া আরো কতো দল, কতো সন্তস্মৃতি। দক্ষিণ-পশ্চিমে কোল্হাপুর থেকে বারকরীরা যেমন হাঁটছে তেমনি হাঁটছে উত্তর-পূর্ব সীমার নাগপুর থেকে। পশ্চিমের পরশুরাম তীর্থ চিপলুন থেকে যেমন আসছে, তেমনি আসছে পূর্বের তুলজা-ভবানী থেকে।

সারা মানচিত্র জুড়ে পথরেখার আঁকিবুকি। নামে নামে নামাবলী। আঙুল দিয়ে দিয়ে উৎসকেন্দ্রগুলি গুনতে লাগল কানহাইয়ালাল। অন্তত আটাশটি। মানচিত্রটি সাবধানে মুড়ে আবার আমার হাতে তুলে দিল।

তারপর বললে,—কোন্ পথের ছবি আপনি আঁকবেন দাদা? কোন্ পথে পায়ের নিচে পাহাড় নেই, নদী নেই, পাথর নেই, কাঁটা নেই? কোন্ পথের পাশে নেই চাষের খেত আর ফলের বাগান, শহর আর গ্রাম, গৃহস্থের বাড়ি আর দেবতার মন্দির? সারা রাজ্যের সমস্ত পথ যে আজ একটি পথ হয়ে গিয়েছে,—সে পথ বারকরীর পথ। সে পথ আবার আজকের পথ নয়, কতো কালের চেনাশোনা মুখস্থ করা পথ,—তার বর্ণনা নতুন করে আপনি কী দেবেন?

কতো কালের খবর জানিনে,—আজকের খবর জানি। আজকের পথের খবর। আজকের এই প্রসন্ন শরতের সোনালি প্রভাত কোন্ পথে না ভরে উঠছে ভক্ত সন্তের গানে গানে? দিনের অবসন্ন অবসানে কোন্ পথের প্রান্তে না জ্বলছে প্রভুর আরতি-প্রদীপ?

ঠিকই বলেছে কানহাইয়ালাল।

সে পথের কতোটুকু বর্ণনা আমি দিতে পারব সরকারী চিঠির কাগজের পাতায় পাতায় ?

সেদিন নীরা নদীর তীরে বসে আরো মোক্ষম কথা শোনালো কানহাইয়ালাল। বললে,—

আপনি আমাদের কথাও লেখেন। তাই বললেন না দাদা ?

তাই তো।

মহারাজের কথা, চেরিলের কথা, আমার কথা, ঐ নাথুর কথা,—সকলের কথা, না ?

ঠিক।

সারাদিন নামগান গলায় নিয়ে পথে হাঁটা, আর তারপর এককোণে চুপটি করে বসে বানিয়ে বানিয়ে মিথ্যে কথার পর মিথ্যে কথা সাজানো, —তাই না ?

মিথ্যে কথা ?

মিথ্যেই তো। মিথ্যে ছাড়া আর কী লিখবেন বলুন ? সত্যি সত্যি আমাদের কতোটুকু আপনি জানেন ? জানা সম্ভব ?

কানহাইয়ালালের সত্যি কথা দারুণ একটা ধাক্কার মতো মনে এসে বাজল। গুম হয়ে গেলাম। মুখ ফিরিয়ে নিলাম অন্য দিকে।

আমার হাঁটুটা আঙুল দিয়ে ছুঁল কানহাইয়ালাল। শান্ত গলায় বললে,—আমার কথাই ধরুন না,—সাত বছর আগে দুজনে কদিন পাশাপাশি হেঁটেছি,—সাত বছর পরে আবার হাঁটছি। হয়তো আবার সাত বছর পরে দেখা হবে। কী আপনি আমার জানেন বলুন তো ?

স্বীকার করলাম,—সত্যিই কী জানি, কতোটুকু জানি।

এবার ফোড়ং কাটল,—আর ধরুন আপনার সাধের চেরিল !

আমি হেসে ফেললাম,—সাধের চেরিল ?

সাধের চেরিলই তো,—যার পাশে ঐ নাথুরামকে বেশিবেশি ঘুরঘুর করতে দেখলে আপনার মুখ হাঁড়ি হয়ে যায়। মিষ্টি মেয়ে, চমৎকার মেয়ে, তায় আবার বিদেশী মেয়ে ! কী কথা তার জানি ?

তাকে নিয়ে কী আপনি লিখবেন মিথ্যে কথা না লিখে, কী আপনি বলবেন মিথ্যে কথা না বলে?

আমি একটু ভাবলাম।

খাঁটি কথা। চেরিলের কিছুই আমরা জানিনে। জানিনে কোথা থেকে সে এই দলে ঢুকেছে,—দল ভাঙলে আবার উধাও হয়ে যাবে কোথায়! তার রক্তমাংসের মূর্তিটাকে ঘিরে শুধু সোনালি পোশাক আর সোনালি কল্পনা।

কানহাইয়ালাল আবার বললে,—

নিজের কথাই ভাবুন না,—আপনিও কি কম অচেনা, কম বিচিত্র? আপনি তো এক পরমাশ্চর্য যাত্রী! কতো দূরের সেই বাংলাদেশ থেকে একলা এসেছেন, একটি বাঙালী নেই এমন দলে ভিড়ে বিচিত্র বস্ত্র পরে চলেছেন। আপনার দিকে তো হাঁ করে তাকিয়ে থাকবার কথা! কিন্তু বলুন তো, এতোদিনের মধ্যে কেউ আপনাকে জানতে চেয়েছে, আপনার খবরের জন্যে বিন্দুমাত্র আগ্রহ কেউ দেখিয়েছে?

কেউ না কানহাইয়ালাল।

মহারাজই ধরুন না! কোথায় আপনার বাড়ি, কেমন আপনার সংসারধর্ম, কী আপনার পেশা এ নিয়ে আপনাকে একটা কথাও জিজ্ঞাসা করেছেন?

একটা কথাও না।

সে জন্যে মনে মনে একটু অভিমান হয়েছে নাকি?

অভিমান? কার ওপর করব বলো? কে কার খোঁজ রাখে, কে কাকে ডেকে কথা বলে,—সবাই শুধু বিট্‌ঠল বিট্‌ঠল বলে পাগল!

আপনিও তাই হোন না দাদা। হাজার হাজার অচেনা লোক,—আপনিই বা কাকে চিনবেন? কার ভাবনা মিথ্যে করে ভাববেন? শুধু ভাবুন বিট্‌ঠলের কথা, পাগল হোন বিট্‌ঠলের নামে।

আমি চুপ করে রইলাম। সায়াহ্নের স্নিগ্ধ চক্রবাল, রুক্ষদর্শন কানহাইয়ালালের চোখে সূর্যাস্তের স্নিগ্ধ আভা।

একটু পরে বললাম,—

মুণ্ড মহারণ্যে দেখতাম তুমি রোজ সন্ধ্যাহ্নিক করতে। এখন তো আর করো না কানহাইয়ালাল?

স্নিগ্ধকণ্ঠে কানহাইয়ালাল বললে,—এ যাত্রায় ঐ রুটিনের চাকরিটাও ছেড়ে দিয়েছি দাদা। এখন শুধু আরতি দেখি। উঠুন, সময় হোলো।

ঠিক কুড়িদিন পদযাত্রার পর বারকরীর দল পান্ধারপুরে। সন্ধ্যেবেলা সূর্যাস্তের মুখে। যাত্রার শেষ শহরের সীমানায় জ্ঞানেশ্বর পাদুকা-মন্দিরে। সেই মন্দিরে জ্ঞানেশ্বর-পাদুকার সান্ধ্যবন্দনা, সেখানেই আলন্দীর বারকরী দলের অভ্যর্থনা ও রাতের বিশ্রাম। রাত কাটলেই বারকরীরা ভীমাস্নান করবে। তারপর পাদুকাকে মাথায় বহন করে নিয়ে যাবে বিট্‌ঠলমন্দিরে। এতোদিনের আয়াসের অবসান, ব্রতের সম্পূর্তি। সকলের মন কাণায় কাণায় পরিপূর্ণ।

আমিও কানহাইয়ালালের কথা রেখেছি। পথের ভাবনা নয়, ভাবনা নয় পথের সহযাত্রী নিয়ে,—ভাবনা শুধু বিট্‌ঠল। তিনিই পথের শেষ, তিনিই আকিঞ্চনের পরিপূর্ণতা।

পূর্ণচৈতন্যজী বললেন,—তুমিও ভাই আমাদের সঙ্গে এখানে থাকবে।

আমি মাথা নাড়লাম।

না মহারাজ, ঐটি মাপ করতে হবে। আপনাদের সঙ্গে এতোটা পথ এসেছি। পথের ধারে রাত কাটিয়েছি আপনাদের সান্নিধ্যে। সারা পথ আপনারা আমাকে আহার্য দিয়েছেন, আশ্রয় দিয়েছেন,—আপনাদের কাছ থেকে যা পেয়েছি, তার তুলনা নেই। কিন্তু আপনাদের কাছে আর আমি থাকব না।

কেন হে? কারণটা কী? অভিমান হোলো নাকি?

না মহারাজ, অভিমান নয়, অভিপ্রায়। আপনাদের পেছনে পেছনে হাঁটতে হাঁটতে কেবলই মনে হয়েছে আমি বারকরী নই, আপনাদের সহচর পথিক মাত্র। পথের শেষে যখন পৌঁছবো, তখন আমাকে পৃথক হতেই হবে।

সত্যি বলছ?

সত্যি মহারাজ। আমি ব্রতচারী নই, পথচারী মাত্র। তাই পথের প্রান্তে আমাকে বিদায় দিন।

তার মানে ভায়া? একেবার আমার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে এতোদিন পরে?

বলেন কী? আমি হেসে বললাম,—আপনার সঙ্গে রোজ দেখা হবে। এখানকার মঠে মন্দিরে যেখানে আপনি যাবেন পেছনে পেছনে আমি যাব, সকাল বিকেল আপনার পায়ে পায়ে ঘুরব। কেবল আপনার সঙ্গে থাকব না। এই জ্ঞানেশ্বর-মন্দিরে আমার থাকার কোনো অধিকার নেই।

কোথায় তুমি থাকবে?

কাছে পিঠে। পথিক যেখানে থাকে,—যাত্রীনিবাসে, ধর্মশালায়। তবে বারকরীদের জন্যে নির্দিষ্ট মন্দিরে নয় মঠে নয়।

চাতালের ধারে বসেছিল চেরিল। কুড়িদিনের যাত্রায় সে অনেকটা জীর্ণ হয়েছে। রোদে পোড়া তামাটে তার মুখ, মাথার চুল ধূলিধূসর জটপড়া। কোটরে ঢোকা নীল চোখ ক্লান্তিতে কালো। কাদামাখা কেডস্-এর ফিতে খুলছিল।

জুতো খোলা বন্ধ রেখে কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়াল। শ্রান্ত গলায় বললে,—তাহলে আমিও বিদায় নিই বাপ্পা?

ব্যাকুল চোখে তার দিকে তাকালেন পূর্ণচৈতন্য। মর্মাহত বাপের ক্ষুব্ধ স্বর ফুটে উঠল গলায়।

তুইও যাবি? তুই না আমার মেয়ে, গোদাবরীর তীরে কুড়িয়ে

পাওয়া মেয়ে? ভীমার তীরে পৌঁছতে না পৌঁছতে তুইও আমাকে ছেড়ে যাবি?

আমি বাধা দিলাম।

না, চেরিল যাবে কোথায়?

কিন্তু তোমার মতো আমিও তো বারকরী নই বাঙাল সখা!

না হলেই বা বারকরী? তুমি যে বারকরীর মেয়ে, বাপের আশ্রয় ছেড়ে তুমি যাবে কোথায়? বাপ মেয়েকে দেখবে। মেয়ে বাপকে দেখবে। সর্বদা তুমি থাকবে মহারাজের কাছে, মহারাজের পাশে পাশে।

আর তুমি?

শোনো কথা, তোমার সঙ্গে আমার সম্বন্ধ কী?

ঠিক, ঠিক,—তুড়ি বাজাল নাথুরাম।

তোমার সম্বন্ধ শুধু আমার সঙ্গে। মহারাজের একপাশে থাকবে তুমি, আর একপাশে থাকব আমি। বুঝেছ? আর যে যেখানে যায় যাক!

আমি নাথুরামের কাঁধে স্নেহের হাত রাখলাম। তারপর ঝুলিটা তুলে নিয়ে বার হয়ে এলাম রাস্তায়।

এক পা এগোতে না এগোতেই পিছুডাক।

দাঁড়ান দাদা দাঁড়ান,—আমিও আছি আপনার সঙ্গে।

বন্ধু কানহাইয়ালাল।

॥ ১৮ ॥

স্মরণীয় তিথি।

কার্তিকী শুক্লা একাদশী।

ভোর তখনো হয়নি। অন্ধকারে ইতিউতি সাড়া জেগেছে,—জীবনের আভাস লেগেছে জনপদে। অতিথিশালার বারান্দায় পাশে শুয়ে ঘুমচ্ছে কানহাইয়ালাল।

খুব ধকল গেছে তার কাল সন্ধ্যে থেকে। ওয়াখ্‌রি থেকে পান্ধারপুর, বারকরীযাত্রার শেষদিনের হাঁটা। এ হাঁটা সকলেই হেঁটেছি। তারপরও বিশ্রাম জোটেনি বেচারীর। যতো মন্দভারই হোক, আমার কম্বলে জড়ানো বিছানা-বাণ্ডিল সে কাঁধে বয়েছে শহরের মাঝামাঝি পর্যন্ত, সেখানে এক খাবারের দোকানে চা-জলখাবার দিয়ে আমাকে বসিয়ে রেখে খুঁজে খুঁজে বার করেছে এই অতিথিশালা। ঝাঁটা-বালতি জোগাড় করে নোংরা বারান্দা সে নিজে হাতে ধুয়েছে, কুয়ো থেকে জল তুলে এনেছে আমার স্নানের জন্যে। আবার বাজার ঘুরে সংগ্রহ করে এনেছে রাতের আহার্য।

রাত্তিরে কেমন ঘুমিয়েছে জানিনে। তাই তাকে আর ডাকিনি। চুপিচুপি বার হয়েছি রাস্তায়, পায়ে পায়ে গিয়েছি ভীমা নদীর তীরে। পুণ্যবারি মাথায় নিতে না নিতে পুণ্য মিলন,—পৈঠানের দেশপাণ্ডেজীর সঙ্গে।

পুণ্ডলিকের সমাধিমন্দিরে বসে দেশপাণ্ডেজী শোনালেন বিট্‌ঠলজীর আবির্ভাব কাহিনী। তারপর তাঁর পিছনে পিছনে এগোলাম। নদীতীরে পুণ্ডলিক-সমাধি ঘিরে আরো দুটি সমাধিমন্দির,—একটি পুণ্ডলিকের পিতার, আর একটি ভানুদাসের। সেগুলি দেখে বালি ভেঙে পৌঁছলাম পাথর-বাঁধানো মহাদ্বার ঘাটে।

ভরা শারদীয়া। নদীতে এখন অনেক জল। রাত শেষ হতে না হতে নৌকো ভেসেছে, রঙিন পালে শরৎ-প্রত্যূষের হাওয়া। জল অবশ্য ঘাটের সিঁড়ি ছুঁয়ে নেই,—মাঝখানে চওড়া বালুকাবেলা। নদী এখানে পূর্বগামিনী নয়,—চন্দ্রকলার মতো বাঁক, তাই আর এক নাম চন্দ্রভাগা। নদী চলেছে উত্তর থেকে দক্ষিণে,—পশ্চিমে জনপদ। ওপারে সূর্যোদয়।

ঘাটের পর ঘাট—প্রতিটি ঘাটে চওড়া চওড়া পাথরের সিঁড়ি। উদ্ধব ঘাট, হরিদাস ঘাট, কুম্ভার ঘাট, কাসার ঘাট, চন্দ্রভাগা ঘাট—আরো অনেক ঘাট। মাঝের ঘাটটি সবচেয়ে বড়ো। এটির নাম

মহাদ্বার ঘাট,—ঘাট বেয়ে উঠেই সোজা রাস্তা একেবারে বিট্‌ঠল-মন্দিরের মহাদ্বারে গিয়ে পৌঁছেছে।

কীর্তনদলের সঙ্গে সঙ্গে পৌঁছলাম বিট্‌ঠলনাথের পূর্ব মহাদ্বারে। দেশপাণ্ডেজী পেছন ফিরে তাকালেন।

দাঁড়ালে কেন বাঙালী ভাই,—মন্দিরে চলো?

আমি বললাম,—আপনি এগোন দেশপাণ্ডেজী। আমি একটু অপেক্ষা করব।

অপেক্ষা? অপেক্ষা আবার কার জন্যে?

বন্ধুর জন্যে। ভাববেন না—আবার দেখা হবে।

মহাদ্বারের দুপাশে ভীম প্রাচীর,—সেই প্রাচীর সারা মন্দির ঘিরে। চারদিক থেকে সরু সরু রাস্তা প্রাচীরের গায়ে আছড়ে পড়েছে। রাস্তার দুপাশে উঁচু উঁচু পাথরের পুরোনো বাড়ি। হাজারো বাড়ির উঁচু মাথা মান্দরকে আড়াল করে রেখেছে। দূর থেকে চোখে পড়ে না তার চূড়া। ঘিঞ্জি মহল্লা, পিলপিল মানুষ।

পান্ধারপুর একান্তভাবে তীর্থনগর, ব্যবসাবাণিজ্যের স্থান নয়। কাছে পিঠে কোনো বৃহৎ শিল্প নেই,—রেলস্টেশনে ভিড় নেই মালগাড়ির। হালের টুরিস্ট ম্যাপে এ জায়গার নাম ওঠেনি। বায়ু পরিবর্তন বা প্রকৃতির শোভাদর্শনের জন্যে এখানে কেউ আসে না। এখানে কোনো খানদানি হোটেল নেই। ঝলমলে সুপার-মার্কেট নেই।

বিট্‌ঠলতীর্থ বলেই পান্ধারপুরের আবেদন,—বিট্‌ঠলমন্দিরই প্রধান দর্শনীয়। তাছাড়া আরো অনেক মন্দির আছে, মঠ আছে, সাধুসন্তদের সমাধি আছে। ধনী ভক্তদের কটি প্রাচীন প্রাসাদও এখানকার গৌরব। পান্ধারপুরের চিহ্ন-করা তিথি শুক্লা একাদশী। শুক্লা একাদশীতে প্রচুর জনসমাগম হয়। তাছাড়া বছরে দুবার, আষাঢ়ের আর কার্তিকের শুক্লা একাদশীর দিন মহামেলা। তখন এখানে বারকরীদের মহামিলন। হাজার হাজার যাত্রীর সমাগম,

শুধু মহারাষ্ট্র নয়,—মহীশূর, অন্ধ্র, তামিলনাড়ু, কেরল সমস্ত দক্ষিণ ভারত থেকে,—মধ্য প্রদেশ থেকেও। শহরের সব ঘরবাড়ি, বিদ্যালয়, সরকারী আবাস, মঠ ও ধর্মশালায় তখন তিলধারণের ঠাঁই থাকে না। নদীতীরের বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে তাঁবু পড়ে। নগরপালিকা তার সীমিত সংগতি নিয়ে হিমসিম খায়।

দেবমন্দির ঘিরে সবচেয়ে পুরোনো মহল্লা। প্রাচীরের নিচে আর সরু সরু রাস্তার দুপাশে দোকানের জটলা। কিরানার দোকান, তৈজসপত্র আর কাপড়চোপড়ের দোকান, মনোহারি দোকান। তাছাড়া দেবপূজার প্রয়োজনীয় জিনিসের ঢালাই পসরা। ধূপদীপ কুমকুম আবীর-দর্পণ—নানা প্রকারের পূজার্ঘ্য। নানা রকমের মিষ্টান্ন আর ফল। দেবদেবীর মূর্তি ছবি আর ধর্মপুস্তক। রাস্তার সামনে শাদা কাপড় বিছিয়ে ফুলওয়ালী মেয়েরা বসে আছে,—মালা গাঁথছে, পাতার ঠোঙায় সাজাচ্ছে নির্মাল্যের ফুল।

সামনে মহাদ্বারের বিশাল সিঁড়ি। সেই সিঁড়ি বেয়ে নদী-তরঙ্গের মতো ভক্ত জনতা মহাদ্বার অতিক্রম করছে,—মন্দিরের মধ্যে ঢুকছে।

সেই জনতরঙ্গে আমি গা ভাসালাম না। আমার কোনো তাড়া নেই। গত তিন সপ্তাহ ধরে তাড়া ছিল,—সেই তাড়ায় প্রত্যূষ থেকে প্রদোষ পর্যন্ত রুটিন মেনে পথে হেঁটেছি। যদি পিছিয়ে পড়ি, যদি থেমে যাই, সর্বদা এই তাড়া। যদি দেরি হয়ে যায় প্রভুর সমীপে পৌঁছতে, এই ভয়। এবার প্রভু আমার হাতের মুঠোয়,—আর ভয় কী? ঐ মহাদ্বার পার হয়েই তাঁর মুখোমুখি হব,—আর ভাবনা কী? তিনি এবার অপেক্ষা করুন আমার জন্যে।

রাস্তার উল্টোদিকে একজোড়া দোকানের মাঝখানে ফুলন্ত একটা করবীগাছ। পাথর-বাঁধানো রাস্তার ফাটল ভেদ করে মাথা তুলেছে, ডালপালা ছড়িয়েছে, মেলেছে ঝিরঝিরে ছায়া। সেই ছায়ায় বসে অপেক্ষা করতে লাগলাম বন্ধুর জন্যে।

বন্ধু আসবেই,—এল বলে, সে এলে একসঙ্গে মন্দিরে ঢুকব। পাশাপাশি দাঁড়িয়ে বিট্‌ঠলবিগ্রহ দর্শন করব।

এই পান্ধারপুর জনপদের সূচনা কবে থেকে? কবে এখানে বিট্‌ঠলদেবের আবির্ভাব? কবে বিট্‌ঠলমন্দিরের ভিত্তিপ্রতিষ্ঠা? বন্ধু কামহাইয়ালালের প্রতীক্ষায় এই ভাবনা নিয়ে কালক্ষেপণ করা মন্দ নয়।

একদিকে হুনদের আক্রমণ আর অন্যদিকে অন্তর্বিপ্লব,—এই দুই চাপে গুপ্ত সাম্রাজ্যে যখন ভাঙন ধরেছে তখন বিন্ধ্য-নর্মদার দক্ষিণে এক নতুন শক্তির উদ্ভব হয়েছে,—সে শক্তির নাম রাষ্ট্রকূট। সেই শক্তি গোদাবরী-ভীমা ছাড়িয়ে দক্ষিণদিকে রাজ্যবিস্তার করছে। সে ষষ্ঠ শতাব্দীর গোড়ার ঘটনা। ভীমার তীরবর্তী অঞ্চল তখন গভীর অরণ্যঘেরা,—সেখানে অর্ধসভ্য আদিবাসীদের বাস। রাষ্ট্রকূট রাজারা এই অঞ্চল জয় করলেন, ব্রাহ্মণদের ভূমিদান করলেন, উচ্চবংশীয় লোকদের বসতির মাধ্যমে সভ্য সমাজের পত্তন করলেন। এই ঘটনার উল্লেখ ৫১৬ খ্রীষ্টাব্দের এক রাষ্ট্রকূট তাম্রলিপিতে। তাতে পান্ধারপুরের প্রথম উল্লেখ আমরা পাই। নাম তখন পাণ্ডুরঙ্গপল্লী।

কিছুকাল যেতে না যেতে দাক্ষিণাত্যে চালুক্য শক্তির উদয় হোলো। তারপর শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে দাক্ষিণাত্যের অধিকার নিয়ে রাষ্ট্রকূট আর চালুক্যদের মধ্যে লড়াই। জ্ঞানেগুণে শৌর্যেবীর্যে দুই রাজবংশই বিখ্যাত। আর দুইএরই রাজধানী ভীমাকৃষ্ণার মধ্যবর্তী উপত্যকায়। রাষ্ট্রকূটদের রাজধানী মান্যখেদ আর চালুক্যদের রাজধানী কল্যাণী একেবারে মুখোমুখি। দুই রাজধানীই পান্ধারপুর থেকে খুব বেশী দূরে নয়।

রাজায় রাজায় যুদ্ধ, তাতে প্রজার কী? প্রজারা জানে রাজা বদলালেও রাজবংশ বদলালেও তারা এক। সুখে এক দুঃখে এক,—সুখদুঃখ প্রকাশের ভাষায় এক। গোদাবরী থেকে কৃষ্ণা পর্যন্ত তখন

সর্বসাধারণের ভাষা কর্ণাটকী বা কন্নড। আর ভাষা যদি গোষ্ঠীর সংজ্ঞা নির্দেশ করে তাহলে গোষ্ঠীও কন্নড। রাষ্ট্রকূটদের প্রজারা কন্নড, চালুক্যদের প্রজারাও কন্নড। রাষ্ট্রকূটদের সৈন্যরা কন্নড, চালুক্যদের সৈন্যরাও কন্নড। যে রাজাই যখন জিতুক কন্নডে কন্নডে লড়াই।

দ্বাদশ শতাব্দীর শেষে এক নতুন অধ্যায়ের শুরু। অনেক আগেই রাষ্ট্রকূটরা মুছে গিয়েছিল,—এবার দুদিক থেকে দুই নতুন শক্তির চাপে চালুক্যরাও ধূলিসাৎ হোলো,—দুভাগ হয়ে গেল চালুক্য সাম্রাজ্য। দক্ষিণে কর্ণাটক অঞ্চলে কায়েম হোলো হয়শাল বংশ—আর উত্তরাংশে প্রতিষ্ঠিত হোলো যাদব বংশ। যাদব রাজধানী দেবগিরি। যাদবরাই মহারাষ্ট্রের নিজস্ব রাজবংশ, দেবগিরি মহারাষ্ট্রের প্রথম রাজধানী। রাজভাষা সংস্কৃত নয় কন্নডও নয়,—স্থানীয় অধিবাসীদের মুখের ভাষা—মারাঠী ভাষা। রাজানুকূল্যে এই ভাষা সাহিত্যের মাধ্যম, প্রজার আগ্রহে এই ভাষা জাতীয়তার উৎস। মারাঠী ভাষা, মারাঠা জাতি আর মহারাষ্ট্র দেশ,—এই ত্রিধারার সূচনা যাদবযুগে,—ত্রয়োদশ শতাব্দীতে। সেই যুগেই পাণ্ঢারপুরের জাগৃতি।

মহারাষ্ট্রের লোকদেবতা বিট্‌ঠলদেবের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন যাদব রাজারা,—প্রথম রাজা ভিল্লম থেকে শেষ রাজা রামচন্দ্রদেব পর্যন্ত। যাদব রাজবংশের সূচনা ১১৮৭ খৃষ্টাব্দে। তার কয়েক বছরের মধ্যেই রাজা ভিল্লম পাণ্ঢারপুরে বিট্‌ঠলের আদি মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছেন। ত্রয়োদশ শতকের শুরুতেই পুণ্ডলিকক্ষেত্র বলে পাণ্ঢারপুরের প্রসিদ্ধি।

যাদববংশের শ্রেষ্ঠ রাজা রামচন্দ্রদেবের আমলে পাণ্ঢারপুরের খ্যাতি দিক্‌বিদিকে ছড়িয়ে গেল। রামচন্দ্রের ইষ্টদেবতা ছিলেন বিট্‌ঠলজী। তিনি বারে বারে সাড়ম্বর শোভাযাত্রা করে পাণ্ঢারপুরে এসেছেন, ইষ্টদেবতাকে দর্শন করে তাঁর পূজা দিয়েছেন। তাঁর

মহামন্ত্রী হেমাদ্রি বিট্‌ঠলমন্দিরকে বিশাল করে গড়েছেন,—আকাশ ছুঁয়েছে মন্দিরের চূড়া। হেমাদ্রি তাঁর চতুর্বর্গচিন্তামণি গ্রন্থে পান্ধারপুরের কথা সবিস্তারে লিখেছেন। রামচন্দ্রের রাজত্বকালেই জ্ঞানেশ্বরজীর আবির্ভাব আর পান্ধারপুরে নামদেবের সঙ্গে তাঁর মিলন। নামদেবকে ঘিরে পান্ধারপুরে বিট্‌ঠল সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা আর দেশবিদেশে ঘুরে ঘুরে তাঁর বিট্‌ঠল-মহিমা প্রচার। সেইসঙ্গে পান্ধারপুরের অভিমুখে বারকরী স্রোতের জোয়ার।

চতুর্দশ শতকের শুরুতে দাক্ষিণাত্যে তুর্কী-মুসলমান শাসনের শুরু। মালিক কাফুর যাদবরাজ্য জয় করলেও পান্ধারপুর তাঁর নজরে আসেনি। নজর পড়ল সুলতান মহম্মদ তুঘলকের। হিন্দুমন্দির ধ্বংস করা তাঁর ধর্মকর্তব্য। দিল্লী থেকে দেবগিরিতে সাময়িকভাবে রাজধানী সরাবার পর তাঁর প্রথম কাজই হোলো পান্ধারপুর ধ্বংস করা। হেমাদ্রি প্রতিষ্ঠিত বিশাল মন্দির তিনি চূর্ণবিচূর্ণ করে দিলেন। বিট্‌ঠল-বিগ্রহ আশ্রয় পেল পূজারীগৃহের গোপন কক্ষে।

সেই রামরাবণ আর কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ থেকে শুরু করে ভারতবর্ষে যুদ্ধবিগ্রহ কম হয়নি। সাম্রাজ্যের পর সাম্রাজ্য গড়ে উঠেছে যুদ্ধজয়ের মধ্য দিয়ে। আবার যুদ্ধবিগ্রহেই সেইসব সাম্রাজ্য ধূলিসাৎ হয়েছে। ভারতবর্ষ তিনটি বিশাল ধর্মের জন্মভূমি,—প্রতি ধর্মের আবার কতো শাখা-প্রশাখা। হিন্দু ভারতে রাজায় রাজায় অসংখ্য যুদ্ধ হয়েছে, কিন্তু ধর্মের নামে কখনো রক্তপাত হয়নি।

হিন্দুকুশের ওপার থেকে বিদেশী অভিযানও কম হয়নি। কতো বিদেশী বিধর্মী দলে দলে এসেছে। তারা যুদ্ধ করেছে লুট করেছে রাজ্যস্থাপন করেছে। তুর্কী-মোগলরাও তাই করেছে। তবে তাদের একটা বিশেষত্ব আছে। ধর্মান্ধতা নিয়ে আর কোনো অভিযাত্রী ভারতবর্ষে আসেনি, ধর্মান্ধতা দিয়ে ভারত-সংস্কৃতিকে কলুষিত করেনি। ভারতের ধর্মমন্দিরকে ধর্মের নামে ধ্বংস করা, ভারতের নারীত্বকে ধর্মের নামে লাঞ্ছিত করা, ভারতের অধিবাসীকে তরবারির

মুখে ধর্মচ্যুত করা আর পরধর্মবিশ্বাসের অপরাধে প্রজাপীড়ন করা—এ কেবল তুর্কী-মোগল শাসকরাই করেছে,—আর কেউ করেনি। যবন শক কুশান হুন,—বিদেশাগত প্রত্যেক জাতিই ভারতের সঙ্গে একীভূত হয়ে তার সভ্যতা আর সংস্কৃতিকে উদারতর ও বিচিত্রতর করেছে। আর ভারতে প্রথম তুর্কী অভিযাত্রী সুলতান মামুদ ধর্মের নামে ধ্বংস করেছেন সোমনাথের মন্দির।

সেই ভাগ্য পান্ধারপুরের কপালে নেমে এল তুঘলকী শাসনের অনুগ্রহে। পান্ধারপুর অন্ধকারে ডুবে গেল। সেই অন্ধকারে জেগে রইলেন নামদেব। যাদবরাজ্য থাকতে থাকতেই জ্ঞানেশ্বর সমাধিলাভ করেছেন। তারপর নামদেবের সঙ্গীরা একে একে দেহরক্ষা করেছেন,—গোরা, বিসোবা, নরহরি, সাঁওতা, চোখা,—কেউ আর নেই। শুধু দীর্ঘজীবী নামদেব বেঁচে আছেন ভাঙা মন্দিরের পাশে একটি বিষণ্ণ কুটীরে। অবসন্ন গলায় ভয়ার্ত ভক্তদের ডেকে ডেকে বলছেন,—

পান্ধারপুর ধ্বংস হয়েছে,—তাতে কী? পান্ধারীনাথ তো আছেন। আবার মন্দির গড়ো, আবার তাঁকে প্রতিষ্ঠা করো।

তারপর তিনশো বছর ধরে মারাঠী জীবনাদর্শ আর জাতীয়তাবোধের স্বপ্ন নিহিত থেকেছে পান্ধারপুরের মাটিতে। বিধর্মী মুসলমান বিজেতার কাছে নিরুপায় আত্মসমর্পণ করেও মহারাষ্ট্রবাসীরা পান্ধারপুর তীর্থকে মনে রেখেছে ধ্রুবতারার মতো,—সেই ধ্রুবতারার আলোয় তারা স্বধর্ম আর স্বাজাত্যবোধের প্রেরণা লাভ করেছে।

বাহমনি সুলতানদেরও পান্ধারপুরকে সুনজরে দেখবার কোনো কারণ ছিল না। প্রকৃতপক্ষে দাক্ষিণাত্যে বাহমনি যুগের ইতিহাস পান্ধারপুরের চরম দুঃসময়ের ইতিহাস।

বাহমনি সুলতানদের রাজধানী প্রথমে ছিল গুলবর্গায় পরে বিদরে—পান্ধারপুর হাতের মুঠোয়। শোষিত হিন্দু প্রজার অন্তরের রাজাধিরাজ বিদরের সুলতান নয়,—পান্ধারীনাথ। রাজধানী বিদর নয়,—পান্ধারপুর। সেই রাজাকে ধ্বংস করতে হবে, ছারখার করতে হবে

সেই রাজধানী। তাই বারে বারে পান্ধারপুর আক্রান্ত হয়েছে, বিট্ঠলমন্দির চুরমার হয়েছে। বারে বারে বিট্ঠলপ্রভু ভাঙা মন্দির থেকে অন্তর্ধান করে আশ্রয় নিয়েছেন নিভৃত ভক্তগৃহে। আবার মন্দির গড়েছে ভক্তরা, আবার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে প্রভুর নিকেতন।

দুঃখলাঞ্ছনার শেষ নেই পান্ধারপুরবাসীদের। তারা যুদ্ধ করতে পারে না, প্রতিরোধ করতে পারে না। তারা দেবপূজারী মাত্র। তুচ্ছ কারণে তাদের ওপর হামলা হয়, তাদের ধনসম্পত্তি লুঠ হয়, আর সেই সঙ্গে অজন্মায় আর দুর্ভিক্ষে ছারখার হয়ে যায় দেশ। তারা ঘর ছেড়ে ভাঙা মন্দিরে এসে বসে থাকে,—অসহায় দেবতার কাছে আকুল প্রার্থনা জানায় অসহায় ভক্তের দল।

নামদেব দেহরক্ষা করেছেন। তবু তাঁর স্মৃতি লোকে ভোলেনি। তাঁর সমমরমীদের কেউই আর জীবিত নেই। কোনো কবি আর নতুন করে অভঙ্গগান রচনা করে না। তবু বিট্ঠলের নাম মনের দিগন্তে ভাসে। দেশের নানাদিক থেকে বারকরীরা পান্ধারপুরে আসে,—উৎসব করে না, আকাশে ছড়ায় না উদার অভঙ্গগীতি,—চুপিচুপি বিট্ঠলপ্রভুর পুজো দিয়ে যায়।

ভীমা-চন্দ্রভাগার তীরে
পাণ্ডুপুরে ভাই,—
পুণ্ডলিকের প্রাণের ঠাকুর
ঐ নিয়েছেন ঠাঁই।
পান্ধারপুর মহান্ তীর্থ
তুলনা তার নাই,—
বিট্‌বিহারী প্রভুর লাগি
সেথায় আমি ধাই।
সব ছেড়েছি সব ফেলেছি
ভাসিয়েছি মোর তরী।

পালের হাওয়ায় উড়িয়েছি মোর
উদাসী উত্তরী।
ঘাটে ঘাটে জোয়ারভাঁটায়
সন্তচরণ স্মরি,—
জয় জয় রামকৃষ্ণ ঠাকুর,
জয় বিট্‌ঠল হরি॥

গানের ধমকে চমক ভাঙল। শুধু তাকালাম না, ছটফটিয়ে উঠলাম।

কিন্তু এ তো গান নয়,—গর্জন, মহাগর্জন। তুমুল কোলাহল। লড়াই বেধেছে নাকি কোথাও? সেই জন্যে যুদ্ধনিনাদ আর তূর্যধ্বনি? রাস্তার ব্যাপারীরা তাড়াতাড়ি তাদের পশরা গুটোচ্ছে। ফুলওয়ালীরা ধড়ফড়িয়ে সরে যাচ্ছে একধারে।

হাঁটা নয়, নাচ। নাচ নয়, দৌড়। সেই সঙ্গে সমস্বরে চিৎকার। চিৎকার মানে ঝগড়া নয়, আর্তনাদ নয়, উত্তেজিত উদ্‌বেলিত জয়ধ্বনি,—জয় জয় রামকৃষ্ণ ঠাকুর জয় বিট্‌ঠল হরি!

কারা ওরা ছুটে ছুটে আসছে? কারা দল পাকিয়েছে? দূর থেকে চেহারার ঝলক দেখেই আর গানের গর্জন শুনেই বুঝতে পেরেছি ওরা বারকরী নয়। পরণে হাঁটু-অবধি-তোলা হলুদ ধুতি আর হাতকাটা লাল পিরাণ, কপালে চওড়া লাল ফেটি, গলায় লাল-হলুদ কাঁচ-পাথরের মালা। হাতে লোহার বালা। মোটা রশি দিয়ে কোমরের কাছে ঝোলানো দিশী ঢোলক, কারো হাতে চাকাচাকা টিনের করতাল। মেয়েও আছে দলে। তাদের পরণে গাঢ় রঙের রঙিন খাটো শাড়ি-ঘাঘরা, বুকে টাইট চোলি, পায়ে মোটা খাড়ু, কানে চাকা মাকড়ি, হাতে ভারি কঙ্কন আর সিঁথির চুলে ছিলেকাটা কুণ্ডল।

মেয়েমদ্দার কালো কুচকুচে রঙ, কোঁকড়ানো চুল, গাঁট্টাগোট্টা চেহারা। প্রচণ্ড চিৎকারে আকাশ ফাটিয়ে হাঁকছে বিট্‌ঠলের নাম,

প্রচণ্ড বিক্রমে দ্রুতিতালে পিঠছে ঢোল আর ঝাঁঝর। পাগলের মতো হাত-পা ছুড়ছে, বনবন চোখ ঘোরাচ্ছে,—তুড়িলাফ মেরে মেরে এগিয়ে আসছে। লোকজন লাফিয়ে লাফিয়ে সরে পথ করে দিচ্ছে।

মন্দিরদ্বারের সামনে রাস্তা পেরিয়ে ছোট একটি বাঁধানো চাতাল। শাদা পাথরের মেঝে, সামনে শাদা পাথরের একটি ফলক। সেই চাতাল ঘিরে লোকগুলি দাঁড়াল,—বনবনিয়ে নাচতে লাগল, গান করতে লাগল হাঁকডাকিয়ে। ফুলওয়ালীদের কাছে পয়সা ছুড়ে ছুড়ে খাবলে খাবলে টেনে নিল ফুল আর মালা, ফুলের অর্ঘ্যে সারা চাতাল ভরে দিল।

ভিড়ের মধ্যে থেকে আমার ডানহাতটা খপ্ করে ধরল কে,— টেনে নিল হিড়হিড়িয়ে,—

নাচুন দাদা নাচুন, গলা মেলান গানে!

কানহাইয়ালাল! বন্ধু দেখে তাজ্জব হয়ে গেলাম। ভূতের দলে ভূত হয়ে বাউরা নাচ নাচছে। কোলাহল ছাপিয়ে ষাঁড়ের মতো গলা করে আবার চেঁচিয়ে উঠল,—

আরে গলা ছাড়ুন না দাদা। হ্যাঁ বলুন,—জয় জয় রামকৃষ্ণ ঠাকুর জয় বিট্‌ঠল হরি!

নাচগানের শেষে চাতালে মাথা ঠুকল দলের সবাই। তারপর তেমনি দাপাতে দাপাতে সিঁড়ির এককোণ বেয়ে উঠে অদৃশ্য হয়ে গেল মন্দিরের মধ্যে। ক-মিনিটের মধ্যে কী একটা কাণ্ড যেন হয়ে গেল!

কানহাইয়ালাল আকর্ণবিস্তৃত হাসি হাসছে। হাতের তেলোয় মুখের ঘাম মুছে বুক ফুলিয়ে বললে,—কেমন হোলো বলুন তো দাদা? এতোদিন রোজ নামকীর্তন করেছি আর হটর-হটর হেঁটেছি, —আর আজ? কীর্তন নেই, নাচ নেই, হাঁটা নেই, সব খালিখালি, সব ফাঁকা। ভালো লাগে? দেখুন তো,—হাঁটা হোলো, গান হোলো, নাচও হোলো—আঃ!

এরা সব কারা কানহাইয়ালাল ?

ফোঁসফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলছিল। বললে,—এরা ? এরা সব মেথর ধাঙড়,—ময়লা ফেলে, রাস্তা ঝাঁট দেয়, মরা গরুমোষের সৎকার করে। বিলকুল হরিজন সব !

তুমি এদের পেলে কোথায় ?

মঙ্গলবেড় থেকে এসেছে,—আমাদের অতিথিশালার সামনের মাঠে রাত কাটিয়েছে কাল। চোখে পড়েনি ? আমি সন্ধ্যেবেলা টুক্ করে একটু জমিয়ে নিয়েছিলাম। আজ পথে পেয়ে আমিও সঙ্গে ভিড়ে গেলাম।

আবার হাত ধরে টানল কানহাইয়ালাল।

দেখলেন না মাথা ঠেকাল কোথায় ? আসুন, আমরাও কপাল ঠুকি।

মন্দিরে এখনো ঢুকিনি, শ্রীভগবান বিট্‌ঠলদেব পাণ্ডুরঙ্গজীকে দর্শন এখনো করিনি। প্রণাম রাখিনি তাঁর পাদমূলে। তার আগে রাস্তার ধারে কাঁচা ড্রেনের পাশে কোথায় আমি মাথা ছোঁয়ালাম ? কার সমাধিতে ?

শিলাপট্টে লেখা আছে নাম—চোখামেলা।

জাতে সে মহার, চণ্ডালের চেয়েও নীচ। তাকে প্রণাম করেই তো বিট্‌ঠল-সকাশে যেতে হবে। তাকে জানলেই সমাধান হবে বিট্‌ঠল-রহস্য।

চোখামেলার সমাধিচত্বর ফুলে ফুলে ভরা। অচ্ছুত চণ্ডালদের ঘৃণ্য হাতের অঞ্জলি, স্বর্গের পারিজাতের চেয়ে পবিত্র।

সযত্নে কটি ফুল একপাশে সরিয়ে চাতালের এককোণে বসলাম।

কানহাইয়ালাল বললে,—আমার জন্যে অপেক্ষা করছিলেন বুঝি দাদা ? তাহলে আর বসা কেন ? চলুন মন্দিরে যাই !

আমি বললাম,—না, পাশে এসে বোসো। আরো একটু অপেক্ষা করতে হবে।

কেন ?

জ্ঞানেশ্বরজীর দলে আমরা এসেছি। জ্ঞানেশ্বরের পূজা আসুক —তার পেছনে পেছনে আমরা ঢুকব।

॥ ১৯ ॥

ব্রাহ্মণদের দুর্গদ্বার পৈঠানে যতো অটল হোক, পান্ধারপুরে সে অর্গল শিথিল করেছেন জ্ঞানেশ্বর আর নামদেব। যে মন্দিরে বিট্‌ঠলপূজা, সেই মন্দিরেই বিট্‌ঠল সম্প্রদায়ের নামগান। নামগানে আছেন স্বর্ণকার নরহরি, কুম্ভকার গোরা, মালাকার সাঁওতা, দাসী জনাবাঈ। তাঁরা সবাই পেয়েছেন দেবদর্শনের অধিকার, সকলেরই মিটেছে দেবদর্শনের আকাঙ্ক্ষা।

শুধু মন্দিরের বহির্দ্বারে পথের ধূলায় বসে আছে একজন,—নাম তার চোখামেলা।

চোখা অচ্ছুত। জাতে সে মহার। নীচতম ঘৃণ্যতম সমাজের মানুষ। মঙ্গলবেড় গ্রামের এক প্রান্তে এক দীন কুটীরে সে থাকে। মৃতজন্তুর সংকার করা তার কাজ। কেউ তার কাছে আসে না, কেউ তাকে ছোঁয় না। তার ছায়া লাগলে প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়।

কিন্তু সেই চোখার কানে ডাক দিয়েছেন প্রভু। হাত রেখেছেন বুকে। সেই ডাক বারে বারে মর্মে বাজে, সে স্পর্শে অন্তর বিভোল। ছুটে ছুটে সে আসে পান্ধারপুরে, মন্দিরের পূর্বদ্বারের সামনে পৌঁছয়। কিন্তু মন্দিরে ঢোকবার তার অধিকার নেই,—দেবতার বিগ্রহদর্শন তার ভাগ্যে নেই।

পথের ধুলোয় সে লুটোপুটি খায়,—হাসে কাঁদে, নামগান করে। দুচোখের ধারায় মাটি ভিজিয়ে বলে,—প্রভু তোমার দেখা কি পাব না ? কখনো পাগলের মতো হেসে ওঠে,—মন্দিরে তুমি আছ কি

না আছ, আমার রয়েই গেল ঠাকুর! বুকের মধ্যে যে তোমাকে বন্দী করেছি।

চোখের জল শুকোয়। অট্টহাস্য থামে। ছটফটানি বন্ধ হয় শান্ত হয়ে হাতজোড় করে বলতে থাকে,—

ঠাকুর,—
রাজার গড়া মন্দিরেতে
আছ পাথর হয়ে,
পাথর-গড়া মূর্তি তোমার
রাজার মতো সাজ।
সে মন্দিরে প্রবেশ নাহি
অছুত দেহ লয়ে,—
চর্মচক্ষে দেখা না দাও
হে রাজাধিরাজ॥
তাইতো আমার দেহের ভিতে
গড়েছি মন্দির,—
হৃদয়পদ্মে পেতেছি মোর
তোমার সিংহাসন,—
সেই আসনে আছ তুমি
অটল হয়ে স্থির,—
মর্মমাঝে হেরি তোমায়
ধ্যানে নিমগন॥

কখনো হাসি, কখনো কান্না, কখনো আত্মবিলাপ, কখনো গান। পুরোহিতরা তাকে অপমান করে, দূর থেকে থুথু দেয় তার গায়ে। লোকে তাকে পাগল বলে, নিষ্ঠুর ঠাট্টা করে।

হ্যাঁরে পাগলা, সারাক্ষণ বিট্‌ঠল বিট্‌ঠল করিস্,—বিট্‌ঠল তোর কে রে?

জানো না? বিট্‌ঠল আমার বাপ, বিট্‌ঠল আমার মা।

বললেই হোলো? বাপ-মার ঘরে ছেলের ঠাঁই নেই? ছেলের মুখদর্শন করে না বাপ-মা? বাপের ঘরে নিত্য ভোজ,—ছেলের একটা পাত পড়ে না সেখানে? আসলে তুই কী জানিস?

জানিনে। তোমরা জানো, আমি কী?

তুই একটা কুকুর। গেরস্থঘরে কুকুর ঢোকে? কুকুরে মুখ দেয় গেরস্তর হাঁড়িতে?

তাই মন্দিরদ্বারে ঘুরঘুর করলে ওরা লাঠি হাতে তাড়া লাগায়, যেমন লাগায় কুকুরকে। কুকুরেরও অধম চোখা।

সেই কুকুরেরই মতো একদিন সে শুয়ে আছে মন্দিরের বন্ধ দরজার সামনে। গভীর রাত তখন, সকলের চোখে নিদ্রা। চোখারও চোখ তন্দ্রাচ্ছন্ন,—শুধু ঠোঁটদুটি নড়ছে, বিড়বিড় করে জপ করছে প্রভুর নাম।

হঠাৎ কার অমোঘ স্পর্শ লাগল তার বুকে? কে তাকে ডাকল, —এস এস প্রিয় ভক্ত আমার! মুক্ত দ্বার দিয়ে মন্দিরের মধ্যে সে ঢুকল। অন্ধকার গর্ভগৃহ আলোয় আলো, তার ম্লান চোখের সামনে পরমধন বিট্‌ঠলদেবের করুণাঘন মূর্তি! আকুল আগ্রহে দেবতার পাদস্পর্শ করল অস্পৃশ্য চোখা।

ভোরবেলা পুরোহিতরা মন্দিরের বন্ধ দ্বার খুলে ভেতরে এসে দেখল দেববিগ্রহের সামনে চোখামেলা বসে আছে। নিস্পন্দ সমাধিস্থ তার দেহ।

এ কী কাণ্ড! কী সর্বনাশ? তুই কোথা থেকে এলি? কোন্ ফাঁক দিয়ে ঢুকলি? অ্যাঁ? ব্যাটা, সারা মন্দির যে তুই অপবিত্র করেছিস! এখন তোকে ছুঁলেই বা আর ক্ষতি কী?

ছুঁল। কিল ঘুসি বাগিয়ে ছুঁল তাকে। প্রচণ্ড মার মেরে অচৈতন্য অপবিত্র দেহটাকে রাস্তার ওপর ছুড়ে ফেলে দিল।

একটু পরে জ্ঞান ফিরল চোখার। অপবিত্র সে,—অপবিত্র করেছে প্রভুকে, অপবিত্র করেছে প্রভুর গৃহ। টলতে টলতে চোখা চলল

নদীর তীরে। ওপারে পূর্বদিগন্তে তখন বালার্কবিভা। দুচোখ তুলে প্রত্যূষ-জ্যোতির দিকে তাকিয়ে বললে,—হে পাপঘ্ন পিতা, কুষ্ঠরোগীর গায়ে তোমার আলোর ছটা এসে হাত বুলোয়,—তাতে তুমি কি অপবিত্র হও?

নদীর দিকে তাকিয়ে বললে,—হে পিযূষবাহিনী মাতা, তোমার জলে পতিতা বারাঙ্গনা এসে স্নান করে,—তাতে তুমি কি অপবিত্র হও?

এদিকে পুরোহিতরা মন্দির-মার্জনায় রত হয়েছেন। অপবিত্র মন্দির, অপবিত্র বিগ্রহ সব ধুয়ে মুছে পবিত্র করতে হবে। পাঠ করতে হবে প্রায়শ্চিত্তের মন্ত্র। হঠাৎ দেববিগ্রহের দিকে তাকিয়ে প্রধান পুরোহিত চমকে উঠলেন।

কষ্টিপাথরের বিট্‌ঠলমূর্তি,—কোমরে হাত দিয়ে ইষ্টকের ওপর দণ্ডায়মান। কবাটবক্ষ,—গলায় রত্নহার, শিরে উন্নত মুকুট। কিন্তু ঠিক বুকের ওপর শাদা শুকনো একটা জন্তুর হাড়।

ছি ছি ছি! পাগল হয়ে পুরোহিত হাত বাড়ালেন। সেই অপবিত্র অস্থিখণ্ড দেব-অঙ্গ থেকে কিছুতেই ছাড়াতে পারলেন না। কতো চেষ্টা করলেন পুরোহিতের পর পুরোহিত। দেবতার বুকে সেই ঘৃণ্য হাড় বজ্রকঠোর হয়ে আটকে রইল। সব চেষ্টা ব্যর্থ হোলো।

দিন কাটল, আবার ঘনিয়ে এল রাত।

দেবতার না হোলো পূজা, না হোলো ভোগ, না হোলো আরতি। পূজারী আর পূজার্থী সবাই মিলে পড়ে রইল গর্ভগৃহের মুখে।

স্বপ্নাদেশ দিলেন বিট্‌ঠলদেব।

বললেন,—যার কাজ তারই সাজে। এ কাজ তোমাদের নয়। ডাকো ঐ মহার চোখামেলাকে। মৃত জন্তুর হাড় সরাতে সেই পারে, —সেই পারবে। সে আমার পবিত্রতম ভক্ত—সে যদি আমার বক্ষ স্পর্শ করে তবেই আমি পবিত্র হব।

সর্বতীর্থ পরিক্রমা সাঙ্গ করে নামদেব ফিরে এসেছেন পাণ্ধারপুরে। সপ্তনদীতে তিনি স্নান করেছেন,—শ্রেষ্ঠা নদী ভীমা-চন্দ্রভাগা। সপ্তপুরী তিনি দর্শন করেছেন,—শ্রেষ্ঠ পুরী পান্ধারপুরী।

সারা জনপদ ভিড় করেছে নামদেবকে দর্শন করতে। নামদেব যেমন বিট্ঠল-বিরহে কাতর ভক্তজনও তেমনি কাতর নামদেব-বিরহে। এতদিন পরে বিট্ঠল-মুখের দিকে চোখ পড়তেই নামদেব মূর্ছিত হয়ে পড়লেন। প্রিয় নামই এ মূর্ছার ওষধি,—তাই ভক্তজন নামদেবের নিস্পন্দ দেহ ঘিরে গান করতে লাগল,—

জয় জয় বিট্ঠল রামকৃষ্ণ হরি!

মূর্ছা ভঙ্গ হোলো। মুদিত নয়ন উন্মোচিত হোলো। নামদেব বিট্ঠলমুখ দর্শন করলেন। নয়ন থেকে প্রেমাশ্রু বিদরিত হোলো। তারপর চারদিকে তাকালেন। প্রিয় বন্ধুদের দেখলেন। প্রসন্ন হাসিতে বদন বিকশিত হোলো।

এবার শেষ ব্রতপালনে তীর্থ সম্পূর্ণ হবে। সেই মানস সর্বসমক্ষে প্রকাশ করলেন নামদেব।

তিনি বিট্ঠলদেবের পূর্ণাঙ্গ পূজা দেবেন। স্নান, বেশ, পূজা, ভোগ, আরতি। নামদেবেব সঙ্কল্পিত পূজায় নিযুক্ত হতে আপত্তি করবে কোন্ পুরোহিত? নামদেবের আরো মনোবাঞ্ছা। মন্দিরে ভক্তসম্মিলন,—শুধু পাশাপাশি দাঁড়িয়ে একসঙ্গে নামগান নয়—পাশাপাশি বসে একসঙ্গে প্রভুর প্রসাদ গ্রহণ। ব্রাহ্মণরা দান-দক্ষিণাও পাবেন,—সে আমন্ত্রণকে উপেক্ষা করবে কোন্ মূর্খ?

সেদিন ভোর থেকে সাড়া পড়ে গেছে বিট্ঠলমন্দিরে। শেষরাত্রে কর্ণানাদ শুনে পুরোহিত ও সেবকদের ঘুম ভেঙেছে, কাকদারতির আলোয় প্রভু জাগ্রত হয়েছেন। প্রভাত থেকেই মন্দিরে জনসমাগম, এসেছে সব সম্প্রদায়ের লোক, ব্রাহ্মণ আর অব্রাহ্মণ। রাজকর্মচারী শ্রেষ্ঠী বণিক পণ্যব্যবসায়ী। তাছাড়া এসেছে যতো রকমের কর্মকার। নামদেব পৈত্রিক পেশায় দরজি, কর্মীসম্প্রদায়ের সকলের সঙ্গে তাঁর

যোগ। তাঁর মিত্র গোপ আর কিষাণ, ঘরামী আর মালী, নাপিত আর রজক। শুধু মিত্রই নয়, মরমী ভক্ত,—বিট্‌ঠলভক্তিতে তাঁর সঙ্গে এক মন এক প্রাণ।

দেবসেবা নানা প্রকরণে ভাগ করা। ভিন্ন ভিন্ন কাজের ভিন্ন ভিন্ন অধিকারী। কেউ করে পূজা, কেউ করায় স্নান, কেউ দেবতাকে আবরণে-আভরণে সাজায়। কেউ করে গৃহমার্জনা, কেউ গাঁথে মালা, কেউ ধূপদীপ দিয়ে রচনা করে আরতি। কেউ পাতে শয্যা আর কারো ওপর ভোগপ্রসাদের দায়িত্ব। সকলেই বিট্‌ঠলের সেবক। আর যারা শুধু নাটমন্দিরে বসে মৃদঙ্গ-মন্দিরা বাজায়, ক্ষণে ক্ষণে নাচে ক্ষণে ক্ষণে গায়, তারাও সেবক। আজ মন্দিরে সব সেবক আর সব ভক্তের উপস্থিতি।

পঞ্চামৃত স্নানের পর বিগ্রহ আবার নব আভরণে সজ্জিত হয়েছেন। নবচন্দনে ভূষিত তাঁর ললাট, গলায় নতুন কুসুমমাল্য। গর্ভগৃহে থরে থরে ভোগ সাজানো হয়েছে। মল্লিকা ফুলের মতো শুভ্র সুরভিত ঘৃতপক্ক তণ্ডুল, স্বর্ণবর্ণ সম্বরামোদিত ডাল, মসলা-সুগন্ধি ব্যঞ্জন, আম্র-তিন্তিড়ীর অম্ল, সুমিষ্ট দধি, ঘন দুগ্ধের ক্ষীর। নানা প্রকারের মিষ্টান্ন।

গর্ভগৃহের দ্বার রুদ্ধ হোলো। ভিতরে কেবল প্রধান পুরোহিত। সুপ্রযুক্ত মন্ত্রসহকারে দেবতাকে মহানৈবেদ্য নিবেদন করা হবে। লোকচক্ষুর আড়ালে সে নৈবেদ্য গ্রহণ করে পরিতৃপ্ত হবেন দেবতা। তারপর প্রসাদ পাবে জনতা।

হঠাৎ রুদ্ধ দ্বার দড়াম করে খুলল। পুরোহিত ছুটে বার হয়ে এলেন। আর্তনাদ করে বসে পড়লেন নাটমন্দিরের মাটিতে।

কী হোলো? কী হোলো?

হোলো সর্বনাশ! গর্ভগৃহে দেবতা নেই। নামদেবের রাজকীয় নৈবেদ্য অবহেলা করে প্রভু অন্তর্ধান করেছেন মন্দির থেকে। শুধু তাঁর গুণহীন মৃত মর্মরমূর্তি পড়ে আছে।

ব্যর্থ হয়েছে ব্রত। নামদেব স্তব্ধ হয়ে ভাবলেন। মুখ তাঁর পাংশু নয়, চোখে তাঁর উদ্বেগ নেই। মহান্ এক উপলব্ধিতে মন তাঁর উদ্ভাসিত। অস্পষ্ট কণ্ঠে আপন মনে বললেন,—প্রভু বুঝেছি তোমার অন্তর্ধানের রহস্য! জানি কোথায় তুমি গেছ, কার কাছে তুমি পালিয়েছ!

আনমনে মন্দির থেকে একলা নিষ্ক্রান্ত হলেন নামদেব।

চোখা মহারকে ওরা মাপ করেনি। হ্যাঁ, বিট্ঠল সকলের জন্যে,—সব সম্প্রদায়ের সব পেশার লোক মন্দিরে আসবে বৈকি! নইলে পূজা দেবে কে, প্রণামী দেবে কে? কে চড়াবে প্রভুর ভোগ? কে ঠেকাবে পূজারীর দক্ষিণা? কিন্তু তাই বলে যারা অন্ত্যজ যারা অস্পৃশ্য অচ্ছুত,—তারা? না, না, কিছুতে না!

কিন্তু ঐ চোখা ব্যাটা যে জাদু জানে, ইন্দ্রজালের রাজা! শ্মশানে মশানে গরুমোষ সৎকার করে,—ভূতের কাছে ভোজবাজি শিখেছে। ব্যাটা যদি মন্দিরদ্বারে থাকে, দ্বারের চাবি আপনি খুলে যাবে। সূক্ষ্মমূর্তি ধারণ করে গর্ভগৃহের মধ্যে ঢুকবে। প্রভুর গলার মালা নিজের গলায় পরবে আর মরা গরুর হাড়ের মালা বজ্র-আঁটনে এঁটে দেবে প্রভুর গলায়।

তাই তাকে ওরা দূর করে দিয়েছে পান্ধারপুর থেকে। নদীর ওপারে একটি কুটীর বেঁধে সে থাকে। ওপার থেকে মন্দিরের চূড়াটুকু তার চোখে পড়ে।

মাটির হাঁড়িতে জাউ ফুটিয়েছে চোখার বউ চোখানি। জলে সেদ্ধ করেছে শাকপাতা। শালপাতায় সেই শাকান্ন সাজিয়ে দিয়েছে স্বামীর জন্যে। পাশে রেখেছে এক চিমটে নুন।

এমন সময় অজানা কোন্ অতিথি হাঁপাতে হাঁপাতে এল তাদের সামনে। দাওয়ায় একটা নিমগাছ, দ্বিপ্রহরের রোদে মুখ তার লাল, ঘাম ঝরছে গা থেকে, দাঁড়াল নিমের নরম ছায়ায়। ছুটে পালিয়ে এসেছে যেন কোন্ বন্ধন থেকে!

শ্রান্ত গলায় বললে,—আমি বড় ক্ষুধার্ত, আমাকে খেতে দাও!

নিজের জন্যে যেটুকু খাদ্য হাঁড়িতে অবশিষ্ট ছিল চোখানি সেটুকু তাড়াতাড়ি বেড়ে দিল অতিথিকে। বললে,—এই জাউ আর এই শাক,—আর কিছু নেই। এতে কি তুমি তৃপ্ত হবে?

সবে একগ্রাস মুখে তুলছিল চোখা। চোখ তুলে তাকাল। পূর্ণদৃষ্টি মেলল অতিথির মুখপানে। হাতের গ্রাস পাতে পড়ে গেল। উচ্ছিষ্ট হাতে চেপে ধরল অতিথির হাত। চিৎকার করে উঠল,—

হবে হবে, হবে বইকি। বিদুরের ক্ষুদ খেয়ে তুমি তৃপ্ত হয়েছিলে, দ্রৌপদীর হাত থেকে এক কণা শাক মুখে তুলে ঢেকুর তুলেছিলে,—আমাদের ঘরের দীন অন্নে তোমার খিদে মিটবে না? এস, এস, আমার পাশে বোসো ঠাকুর!

আর একটি ছায়া পড়ল চোখা মহারের উঠানে। দাঁড়ালেন নামদেব। ঠিক তিনি বুঝেছেন, ঠিক তিনি এসেছেন।

না নিলেন প্রভু নামদেবের অর্ঘ্য। পরমতম ভক্তের হাত থেকে পরমতম নৈবেদ্য তিনি তুলে নিয়েছেন আপন হাতে।

বিষ্ণুবিট্‌ঠল ভগবান আর অস্পৃশ্য-অচ্ছুত চোখার মিলনদৃশ্য দেখে নামদেবের তীর্থব্রত সম্পূর্ণ হোলো।

বিট্‌ঠলমন্দিরে ঢোকার আগে চোখামেলার সমাধি ঘিরে আমরা নাচলাম গাইলাম,—সমাধিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করলাম। তারপর ঐ সমাধির মূলে অপেক্ষা করলাম আলন্দীর বারকরীদের জন্যে। মঙ্গলবেড়ের হরিজনরা আমাদের সঙ্গে অপেক্ষা করল না। ঢোল-করতালের তালের সঙ্গে নাচতে নাচতে তারা এগোলো,—ঢুকে গেল মন্দিরের মধ্যে।

চোখামেলা ঢোকেননি,—তিনি অপেক্ষা করছিলেন সারাজীবন। তাঁর জন্মতারিখ আমরা জানিনে। তবে জ্ঞানেশ্বরকে তিনি দেখেছিলেন। জ্ঞানেশ্বরের সমাধির বেয়াল্লিশ বছর পরে তিনি দেহরক্ষা

করেছিলেন। এই সুদীর্ঘ জীবন তিনি উৎসর্গ করেছিলেন বিট্‌ঠল প্রভুর নামে। কিন্তু বিট্‌ঠলমন্দিরে প্রবেশের অধিকার তিনি পাননি। নির্বাসনদণ্ড থেকে অবশ্য তাঁর অব্যাহতি মিলেছিল। পান্ধারপুরে আসতে কোনো বাধা ছিল না তাঁর। বারে বারে ছুটে ছুটে আসতেন,—মন্দিরের এই পূর্বদ্বারে বসে প্রভুর ধ্যান করতেন, প্রভুর গান গাইতেন।

ভক্তিপথের পরম পথিক চোখামেলা অস্পৃশ্য। দেবালয়ের শিখর তাঁর মাথার ওপর আচ্ছাদন মেলেনি,—পথই ছিল তাঁর আশ্রয়। দেবস্থানে এসে পথে বসেই তিনি দিন কাটাতেন,—গ্রীষ্মের দাহ, বর্ষার জল আর শীতের হিম,—পান্ধারপুরে এরাই ছিল তাঁর সাথী।

আরো অনেক পথ তাঁর চেনা ছিল। নানা তীর্থ তিনি ভ্রমণ করেছিলেন। নামদেব ও তাঁর কুটুম্বকবিদের সঙ্গে চোখামেলার গভীর সখ্য ছিল। তিনিও অনেক অভঙ্গগান রচনা করেছিলেন। অনেক পথ ঘুরে পান্ধারপুরে পৌঁছে পথের ধূলাতেই তিনি আশ্রয় নিতেন। মন্দিরদ্বারের সামনে বসে নিজের রচিত গান গাইতেন, সম্প্রদায় নির্বিশেষে ভক্তগণ তাঁর গলায় গলা মেলাত। তাঁর একটি গান বারকরীদের খুবই প্রিয়। মন্দিরে সান্ধ্য কীর্তনে এই গানটি তারা করে। তিনি না পেলেও তাঁর গান প্রভুর চরণস্পর্শ পায়।

অনেক পথ ঘুরেছি আমি
ভ্রমেছি অনেক দেশ,
মেলেনি তবু আশ্রয় মোর,
পাইনি পথের শেষ।
কতো যে তীর্থ হেরেছি আমি
সাঙ্গ হয়নি খোঁজা,—
ধর্মতত্ত্ব অনেক শুনেছি
হয়নি তো কিছু বোঝা।

জেনেছি সকল পথের প্রান্তে
পান্ধারপুরে শান্তি,—
তৃপ্তিনিলয় ভূবৈকুণ্ঠ
ঘোচায় সকল ভ্রান্তি ॥

চোখার সঙ্গে বিট্‌ঠলজীর সম্পর্ক রাধাকৃষ্ণের সম্পর্ক। চোখা-বিট্‌ঠলের প্রেম রাধাকৃষ্ণের প্রেম। সংসার এ সম্পর্ক মানে না, সমাজ এ প্রেমকে ছি-ছি করে, লোকাচার এ মিলনের পথে আগল আঁটে। রাধার জন্যে কৃষ্ণ ব্যাকুল। উভয়ে উভয়ের প্রেমে আত্মহারা। প্রেমের আর্তিতে দুজনের চোখ দিয়ে জল ঝরছে,—সে অশ্রু দুজনের মাঝখানে বিরহের পাথার।

রাধাকৃষ্ণের মিলনের মতো চোখা-বিট্‌ঠলের মিলনও লোক-লোচনের অন্তরালে অভিসারের নিভৃত পথে। তাই চোখা বলছেন—

ঠাকুর,
পথপাশে বসে আছি
রজনী জাগি,
আঁখিলোর ঝরে শুধু
তোমারই লাগি।
অতি ঘোর যামিনী,—
অন্ধকারে
আমি অভিসারিণী
এসেছি দ্বারে,—
দেখিবে না কেহ মোরে
ঘুমায় সবে,—
এখন কি প্রিয়তম
হৃদয়ে লবে ?

শিলাসম আছ খাড়া
বিটের পরে
নিজ কটি ধরে আছ
কমল করে,
বাহুদুটি প্রসারিত
করো তুমি নাথ,—
নিভৃত বিজন পথে
ধরো মোর হাত ॥

চোখামেলার মৃত্যু ১৩৩৮ খৃষ্টাব্দে,—নামদেবের তিরোধানের বারো বছর আগে। তাঁর অপঘাত মৃত্যু হয়। পরিণত বয়সেও চোখাকে খেটে খেতে হোতো। দিনমজুরীর জন্যে যে কোনো কাজে হাত লাগাতেন। মঙ্গলবেড়ে একটা বিরাট বাড়ি তৈরি হচ্ছিল। বাস্তুকাররা তাঁকে লাগিয়েছিল পাথর বয়ে নেওয়ার কাজে। ওপর থেকে ভারি পাথর একদল শ্রমিকের মাথায় ভেঙে পড়ে। সেই আঘাতে ধ্বসে পড়ে পাশের খাড়া প্রাচীর। পাথরের স্তূপের তলায় চাপা পড়ে শ্রমিকদের দেহ। চোখামেলার দেহও সেই স্তূপের নিচে ছিল।

শোককাতর নামদেব নির্দেশ দিলেন চোখামেলার দেহ ঐ ধ্বংসস্তূপ থেকে বার করে আনতে। পান্ধারপুরে তাঁর সমাধি হবে। অনেক দিন ধরে অনেক চেষ্টায় পাথর সরিয়ে মাটি খুঁড়ে মৃতদেহগুলি বার করা হোলো। চামড়া নেই, মাংস নেই,—সব ততোদিনে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে গেছে। শুধু একরাশ ভাঙা ভাঙা নরকঙ্কাল!

নামদেবকে জিজ্ঞাসা করা হোলো,—এইসব টুকরো টুকরো হাড়, এদের মধ্যে চোখামেলার হাড় কোন্‌গুলি বুঝব কেমন করে?

নামদেব বললেন,—বোঝা কি শক্ত? চলো, ওখানে গিয়ে আমরা নামগান করি বিট্‌ঠলের,—যে-কটি হাড় প্রভুর নামে সাড়া দেবে, বুঝবে সেগুলিই চোখার অস্থি!

চোখামেলার দেহাস্থি বুকে কুড়িয়ে নিয়ে পান্ধারপুরে ফিরে এলেন নামদেব। মন্দিরের পূর্বদ্বারের সামনে যেখানে বসে চোখা গান গাইতেন সেইখানে রচনা করলেন তাঁর সমাধি।

॥ ২০ ॥

হাতি! হাতি! হাতি আসছে!

আঙুল উঁচিয়ে চিৎকার করে উঠল কানহাইয়ালাল!

হাতি? বন নেই, পাহাড় নেই,—এখানে হাতি এল কোথা থেকে? জু-গার্ডেন থাকলেও না হয় বুঝতাম।

শুধু কানহাইয়ালাল নয়, চ্যাঁচাচ্ছে সবাই। হাতিকে অবশ্য ভয় নেই,—হাতির দাপাদাপি থেকে প্রাণ বাঁচাবার জন্যে হন্যে হয়ে দৌড় মারছে না কেউ,—দাঁত বার করে হাসছে, মেয়েরা ঘোমটা ফেলে চোখ তুলে তাকাচ্ছে, বাচ্চারা দিচ্ছে হাততালি।

হাতি আসছে,—তার জন্যে রাস্তা করে দাও। সরু রাস্তা,—একধারে মন্দিরের উঁচু পাঁচিল একধারে দোতলা তিনতলা বাড়ি। বাড়ির দেউড়ি আর দুপাশের রোয়াকে দোকান। আত্মীয়-বন্ধু চেনা-অচেনা দূর দূরান্তর থেকে এসেছে। একটা বাড়িতেও তিল ধারণের ঠাঁই নেই। লোক উপচে পড়ছে রাস্তায়।

না, না,—অমন করে পথ আটকিয়ে ভিড় জমালে চলবে না। হটে যাও, হটে যাও, রাস্তা জুড়ে ব্যাপারীরা দিব্যি জমিয়ে বসেছে,—মালপত্র গুটিয়ে নিয়ে হটে যাও সব! হাতি আসছে,—হাতির জন্যে উন্মুক্ত করে দাও পথ, হাতিকে আবাহন করো। এ হাতি বুনো হাতি নয়,—রাজহস্তী।

রাজার মতো মেজাজ, রাজার মতো সাজ। বিরাট উঁচু বিশাল মোটা একজোড়া মহাগজ। চলন্ত থামের মতো তালে তালে পা ফেলে গজেন্দ্রগমনে আসছে,—লম্বা শুঁড়টা হাঁটার তালে তালে

এপাশে ওপাশে দুলছে,—দু-পাশের জনতা শিউরে শিউরে পথ করে দিয়ে পাঁচিলে গা মিশিয়ে দাঁড়াচ্ছে।

সারা গায়ে সোনালি ঝালর। কপাল জুড়ে রঙিন মিনে-কাজ করা সোনালি ললাটপট্ট, লম্বা শুঁড় জুড়ে সোনালি আলপনা। লাল-বেগুনি-সবুজের কারুকার্য। গলা থেকে ঝুলছে লাল-হলুদ লম্বা লম্বা মোটা মোটা মালা। পিঠে রাজকীয় হাওদা।

হাতি দুটোকে পথ দেখিয়ে নিয়ে তাদের সামনে সামনে আসছে একদল নাটুকে-নাচিয়ে। বেঁটেখাটো চেহারা সব কটা ছোকরার। নানারঙের খাটো ধুতি আর টাইট কুর্তা পরণে। কোমরে জরির বেল্‌ট। মাথায় পালক-আঁটা পাগড়ি। কোমরে বাঁধা ট্যামট্যামে ঢোলক আর হাতে শিঙা। শিঙাতে ফুঁ আর ঢোলকে কাঠি,—বিচিত্র অঙ্গভঙ্গি করতে করতে তারা এগোচ্ছে।

পায়ে পায়ে ঝাঁকড়া করবীর ছায়ায় এসে আমরা দাঁড়ালাম,—দেখতে লাগলাম দৃশ্য। জোড়াহাতি মন্দিরের পূর্বদ্বারের সামনে এসে থামল। ঢোলক-শিঙা-ওয়ালারা বাজনা থামিয়ে একপাশে সরে গেল। হাতিদুটিকে ঘিরে দাঁড়িয়ে নাচতে লাগল আলন্দীর বারকরীর দল, গাইতে লাগল,—

হরি মুখে মৃহনা হরি মুখে মৃহনা
পুণ্যাচী গণনা কোন করী।

এক হাতির পিঠে জ্ঞানেশ্বরজীর এক বিরাট রঙিন চিত্র, অন্য হাতির পিঠে লাল মখমল ঢাকা এক বেদী,—তার ওপর লাল বাঁধাই এক গ্রন্থ, ফুলের মালা দিয়ে জড়ানো,—গীতা জ্ঞানেশ্বরী।

হাতির হাওদা থেকে চিত্র আর গ্রন্থ নামল। মাথায় নিয়ে দাঁড়ালেন দুজন মুখ্য বারকরী। বারকরীরা চোখামেলার সমাধি স্পর্শ করল, তারপর সিঁড়ি বেয়ে প্রবেশ করল মন্দিরে।

জ্ঞানেশ্বরের পর তুকারাম, তুকারামের পর নিবৃত্তিনাথ, নিবৃত্তির পর একনাথ, একনাথের পর জ্ঞানোবা মহারাজ। সর্বপ্রথম

আলন্দীর দল, তারপর দেহুর, দেহুর পর ত্র্যম্বকের, পৈঠানের পর তুলজাপুরের। তারপর একে একে বাকি সব দল। এমনি পারম্পর্য কতো কাল থেকে চলে আসছে। এই পারম্পর্য মেনে সারা মহারাষ্ট্রের বিভিন্ন অঞ্চলের বারকরীর দল বিট্‌ঠলমন্দিরে প্রবেশ করছে। কোনো বিবাদ নেই, প্রতিযোগিতা নেই।

এই পারম্পর্য এই নিষ্ঠাপূর্ণ নিয়মানুবর্তিতা প্রতি যাত্রায় নতুন করে ঘোষণা করা হয় বাখ্‌রিতে। পান্ধারপুরে পৌঁছবার আগে শেষ যেখানে রাত্রিবাস সে জায়গাটির নাম বাখ্‌রি। পদযাত্রার জংশন স্টেশন। অন্তত আটাশটি জায়গা থেকে বর্তমানে বারকরীরা আসে। সমস্ত পথ বাখ্‌রিতে এসে মিশেছে। সব দল এসে জমলে তবে পান্ধারপুর যাত্রা। আর শুধু একদিনের পথ। পিছিয়ে পড়া দলের জন্যে এখানেই অপেক্ষা। তাই দরকার মতো সব দলই এখানে দু-এক রাত কাটায়। আমরাও বাখ্‌রিতে একদিন কাটিয়ে এসেছি।

পান্ধারপুরে একসঙ্গে ভিড় করার উপায় নেই। এখানে পৌঁছনো মাত্র বারকরীরাও আমাদেরই মতো ছড়িয়ে ছিটিয়ে গিয়েছে। কেউ আশ্রয় নিয়েছে যাত্রীনিবাসে, কেউ কোনো মঠে বা আশ্রমে, কেউ বা মন্দিরের চাতালে, কেউ আত্মীয়গৃহে। প্রতিটি দলের মুখ্য বারকরীরা কেবল সন্তপাদুকা আগলে নির্দিষ্ট আশ্রয়ে রাত কাটিয়েছেন। বারকরীদের এই সকালবেলাকার দল অনেক ছোট। বিভিন্ন দল সন্ত-নিদর্শন বহন করে একে একে মন্দিরদ্বারে আসছে।

দল ছোট হলে কী হয়,—আড়ম্বরের প্রচণ্ড ঘটা। বারকরীদের পথযাত্রা অনাড়ম্বর। কিন্তু মন্দির-প্রবেশের শোভাযাত্রায় প্রচণ্ড জাঁকজমক। হাতি আছে, ঘোড়া আছে, বিশাল বিশাল পট আর পতাকা আছে,আধুনিক ব্যাণ্ড পার্টি আছে,ছাত্রছাত্রীদের কুচকাওয়াজ আছে, রাজকর্মচারী, নগরকর্তা ও স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিরা আছেন।

জাঁকজমকের সব উপকরণই স্থানীয়। বারকরীরা কিছুই সঙ্গে

করে আনেনি। অসংখ্য রঙিন পতাকা আর ফেস্টুনে বারকরীদের দণ্ডের মাথায় বাঁধা ছোট ছোট পতাকাগুলি চোখেই পড়েনা। প্রথম শোভাযাত্রা জ্ঞানেশ্বরজীর,—তার সামনে রাজহস্তী। কারা এই জোড়া হাতি সাপ্লাই করেছে জানিনে। নদীতীর থেকে উঠেই মহাদ্বারের দুপাশে দুই বিরাট পাথরের প্রাসাদ দেখে এসেছি। এক প্রাসাদ হোলকারের আর এক প্রাসাদ সিন্ধিয়ার। হাতি দুটি হয়তো এই দুই প্রাসাদেরই সচল সম্পত্তি।

দলের পর দল বারকরীরা আসছে সন্ত-প্রণাম বহন করে। রাস্তায় দমবন্ধ হয়ে আসা ভিড়ের চাপ। করবীগাছের নিচের আশ্রয় নির্বিঘ্ন নয়। একধারে মানুষের চাপ আর একধারে দেয়ালের চাপ, এই ডবল চাপ কতোক্ষণ সামলাব। তাই পূর্বদ্বারের সিঁড়ির ওপর চেপে বসেছি। যেখানটায় বসেছি, লোকের পায়ের চাপে বিধ্বস্ত হওয়ার ভয় নেই। কানহাইয়ালালই বুদ্ধি করে টেনে এনে এখানে বসিয়েছে আমাকে, নিজেও পাশে চেপে বসেছে।

সামনেই নামদেবের সমাধি।

বিট্‌ঠলমন্দিরের সিঁড়ির ধাপে অপেক্ষা করে আছেন নামদেব। সারা জীবন তিনি পথে পথে প্রভুর নামগান করে ফিরেছেন, দেশে দেশে বিট্‌ঠলভক্তি প্রচার করেছেন,—আর ভক্তদের আমন্ত্রণ করেছেন এই মন্দিরে। প্রতি পরিব্রজ্যার শেষে এই মন্দিরদ্বারে দাঁড়িয়ে তাদের জন্যে প্রতীক্ষা করেছেন, স্মিতমুখে তাদের আহ্বান করেছেন।

আজও তাই করছেন।

নামদেবের সমাধি অতিক্রম করে মন্দির-চত্বরে আমরা উঠলাম। বারকরীস্রোত ততোক্ষণে বন্ধ হয়েছে,—তবু প্রবেশপথ দিয়ে যাত্রীর বিরাম নেই। এতো ভিড় যে চারদিক ভালো করে দেখার উপায় নেই, কদম থামিয়ে ডানদিকে বাঁদিকে তাকাবার অবসর নেই। জানিনে কোথায় কীভাবে চলব কতোদূর এগোব, পৌঁছতে পারব

কিনা বাঞ্ছিত লক্ষ্যে। তবে এই মহাতিথিতে এক ঝলক দেবদর্শন হলেই হোলো। তাছাড়া ভিড়ের মধ্যে এমন কিছু অসংযম নেই, অহেতুক ধাক্কাধাক্কি নেই, বিশ্রী কোলাহল বা রূঢ় ভাষণ নেই। ব্যাকুলতা যে সর্বজনীন তা সকলেই বোঝে, তাই স্রোতের সঙ্গে গা ভাসিয়ে চলা।

নগরখানা পার হয়ে দীপস্তম্ভের পাশ ঘেঁসে আমরা এগোলাম, চোখে পড়ল নানা দেবদেবীর মূর্তি। উদার চত্বর পার হয়ে ক-ধাপ সিঁড়ি ভেঙে পৌঁছলাম ষোড়শস্তম্ভ মণ্ডপে।

অন্তরাল পর্যন্ত প্রচণ্ড ভিড়। পূজার্থীদের ঠাসাঠাসি। ভক্তরা সেখান থেকেই দেবদর্শন করছেন। গলদ্‌ঘর্ম পুরোহিতদের হাতে পূজোপচার আর প্রণামী তুলে দিচ্ছেন। মাটিতে মাথা লুটোবার উপায় নেই। তাই হাত তুলে প্রণাম করছেন। মুহুর্মুহু জয়ধ্বনিতে পাথরের দেয়াল প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। ধাক্কা সামলে কানহাইয়ালাল পেছন থেকে হাত বাড়িয়ে আমার কাঁধদুটো শক্ত করে চেপে আছে।

হাতিদ্বারের ঠিক সামনে শুনলাম চেনা গলা,—

বাঙালী ভাই, এসে গেছ!

এক লহমার জন্যে চোখের সামনে দেশপাণ্ডেজীকে দেখলাম। পাশের প্রৌঢ় পুরোহিতকে কী বললেন,—তারপরই হারিয়ে গেলেন ভিড়ের মধ্যে।

পুরোহিত ভিড় ঠেলে কাছে এগিয়ে এসে আমার হাত ধরলেন। কানের কাছে মুখ এনে চিৎকার করলেন,—আপ্ বাঙ্গাল সে আতে হেঁ?

আমি কোনোরকমে মাথা নাড়লাম। তিনি আমার ডান হাত ধরে দিলেন প্রচণ্ড টান। সেই টানে সোজা পৌঁছলাম গর্ভগৃহে। সঙ্গে সঙ্গে পিঠে লেপ্টে থাকা কানহাইয়ালাল।

আসুন, আসুন, পাণ্ডুরঙ্গজীকে প্রাণ ভরে দেখুন!

ভিড় আর স্পর্শ করছে না, কোনো কোলাহল কানে পৌঁছচ্ছে না। আর কিছু আমার চোখে পড়ছে না। গর্ভগৃহের মৃদু আলোর মুখো-

মুখি শ্রীবিষ্ণুবিট্‌ঠল পাণ্ডুরঙ্গজীকে আমি দেখলাম। কোনো বাধা নেই দৃষ্টির সামনে। যাঁকে দেখতে এসেছি, তাঁকে নয়নভরে দেখলাম, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলাম।

রুক্ষ এক প্রস্তরখণ্ড। যেন বিশাল একটা ইষ্টক। সেই ইঁটের ওপর দৃঢ় চরণদ্বয় সমান্তরালভাবে রেখে খাড়া দণ্ডায়মান এক নিকষকৃষ্ণ বলিষ্ঠ পুরুষ মূর্তি। কবাট বক্ষ, বৃষস্কন্ধ, উন্নত ললাট। সিংহকটির মতো সরু কোমর, সমর্থ দুটি হাতে কোমরের দু-পাশ চেপে ধরা। মাথায় গোলাকার পাথরের মুকুট,—যেন এক উন্নত শিবলিঙ্গ। ঘন ভ্রূ, বিশাল নয়ন। যুগল কর্ণে মকরকুণ্ডল, গলায় কৌস্তুভহার, দক্ষিণ হাতে পদ্মনাল, বাম হাতে শঙ্খ। দেহের উর্ধ্বভাগ সম্পূর্ণ অনাবৃত, বক্ষোলগ্ন উপবীত। কটি থেকে পা পর্যন্ত স্বচ্ছ বসন। তার মধ্যে দিয়ে স্তম্ভের মতো উরু, ব্যাঘ্রমুষ্ঠির মতো জানু আর পুষ্ট পুরুষাঙ্গের প্রকাশ।

অমসৃন পাথরের তৈরী মূর্তি,—পাথরেরই মতো দৃঢ়-গম্ভীর। শিল্পচাতুর্যে কোমলতার চিহ্নমাত্র নেই।

সেই উদার গম্ভীর আয়ত চোখে চোখ রেখে কতোক্ষণ আমি স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম! একটি মুহূর্ত না একটি প্রহর, একটি প্রহর না একটি দিন, একটি দিন না একটি আয়ু।

হে বিট্‌ঠল, অনেক পথ অতিক্রম করে আজ তোমার সামনে এসে দাঁড়িয়েছি, তোমাকে দেখছি। বারকরীদের সঙ্গে আমি এসেছি,—কিন্তু আমি বারকরী নই। ভক্তজন মধ্যে আমি দাঁড়িয়েছি, —কিন্তু আমি ভক্ত নই। ভক্তি নিয়ে আমি আসিনি,—কৌতূহল নিয়ে এসেছি। তোমাকে নিয়ে আমার বড়ো কৌতূহল। তোমাকে দেখে শুধু আমার কৌতূহল চরিতার্থ হোক।

কৌতূহল হবে না? ভগবানের যতো বড়ো শক্তি, ততো বড়ো দম্ভ। তিনি পরিত্রাতা, রক্ষাকর্তা, তিনি বাঁচান বলেই বাঁচি। গীতায় তিনি ঘোষণা করেছেন,—ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে। ধর্ম-

জীবন বারে বারে গ্লানিতে ভরে যায়, পাপে কলুষ-কালো হয় সমাজ, অন্যায় আর অসত্য মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে, তাই বারে বারে আমারও টনক নড়ে। সুখরাজ্য বৈকুণ্ঠ ছেড়ে এই দুঃখময় পৃথিবীতে আমিও বারে বারে অবতীর্ণ হই, পাপবিমোচনের জন্যে ধর্মসংস্থাপনের জন্যে।

ঠিক। শুধু বিষ্ণু-অবতারই নন,—মর্তবাসীর প্রতি অমর্তলোকের যতো প্রসাদ, ঐ একই কারণে। স্বর্গস্রোতস্বিনী গঙ্গা-গোদাবরী ভূতলে অবতরণ করেছেন পাপহারিণী হয়ে, অসুরবিমর্দনের জন্যেই শিবশক্তির আবির্ভাব।

কিন্তু হে বিট্‌বিহারী অবতার, তুমি তো সেজন্যে আসোনি। পাপীর গর্জন আর পুণ্যার্থীর ক্রন্দন শুনে তোমার ঘুম ভাঙেনি। মানুষের মনে পাপপুণ্য দুইই থাকে। শুধু পাপমোচনের জন্যেই তুমি? পুণ্য দেখে তারিফ করবার জন্যে নও? শুধু অপরকে শাস্তি দেবার জন্যেই তুমি আসো? নিজে স্বস্তি পাবার জন্যে নয়?

এই শান্ত স্নিগ্ধ ভীমা নদীর তীরে আকাশ অধর্মে আকীর্ণ হয়নি, ক্লিষ্ট কণ্ঠ তোমার নাম ধরে আর্তনাদ করেনি। অসুরনিধনের জন্যে তোমার ডাক পড়েনি, তবু কেন তুমি এসেছ? মানুষের বুকেই অমৃতের কুম্ভ,—সেই অমৃতস্বাদের লোভেই বৈকুণ্ঠ থেকে এই মৃত্যুময় মাটিতে তুমি নেমে এসেছ। পুণ্ডলিকের পুণ্যব্রত দর্শন করে তুমি ধন্য হয়েছ। মানুষের সম্বর্ধনা করে তুমি মানুষের মহান্ রূপকে প্রতিভাত করেছ।

তোমাকে আমি দেখলাম, তোমাকে আমি চিনলাম। তুমি প্লাবনগ্রস্ত সৃষ্টির রক্ষাকর্তা নও, অসুর-দানবের সংহারকর্তা নও,—তুমি মানব-মহিমার প্রেমিক অবতার। মানুষের প্রেমে তুমি চরিতার্থ।

॥ ২১ ॥

ভিড়ের স্রোতে ভাসতে ভাসতে সোজা পৌঁছেছিলাম বিট্‌ঠল-চরণে। অনন্যমনা হয়ে কতোটুকু সময় তাঁকে দেখেছিলাম জানিনে। তারই মধ্যে চাপ আরো বেড়েছে গর্ভগৃহের মধ্যে,—অন্তরাল-মন্দিরও ঠাসাঠাসি। হাতিদ্বার দিয়ে বার হয়ে মণ্ডপে এসে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম।

সেখানে আবার দেখা দেশপাণ্ডেজীর সঙ্গে। আগেকারই মতো এক ঝলক দেখা। বোধহয় আমারই জন্যে অপেক্ষা করছিলেন। হাসিমুখে বললেন,—ভালো করে দর্শন হয়েছে তো ভায়া?

হ্যাঁ হয়েছে,—আপনারই দয়ায়।

আমারই দয়ায়? দয়াময়ের দর্শন পেলে আমার দয়ায়? পাগল? অমন কথা বলে নাকি?

মণ্ডপের ছাদ থেকে বড়ো ঘণ্টা ঝুলছে। মাথার ওপর হাত তুলে টং করে একবার ঘণ্টা বাজালেন দেশপাণ্ডেজী।

এসো ভায়া। সত্যিকারের দয়া যাঁর, তাঁকে স্মরণ করো। ভক্ত ভানুদাসের নামে একবার ঘণ্টাধ্বনি করো। জানো, তাঁরই প্রসাদে তোমার দর্শন হোলো!

ভক্ত ভানুদাস?

হ্যাঁ হ্যাঁ, ভানুদাস। ভানুদাসের কাহিনী জানা নেই বুঝি? বেশ তো, একটু ফাঁকায় ফাঁকায় বসে তাঁর কথা তোমাকে শোনাব। এখন ঘুরে ঘুরে সব ছ্যাখো।

আবার ভিড়ে মিশে গেলেন দেশপাণ্ডেজী। শোনাবেন বৈকি। ভোরবেলা শুনিয়েছেন পুণ্ডলিকের পুণ্য কাহিনী। আরো কতো কাহিনী তাঁর মনের ঝুলিতে আছে। সেই ঝুলির মুখ আবার ফাঁক হবে।

কিন্তু এ মুহূর্ত তার উপযুক্ত সময় নয়। ষোড়শস্তম্ভ মণ্ডপ জুড়ে বারকরীরা নৃত্যগীত শুরু করেছে,—তাদের সঙ্গে সাধারণ পূজার্থীরা মিশে এক তালগোল পাকানো জনতার সৃষ্টি করেছে। তাদের কেউ এগোচ্ছে দর্শন করতে, কেউ পেছোচ্ছে দর্শনতৃষ্ণা তৃপ্ত করে। ক-জন তরুণ বারকরী স্বেচ্ছাসেবক হয়ে যাত্রীস্রোতকে সামাল দিতে হিমসিম খাচ্ছে। হাতিদ্বারে কড়া পাহারা,—ঐ পথে গর্ভগৃহে আর কাউকে ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না। দেশপাণ্ডেজীর সাহায্য না পেলে এতো সহজে এমন সুন্দর ও শান্তিপূর্ণ দেবদর্শন আমাদের হোতো না।

কানহাইয়ালাল আর আমি নড়লাম। ভিড় এড়িয়ে দেয়ালের কোণে কোণে পা টিপে টিপে আমরা হাঁটলাম,—ঘুরে ঘুরে ষোড়শস্তম্ভ মণ্ডপটি দেখলাম। গর্ভগৃহের ঠিক সামনেই অন্তরাল, তার আগে এই মণ্ডপ। অন্তরালের চেয়ে অনেক বড়ো। এখানেই ভক্তকণ্ঠে সন্ত-কবিদের অভঙ্গ গান।

এই মণ্ডপটি দাঁড়িয়ে আছে ষোলোটি বিশাল স্তম্ভের ওপর। স্তম্ভগুলি লাল পাথরের,—তার গায়ের স্থূল কারুকার্য লোকের হাতে হাতে মসৃণ। একটি স্তম্ভ সোনারূপায় মোড়া,—মাথায় বিষ্ণুমূর্তি। মণ্ডপ নির্মাণের আগের যুগে নাকি এখানে গরুড়স্তম্ভ ছিল। যাত্রীরা এই স্তম্ভটির অর্চনা করে, দু-হাত জড়িয়ে আলিঙ্গন করে, ভক্তিভরে এর মূলে মাথা ছোঁয়ায়। স্তম্ভগুলি ব্যাসে যতো পৃথু, দৈর্ঘ্যে সে রকম নয়,—তাই মণ্ডপের উচ্চতা যথেষ্ট সীমিত। চোখ তুললেই দেখা যায় সারা ছাদ জুড়ে রঙিন চিত্রাবলী,—দশাবতার আর কৃষ্ণলীলা। মণ্ডপের চারধারে ছোট ছোট কয়েকটি কক্ষ। প্রতি কক্ষ এক একটি দেবমন্দির,—রাম-লক্ষ্মণ, কাশী-বিশ্বনাথ, কালভৈরব প্রভৃতি আসীন। ষোলোখাম্বা মণ্ডপটি প্রায় চতুষ্কোণ আয়তক্ষেত্র,—দৈর্ঘ্যে ছেচল্লিশ ফুট, প্রস্থে চল্লিশ ফুট।

ষোলোখাম্বা মণ্ডপের আগে মন্দিরের প্রবেশ-মণ্ডপ। লম্বাটে কক্ষ, 'অন্ধকার পরিবেশ। প্রস্থে ফুট দশেক হবে, দৈর্ঘ্যে অন্তত

পঞ্চাশ ফুট। রাজার বাড়ির দেউড়ি যেন, যেখানে করুণাপ্রার্থীরা এসে জমায়েত হয়, গেটের মুখে এসে দরোয়ানকে খোশামোদ করে। গেট একটি নয়, পাশাপাশি তিনটি। মাঝের দ্বারটি দিয়েই আমরা ঢুকেছিলাম,—দ্বারের দুইপাশে শিলারূপী দুই দ্বারপাল জয়-বিজয়কে দেখেছিলাম। ফেরার পথে চোখে পড়ল আরো দুই বিগ্রহ,—গণপতি আর সরস্বতী।

যাবার সময় কিছুই লক্ষ্য করিনি,—ফেরবার পথে মন্দিরতলের বিন্যাসটি ভালো করে মনে গেঁথে নিলাম। ক্ষুদ্রায়তন গর্ভগৃহ বা মূল মন্দির যেখানে বিগ্রহ বিরাজমান, তার সামনে অন্তরাল-মণ্ডপ, —যার কোণে বিগ্রহের শয়নকক্ষ। তার সামনে ষোড়শস্তম্ভ মণ্ডপ বা নাটমন্দির। আর সবার গোড়ায় প্রবেশ-মণ্ডপ। ভিড় সত্ত্বেও মণ্ডপের কারুকার্য, চিত্রাবলী আর বিগ্রহাবলী মোটামুটি খুঁটিয়ে দেখে আমরা মন্দিরের বাইরে এলাম।

সামনে বিরাট উন্মুক্ত আয়তক্ষেত্র। সবটা পাথরে বাঁধানো। পুব-পশ্চিমে প্রায় একশো কুড়ি ফুট, উত্তর-দক্ষিণে ষাট ফুট। বিরাট, কিন্তু ফাঁকা নয়। যাত্রীদলে পূর্ণ।

আজ বারকরীদেরই দিন। মন্দির-মণ্ডপ বলতে গেলে তাদেরই দখলে। তাদের নাচ, বৃন্দকণ্ঠে তাদের জয়গান। মাঝখানে একটা পথ অবশ্য আছে। বিভোল বারকরীরা নাচতে নাচতে সেই পথ আটকায়,—আবার বারকরী স্বেচ্ছাসেবকরাই তাদের দুপাশে ঠেলে দেয়। যাত্রীরা এগোয়, অন্তরালের সম্মুখদ্বার দিয়ে বিগ্রহ দর্শন করে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে আসে। গর্ভগৃহে প্রবেশের সৌভাগ্য যাদের হয়,—যেমন আমাদের,—তারা পাশের হাতিদ্বার দিয়ে ঢুকবার সুযোগ পায়। হাতিদ্বার সাধারণত পুরোহিতদের গর্ভগৃহে যাওয়া-আসার দ্বার।

সাধারণ যাত্রীদের জমায়েত সামনের এই খোলা চত্বরে। উন্মুক্ত বাতাস—এখানে এসে প্রাণ খুলে নিঃশ্বাস নেওয়া। অসংখ্য যাত্রী

এখানে এসে ছড়িয়ে পড়েছে, খোলা আকাশের নিচে বিশ্রাম করছে। চাতালের মাঝখানে তিনটি বিশাল দীপস্তম্ভ আর কয়েকটি সমাধি। দীপস্তম্ভের ছায়ায় অনেকে ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়িয়েছে। সমাধি ঘিরে অনেকে হাঁটু মুড়ে বসেছে। গরুড় আর মারুতিমূর্তির পায়ের কাছে রোয়াকে ঠেস দিয়ে কেউ পা ছড়িয়েছে।

একটি নিমগাছ। সেই নিমগাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে বললাম,—একটু বোসো কানহাইয়ালাল। কতোক্ষণ পায়ের ওপর আছি,—পা-দুটোকে একটু বিশ্রাম দিই!

কানহাইয়ালাল হাসল।

বিশ্রাম? বাবাঃ, সকাল থেকে আপনার পা তো বিশ্রামেই আছে দাদা! সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত হাঁটার ডিউটি তো খতম্! তবু পায়ের মুখ ভার? চলুন, চলুন, চারদিকে ঘুরে ঘুরে দেখে নিই আগে।

বিশাল পাথরের প্রাচীর দিয়ে সারা মন্দির-চত্বর ঘেরা। প্রাচীরের গায়ে গায়ে খুপরি খুপরি কক্ষ,—সেখানে দূরাগত যাত্রীরা সাময়িক আশ্রয় নিয়েছে। ঠেলাঠেলি আর পায়ের চাপ এড়িয়ে কোণে কোণে কাপড় বিছিয়েছে, পোঁটলা-পুঁটলি সাজিয়েছে।

কোথা থেকে এসেছে এতো লোক? কাল রাতের আশ্রয় খুঁজতে বেশ বেগ পেতে হয়েছিল আমাদের। মঠ, মন্দির, আশ্রম, হোটেল, পাণ্ডাবাড়ি,—সব ভর্তি। সারা শহর জুড়ে প্রচণ্ড ভিড়, সর্বত্র মেলার চেহারা। শুধু বারকরীরাই আসেনি। দূর থেকে এসেছে অসংখ্য তীর্থপথিক। কুরডুবাড়ী থেকে অনেক লোকাল ট্রেনের ব্যবস্থা হয়েছে। এসেছে ঝাঁকে ঝাঁকে বাস। পুণা, সাতারা, কোলহাপুর, ওসমানাবাদ থেকে স্টেট বাস সরাসরি এসে পান্ধারপুরে যাত্রী উজাড় করে দিচ্ছে। প্রত্যন্ত রাজ্য থেকেও যাত্রীসংখ্যা কম নয়।

ভিড়ের ওপর চোখ বুলিয়ে কানহাইয়ালাল হঠাৎ আপন মনে বললে,—ওরা সব কোথায় গেল?

ওরা কারা কানহাইয়ালাল?

কেন? আমাদের আলন্দীর বন্ধুরা। পূর্ণ চৈতন্যজী, নাথুভায়া,—ওরা সব কোথায়? সারা সকাল একটা চেনা মুখও চোখে পড়ল না!

ওরা বারকরী কানহাইয়ালাল। বারকরীর সব দল আজ এক দল হয়ে গিয়েছে,—কে কোথায় কোন্ তালে আছে,—তুমি আমি তাদের ধরব কী করে?

খুব বলেছেন! কিন্তু চেরিল? সে মেয়েটা তো বারকরী নয়, তার ওপর মেমসায়েব, তাকে কোথাও দেখতে পেলাম না কেন?

আমি একটা চাপড় লাগালাম কানহাইয়ালালের পিঠে।

তোমার মাথাটা কি খারাপ হয়ে গেল নাকি হে! তীর্থে এসে মেমসায়েবের খোঁজ করছ?

রাখুন, যা ভাবছি তা আপনারও মনের কথা! আমি মুখে বলে বড়ো অপরাধ করেছি, তাই না?

সত্যি, কানহাইয়ালালের মুখে আমারও মনের কথা। সেই সোনালি চুল আর সোনালি পোশাক পরা বিদেশী মেয়েটা তো চোখ এড়িয়ে যাবার নয়, যতো ভিড়ই হোক না কেন? আলন্দীর মন্দিরে সে আমায় খুঁজে বার করেছিল, দেহুর মন্দিরে আমরা পাশাপাশি বিগ্রহ দেখেছিলাম, বারকরীর পথে তার পাশাপাশি আমরা হেঁটেছিলাম, আর পান্ধারপুরের বিট্‌ঠলমন্দিরে সে পাশে নেই কেন? কোথায় হারিয়ে গেছে, লুকিয়ে আছে জনতরঙ্গের গভীরে?

আমরা দক্ষিণ দিকের সরু রাস্তা দিয়ে এগোলাম। ভিড়ের ফাঁকে পা টিপে টিপে এগোবার মতো সংকীর্ণ গলি। দক্ষিণ থেকে পশ্চিম, পশ্চিম থেকে উত্তর, উত্তর থেকে আবার পূব, এইভাবে আমরা মন্দির-চত্বর পরিক্রমা করলাম। বিশেষ করে দেখলাম রুক্মিনীমন্দির। বিট্‌ঠল-মন্দিরে বিট্‌ঠল একলা, তাঁর পাশে রুক্মিনী নেই। রুক্মিনী আছেন আলাদা হয়ে তাঁর নিজস্ব মন্দিরে। বিট্‌ঠলমন্দিরের পেছনে।

ঠিকই ব্যবস্থা, প্রাচীন পুরাণকাহিনীর সঙ্গে সম্বন্ধ রেখে। পুণ্ডলিকের পিতৃভক্তি দর্শন করতে বৈকুণ্ঠ থেকে শ্রীবিষ্ণু মর্তে

এসেছিলেন একলা, রুক্মিনীকে সঙ্গে আনেননি। রুক্মিনী এসেছিলেন বিষ্ণুর পেছনে পেছনে, তাঁর অদর্শনে চিন্তিত হয়ে। মনে সন্দেহ ছিল, প্রিয় বুঝি এসেছেন কৈশোর-নায়িকা শ্রীরাধার অভিসারে।

বিট্‌ঠলমন্দির প্রাচীন ভারতের স্থাপত্য-ভাস্কর্যের কোনো নিদর্শন নয়। কোনো নির্দিষ্ট শিল্পশৈলী অনুসারে এ মন্দির গড়া হয়নি। হিন্দু মন্দিরের গঠনশিল্প ভাস্কর্য আর কারুকলা নিয়ে যাঁদের আলোচনা-গবেষণা সেইসব প্রত্নতাত্ত্বিক শিল্পরসিক পণ্ডিতদের এ মন্দিরের প্রতি কোনো আকর্ষণ নেই।

শিল্প দিয়ে এ মন্দিরের রচনা নয়, সময়ের বন্ধনে এ মন্দির বাঁধা নয়। এ তীর্থের ভিত্তি পুণ্ডলিকের পরশ-পবিত্র একটি ইঁট, যার ওপর শ্রীবিষ্ণুবিট্‌ঠলের চিরস্থায়ী আসন। সেই আসনে ভক্তির চিরন্তন প্রণতি। সেই আসন, প্রভুর সেই উপস্থিতিটুকু ভক্তের পরম আকিঞ্চন, আর প্রভু শুধু ভক্তিরই কাঙাল। তাই যুগে যুগে পান্ধারপুর ধ্বংস হয়েছে, মন্দির চূর্ণ হয়েছে, তবু প্রভুর আসন টলেনি, —ভক্তের হৃদয় মরেনি।

হেমাদপন্থী শৈলীতে যাদবরাজ রামচন্দ্রের পৃষ্ঠপোষকতায় যে মন্দির গড়ে উঠেছিল তার চিহ্নমাত্র নেই। সে মন্দির যে আদৌ ছিল তার মূক সাক্ষী নিষ্প্রাণ তাম্রলিপি মাত্র। তারপর অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত পাঠান-মোগল শাসকরা বারে বারে বিট্‌ঠলমন্দির লুঠ করেছে, ধ্বংস করেছে। ভক্তরা বারে বারে বিট্‌ঠলবিগ্রহকে কোলে তুলে নিয়ে গিয়ে গোপন আশ্রয়ে রেখেছেন, আবার ভগ্নস্তূপের বুকে গড়েছেন নতুন মন্দির, মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করেছেন বিট্‌ঠলবিগ্রহ।

প্রথম ধ্বংস দিল্লীর পাঠান সম্রাটের হাতে। তারপর বাহমনি সুলতানদের হাতে। বাহমনি রাজ্য ভেঙে যাবার পর কখনো আহম্মদনগর কখনো বিজাপুরের সুলতানদের হাতে। পেটের মধ্যে বাঘনখ ঢুকিয়ে প্রতাপগড়ে শিবাজী যাকে খতম করেছিলেন, সেই আফজল খাঁর হাতে। আর সর্বশেষ আলমগীর আওরংজেবের হাতে।

তাই এই মন্দিরের দিকে তাকিয়ে নির্দিষ্ট কোনো শিল্পশৈলী, গঠনের কোনো নিয়মকানুন, রচনার কোনো পারম্পর্য আশা করা বৃথা। কাশীর বিশ্বনাথমন্দির, উজ্জয়িনীর মহাকালমন্দির বা সোমনাথের মন্দিরের মতো পান্ধারপুরের বিট্‌ঠলমন্দির আগাগোড়া নতুন করে গড়া মন্দির নয়। পুরোনো ভাঙা মন্দিরের সংস্কার, আর তাতে নতুন অংশের সংযোজন, বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ভক্তের আনুকূল্যে।

পুণ্ডলিক যেখানে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, মনে হয় সেই স্থানটি নড়েনি। পূর্বমুখী বিগ্রহের আজও সেই একই স্থানে অবস্থিতি। গর্ভগৃহ আর অন্তরালও মন্দিরের প্রাচীনতম অংশ,—অবশ্য ষোড়শ শতাব্দীর আগেকার নয়। হেমাদ্রি-মন্দিরের ধ্বংস আর এই গর্ভমন্দিরের প্রতিষ্ঠা,—এর মধ্যে প্রায় দুশো বছর কেটেছিল,—চতুর্দশ আর পঞ্চদশ শতক। এ দুশো বছর ধরে বিট্‌ঠলমন্দিরের চেহারা কেমন ছিল জানা নেই। অন্তরালের সামনের অংশটি সপ্তদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে পুরোনো ধ্বংসস্তূপের ওপর তৈরি। রুক্মিণীমন্দিরও সেই সময়কার।

বিট্‌ঠলমন্দিরের বিস্তৃতি আওরংজেবের মৃত্যুর পর থেকে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে স্বাধীন মারাঠা জাতি এই মন্দিরকে পূর্ণবিকশিত করেছিল। পেশোয়া হোলকার এবং বিভিন্ন মারাঠা রাজপুরুষ আর শ্রেষ্ঠীরা অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত এই মন্দিরকে নতুন করে সাজিয়েছিল। ষোড়শস্তম্ভ মণ্ডপ, দীপমালা, আর আশপাশের নতুন নতুন মন্দির গড়ে উঠেছিল। মন্দিরচত্বর ঘিরে বিশাল প্রাচীর এই সময়ের। শুধু বিট্‌ঠলমন্দির নয়—বিট্‌ঠলতীর্থ পান্ধারপুরের নবজাগৃতি পেশোয়া যুগে। এতো বিরাট বিরাট বাড়ি,—নদীতীরের ঘাট সবই এ যুগের।

বিট্‌ঠলজীর অবশ্য তাতে সুখও নেই দুঃখও নেই। তিনি আড়ম্বরময় মন্দির চাননি, স্বর্ণসিংহাসন চাননি। নদীতীরে মুক্ত আকাশের নিচে তিনি আবির্ভূত হয়েছিলেন,—প্রথম ভক্ত তাঁকে

দাঁড় করিয়েছিলেন একটি ইঁটের ওপর। সেই ইঁটের ওপর দাঁড়িয়ে মানুষের ভক্তি তিনি অদূর থেকে দেখেছিলেন,—আজও সেই ভাবে দাঁড়িয়ে দেখছেন। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে কখনো জোয়ারে কখনো ভাঁটায় ভক্তির ধারা বয়ে চলেছে। কখনো সুদিনের আলোয় কখনো দুর্দিনের অন্ধকারে।

॥ ২২ ॥

সুদিন আর কই? সেই পঞ্চদশ শতকের দিন। তখন শুধুই দুর্দিন। দুর্দিনের পর দুর্দিন। দুর্বৎসরের পর দুর্বৎসর।

তখন বারকরীরা পান্ধারপুরে আসত বছরের একটি মাত্র দিনে,—আষাঢ়ের শুক্লা একাদশী তিথিতে। মহতী তিথি,—এই তিথিতে বিট্‌ঠলদেব পান্ধারপুরে পুণ্ডলিকের সামনে আবির্ভূত হয়েছিলেন। এই দিন মহোৎসবের দিন। এই দিনটিতে প্রভুসন্নিধানে এসে সারা বছরের বিরহ-আকূতির চরিতার্থতা।

একবার তারা এল। আকাশ জুড়ে ঘন বর্ষা সেবার—পথঘাট ডোবা, চারদিকে প্লাবন। জলে-ডোবা কতো পথ সাঁতরে তারা এসে পৌঁছল পান্ধারপুরে।

বিট্‌ঠলবিগ্রহ নেই। মন্দিরের গর্ভকক্ষ শূন্য অন্ধকার। অন্ধকার দৃষ্টি জুড়েও। এই অন্ধকারে কোথায় লুকোলেন বিট্‌ঠলজী? প্লাবন নামল চোখে। পান্ধারপুরকে অশ্রুপ্লাবনে ডুবিয়ে কোথায় গেলেন পান্ধারীনাথ?

ভীমার তীর পরিত্যাগ করে তিনি গেছেন তুঙ্গভদ্রার তীরে। সেখানে প্রতাপশালী হিন্দুরাজ্য বিজয়নগর। বিজয়নগরের নরপতি বিট্‌ঠল-অনুরাগী, বিধর্মী শাসকের হাতে প্রভুর লাঞ্ছনা সহ্য করতে পারেননি। বিগ্রহ তুলে নিয়ে গিয়েছেন নিজের রাজধানীতে।

বিজয়নগরের দেবমন্দিরে আশ্রয় পেয়েছেন পান্ধারপুরের দেবতা। পঞ্চদশ শতকের শেষ পাদের ঘটনা।

মুসলিম অভিযানের বিরুদ্ধে হিন্দু ভারতের শেষ প্রতিরোধ বিজয়নগর। ১৩৩৬ খৃষ্টাব্দে তুঙ্গভদ্রার তীরে এই স্বাধীন হিন্দু রাজ্যের প্রতিষ্ঠা, ক্রমে কন্যাকুমারী পর্যন্ত বিস্তৃতি। দিল্লীর পাঠান সম্রাটের আনুগত্য অস্বীকার করে এর কিছু পরেই মুসলমান বাহমনি রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। দেড়শো বছর যেতে না যেতেই বাহমনি রাজ্য পাঁচভাগে ভাগ হয়ে গেলেও বিজয়নগর অটুট। ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম পাদ বিজয়নগরের শ্রেষ্ঠ যুগ। সিংহাসনে শ্রেষ্ঠ রাজা কৃষ্ণদেব রায়।

কৃষ্ণদেব রায় বিষ্ণুর পরমভক্ত, বিট্‌ঠল তাঁর ইষ্টদেবতা। বিট্‌ঠলের জন্যে তিনি এক নতুন মন্দির নির্মাণ করেছেন। বিশাল মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করেছেন বিট্‌ঠলস্বামীকে। বিট্‌ঠলের দয়ায় যুদ্ধে জয়লাভ করেছেন রাজা। তাই মন্দিরের নাম দিয়েছেন বিজয়-বিট্‌ঠল।

শুধু রাজা কৃষ্ণদেব রায়ের স্বামী নন বিট্‌ঠল, তিনি সারা রাজ্যের স্বামী। প্রজাবৃন্দের প্রাণের ঠাকুর। তারা তাঁকে ভালোবেসে বিটোবা বিঠুয়া প্রভৃতি আদরের নামে ডাকে। সারা রাজ্য জুড়ে ভক্তির বন্যা বইছে। মহারাষ্ট্রে বারকরীদের কণ্ঠ রুদ্ধ, প্রেমভক্তির অমিয় ধারা নির্গত হচ্ছে বিজয়নগরের হরিদাসী সম্প্রদায়ের কণ্ঠ থেকে।

হরিদাসীরাও বারকরীদের মতো। তারাও ভক্ত, তারাও কবি। কেবল ভাষায় তারা আলাদা। বারকরীদের ভাষা মারাঠী, হরিদাসীদের ভাষা কন্নড। কাব্যমাধুর্যের ধারায় তাদের প্রাণে ভক্তিরস প্রবাহিত। তারা পথে পথে ফেরে, মন্দিরা-মৃদঙ্গ বাজায়, সুরছন্দে বিট্‌ঠলবন্দনা করে। বিট্‌ঠলভক্তিকে সাধারণের মনে ছড়িয়ে দেয়। তাদের প্রাণে নতুন প্রেরণা এনেছেন মহারাষ্ট্রের এক কবি। তাঁর নাম পুরন্দর দাস। পুণার অদূরে পুরন্দরগড়ে তাঁর

জন্ম। বিজয়নগর রাজ্যে তাঁর বাস। কন্নড ভাষাকে আপন করে নিয়ে হরিদাসী ভক্ত সম্প্রদায়ের তিনি শিরোমণি কবি, কন্নড ভক্তি-সাহিত্যের তিনি উদ্গাতা। বিট্ঠলহরিই তাঁর প্রাণের দেবতা। তাঁরই নাম তিনি গান। প্রভুর নামে তিনি নিজেকে পুরন্দর-বিট্ঠল নামে অভিহিত করেছেন।

এদিকে বিট্ঠলবিরহে পান্ধারপুর অন্ধকার। বিরহের পাষাণভার।

এমনি সময়ে পৈঠান থেকে একজন এলেন পান্ধারপুরে। শূন্য মন্দিরের সামনে এসে দাঁড়ালেন। তাঁর নাম ভানুদাস। নাও বাঙালী ভাই, একবার জয়ধ্বনি করো তাঁর নামে। বলো,—জয় ভানুদাস, জয় বিট্ঠল, রামকৃষ্ণ হরি।

কপালে দুহাত ছুঁইয়ে ভানুদাসের নামে প্রণাম করলেন দেশপাণ্ডেজী। আমরাও করলাম।

চাতালের একপাশে সেই ঝাঁকড়া নিমগাছ। বুড়ো গাছ অনেকদিনের, ঝিরঝিরে ছায়া। গাছের গোড়াটি শান-বাঁধানো। সেইখানে বসে দেশপাণ্ডেজী শোনাচ্ছেন ভক্ত ভানুদাসের কথা। আমরা দুজন দুপাশে আছি, আরো বেশ ক-জন শ্রোতা এসে জুটেছেন। ভানুদাসের জন্ম পৈঠানে, দেশপাণ্ডেজীও পৈঠানের বাসিন্দা। তাই ভানুদাসকে স্মরণ করতে তাঁর বিশেষ গর্ব, একথা তিনি আগেই বলে নিয়েছেন।

দেশপাণ্ডে বললেন,—সেবার পরপর আকাল গিয়েছে মহারাষ্ট্রে। অর্ধেক লোক উজাড় হয়ে গিয়েছে দুর্ভিক্ষে। সবচেয়ে ক্ষতি হয়েছে পান্ধারপুর ও আশপাশের এলাকার। খিদের জ্বালায় মানুষ যখন ছটফটিয়ে মরছে তখন রাজ্যের খাদ্য মজুদ আছে বিধর্মী শাসকের গোলায়। মঙ্গলবেড়ের শস্যগোলা খুলে প্রজাদের মধ্যে বিলিয়ে দেবার অপরাধে শাসকের হাতে নিগৃহীত হয়েছেন রাজকর্মচারী দামাজীপন্থ। ভাগ্যের অনুগ্রহে তাঁর মাথাটি কাটা পড়েনি।

এ বছরও বৃষ্টির দেখা নেই। ফুটিফাটা শুকনো মাটি, শুকনো ডালে মরা হলুদ পাতা। আষাঢ় মাসের আকাশ থেকে নিষ্ঠুর অগ্নিবৃষ্টি। সারা দেশ জুড়ে মৃত্যুর রাজ্য।

এতো মৃত্যু পেরিয়েও আষাঢ়ী উৎসবে বারকরীরা খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে পান্ধারপুরে আসত, যদি প্রভু থাকতেন।

কিন্তু প্রভু তো নেই। তাই কেউ আসেনি। কেবল এসেছেন ভানুদাস ভীমার শুকনো বুকের পাথর পার হয়ে। অশক্ত পায়ে নির্জীব দেহটাকে বয়ে নিয়ে।

পরিত্যক্ত মন্দির। বিগ্রহ নেই, পূজা নেই, পূজারী নেই। কোটরগত চোখ আর কঙ্কালের মতো চেহারা নিয়ে কটি ভাগ্যতাড়িত ভিক্ষুক ধূলায় বসে আছে। তাদের তৃষ্ণার্ত গলা দিয়ে শব্দ ফুটছে কি ফুটছে না,—

জয় জয় বিট্‌ঠল রামকৃষ্ণ হরি।

ভানুদাস সেই দেবতাহীন জীর্ণ মন্দিরের ধূলায় বসে পড়লেন। মন্দিরে কোথায় বিট্‌ঠলজী,—প্রভুর দর্শন যে পেতেই হবে!

যাত্রা শেষ হয়নি। আবার উঠে দাঁড়ালেন ভানুদাস। শ্লথপায়ে অতিক্রম করলেন মুমূর্ষু জনপদ। তারপর চললেন বিজয়নগর,—সেখানে প্রভুর দেখা মিলবে। পৈঠানে গোদাবরী নদী তিনি অতিক্রম করেছেন, পান্ধারপুরে পৌঁছতে পার হয়েছেন ভীমা-চন্দ্রভাগা। এবার পার হলেন কৃষ্ণা-তুঙ্গভদ্রা। কতো পথ কতো দিন ধরে কতো কষ্টে যে হাঁটলেন তার হিসেব নেই।

অমানিশার তৃতীয় প্রহরে একদিন ভানুদাস পৌঁছলেন লক্ষ্যস্থল বিজয়নগরে। বিজয়-বিট্‌ঠল মন্দিরের সামনে। সেই মন্দিরে তাঁর হারানো দেবতা আসীন।

পহেলা পহরমে সব কোই জাগে,
দুসরা পহরমে ভোগী,
তিস্‌রা পহরমে তস্কর জাগে
চৌঠা পহরমে যোগী।

তিন প্রহর রাতে সারা নগরে সবাই ঘুমচ্ছে,—প্রাসাদের শয়নমন্দিরে ঘুমচ্ছেন রাজা, বিট্‌ঠলদেউলের শয়নমন্দিরে ঘুমচ্ছেন দেবতা। শুধু জেগে আছে তস্কর,—আর সশস্ত্র প্রহরীরা যারা অষ্টপ্রহর মন্দির পাহারা দেয়।

কিন্তু আশ্চর্য তস্কর ভানুদাস। তাঁর পায়ের শব্দ শুনেই বুঝি প্রতিটি প্রহরী ঘুমিয়ে পড়ল। শেজ-আরতির পর মন্দিরদ্বারে অর্গল পড়ে। কিন্তু ভানুদাসের জন্যে কোন্ মন্ত্রে দ্বার হাট হয়ে গেল। ভানুদাস ঢোকামাত্র আলোয় আলো হয়ে গেল অন্ধকার গর্ভগৃহ।

ভানুদাস দেখলেন তাঁর হারানো ঠাকুরকে।

বিট্‌ঠলমন্দিরের পূর্বদ্বার সূর্যের আলোয় জ্বলজ্বল করছিল। সেই দ্বার দিয়ে বিরামহীন জনস্রোত। সারা চাতাল ভরে গিয়েছে ভক্ত জনতায়। দক্ষিণ দীপস্তম্ভের নিচে দাঁড়িয়ে এক দীর্ঘদেহী যাত্রী তুকারামের গান ধরেছে উদাত্ত কণ্ঠে। জনগুঞ্জনকে ছাপিয়ে চাতালের কোণে কোণে ছড়িয়ে যাচ্ছে তার সুরেলা গলা,—

প্রভু, দাঁড়াও আমার আঁখির আগে
আর কিছু না হেরি,—
আমার সব ভাবনা সব কামনা
তোমার চরণ ঘেরি।
সাগরজলে লবণ যেমন
অন্তরঙ্গ তুমি তেমন,
তোমার সনে একাত্ম মন
ওগো আমার হরি।
প্রাণ রেখেছি পায়ের তলে
বুক ভেসেছে চোখের জলে
মোর নিবেদন করো গ্রহণ,—
আর কোরো না দেরি॥

স্তব্ধ হলেন দেশপাণ্ডেজী। জনস্রোতের দিকে তাকিয়ে রইলেন কয়েক পলক। কয়েক মুহূর্ত শুনলেন বিট্‌ঠল-আকুতির সুর।

তারপর আবার বলতে লাগলেন,—

সেই গভীর রাত্রে সেই নির্জন মন্দিরে বিট্‌ঠলবিগ্রহের মুখোমুখি ভানুদাস। পলক পড়ে না চোখে, শুধু জলে ভেসে যায়। অশ্রুধোয়া নির্নিমেষ দৃষ্টির সামনে হারানিধি জ্বলজ্বল করে।

পায়ে লুটিয়ে পড়লেন ভানুদাস।

প্রভু, তোমার ভক্তদের ছেড়ে কেমন করে তুমি এখানে রয়েছ? কী পাষাণ প্রাণ তোমার? একবাবও কি মনে পড়ে না আমাদের?

বিট্‌ঠলদেব হাসলেন।

সত্যিই আমি পাষাণ ভানুদাস?

নিশ্চয়! তোমাকে আমি চিনিনে? পাষাণ বলে সারা বৃন্দাবনকে কান্নায় ভাসিয়ে তুমি মথুরায় অন্তর্ধান করেছিলে? পাষাণ বলেই তো পান্ধারপুরকে বিষাদস্রোতে ডুবিয়ে বিজয়নগরে এসেছ,—এখানে রাজসুখে কাল কাটাচ্ছ!

যদি জানো তাহলে আবার এলে কেন?

ফিরিয়ে নিয়ে যেতে তোমাকে। মনে পড়ে না,—বৃন্দাবনের কী অবস্থা করেছিলে? পান্ধারপুরেও তাই,—পাখিরা গান গায় না, ধেনুরা যায় না গোষ্ঠে,—চন্দ্রভাগা হারিয়েছে তার কল্লোলধ্বনি। শূন্য মন্দিরে বারকরীরা লুটিযে লুটিয়ে কাঁদছে,—তোমাকে আমার সঙ্গে ফিরে যেতেই হবে প্রভু!

মহা সমস্যায় পড়লেন বিট্‌ঠল ভগবান। পান্ধারপুর তাঁর আবির্ভাব-ভূমি, পান্ধারপুরের ভক্তরা তাঁকে ডাকছে। এদিকে বিজয়নগরে তাঁর বিজয়-প্রতিষ্ঠা, রাজা কৃষ্ণদেব তাঁর পরম ভক্ত।

বললেন,—বেশ, আমি ভেবে দেখি। আজ রাত্রিটা তুমি মন্দিরদ্বারে অপেক্ষা করো। কাল দেখা যাবে।

ছাড়বার পাত্র নন ভানুদাস। ছাড়বার জন্যে দুরন্ত দুর্গম পথ ভেঙে

এতো দূর একলা আসেননি। জোড়হাতে বললেন,—প্রভু, আমার এই প্রার্থনায় পান্ধারপুরের সহস্র ভক্তের আকিঞ্চন মিশে আছে। এই আকিঞ্চন সত্যিই যে তোমার মন স্পর্শ করল তা তো বুঝতে পারলাম না।

বিট্‌ঠলদেব নিজের গলা থেকে একটি তুলসীমালা নিয়ে ভানুদাসের গলায় পরিয়ে দিলেন।

এই নাও আমার গলার মালা। তোমাকে দেখে সত্যিই যে প্রীত হয়েছি এই মালা তার নিদর্শন।

ভোরবেলা রক্ষীরা জাগল, পুরোহিতরা এলেন। মন্দিরদ্বার খোলা। গর্ভগৃহের সামনে কে এক অচেনা লোক অঘোরে ঘুমচ্ছে। গলায় বিগ্রহের সপ্তলহরী রত্নহার,—যে মহামূল্য হার দিয়ে স্বয়ং রাজা তাঁকে বরণ করেছিলেন।

কে লোকটা?

মহা তস্কর তাতে সন্দেহ নেই। দেবতার ধন চুরি করতে এসেছিল, —দেবতাই তাকে ঘুম পাড়িয়ে ধরিয়ে দিয়েছেন।

বল্, কে তুই? কেমন করে ঢুকলি মন্দিরে?

কথা নেই লোকটার মুখে। শুধু বিহ্বল দৃষ্টি।

চোরের মার কঠিন মার। মারের পরে নিয়ে চলল রাজসকাশে। রাজা দিলেন মৃত্যুদণ্ড। মন্দিরের সামনে শূলে বিদ্ধ করে পাপীকে মারা হোক।

মাঝখানে তীক্ষ্ণ শূল। পাশে শৃঙ্খলিত তস্কর। সামনে রাজপুরুষরা। চারদিক লোকে লোকারণ্য। আশ্চর্য কিন্তু লোকটা। হাজার মারেও টলেনি। হাজার প্রশ্নের একটা উত্তর দেয়নি। রাজনির্দেশ কানে নিশ্চয়ই ঢুকেছে,—একটু পরে প্রাণ যাবে, তা নিয়ে কোনো আক্ষেপ নেই।

হাতে শেকল পায়ে শেকল। তেমনি শেকল-বাঁধা অবস্থায় রাজপথ দিয়ে টানতে টানতে রাজার বিচারশালা থেকে দেবতার

মন্দিরের সামনে নিয়ে এসেছে। দেবতা প্রত্যক্ষ করবেন দণ্ড। দেবমন্দিরের মুক্ত দ্বারের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রয়েছে। আর এতোক্ষণে স্বর ফুটেছে গলায়,—

মারো আমায় মারো হে নাথ
দারুণ আঘাত করো,
যন্ত্রণাতে পাগল করে
সংজ্ঞা আমার হরো।
কর্ণ আমার বধির করো
অন্ধ করো আঁখি,
রক্ত-ঝরা সারা দেহ
কাঁপুক থাকি থাকি।
পায়ে আমার শেকল পরাও
বাঁধো দুটি হাত,—
বিষের কাঁটার চাবুক হেনে
শাসন করো নাথ।
মর্মভেদী অগ্নিজ্বালায়
দগ্ধ করো মোরে,—
অস্ত্র দিয়ে কাটো আমায়
বসাও শূলের পরে।
দুঃখ আঁধার ভয়ের পাথার
করো আমায় পার,—
শিরে আমার ঝরুক তোমার
স্নেহ অনিবার॥

হঠাৎ চোখের সামনে ঘটতে লাগল পরমাশ্চর্য ঘটনা। শূল রূপান্তরিত হোলো বৃক্ষকাণ্ডে,—কাণ্ডের গা দিয়ে বার হতে লাগল

শাখাপ্রশাখা। শাখাগুলি মুঞ্জরিত হতে লাগল নবীন পাতায় আর সুগন্ধি ফুলে।

প্রাণদণ্ডের শূল দেখতে দেখতে একটি নধর শ্যামল কদমগাছে পরিণত হোলো।

সহস্র লোকের বিস্ফারিত চোখ, মূক কণ্ঠ,—বন্দীর পায়ে লুটিয়ে পড়লেন রাজা কৃষ্ণদেব রায়। প্রাণে তাঁর মর্মরিত হোলো বিট্‌ঠল-ভগবানের বাণী,—

আমার পরম ভক্ত ভানুদাস তোমার সামনে। তার আমন্ত্রণ আমি নিয়েছি। তার সঙ্গে আমি ফিরে যাব পান্ধারপুরে।

ভানুদাসের এই কাহিনীর কোনো ঐতিহাসিক সমর্থন নেই। ভানুদাসের জন্ম ১৪৪৮ খৃষ্টাব্দে,—১৫১৩ খৃষ্টাব্দে সমাধি। আয়ু পঁয়ষট্টি বছর। বিজয়নগরের রাজা কৃষ্ণদেব রায় সিংহাসনে আরোহণ করেন ১৫০৯ সালে। রাজত্ব করেন ১৫৩০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত। দুজনেই সমসাময়িক। তবে কৃষ্ণদেব রায় যখন রাজা হন তখন ভানুদাসের পরিণত বয়স আর কৃষ্ণদেব রায়ের রাজত্বশেষের সতেরো বছর আগে ভানুদাসের জীবনাবসান।

শুধু বিজয়নগরের শ্রেষ্ঠ রাজা নন, ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নরপতি বলে কৃষ্ণদেব রায়ের খ্যাতি। তিনি সত্যিই বিজয়নগরের বিজয়রাজ। সমস্ত দক্ষিণ ভারত তিনি জয় করেছেন, উড়িষ্যারাজ গজপতি প্রতাপরুদ্রের দম্ভ চূর্ণ করেছেন, বিজাপুরের সুলতানকে পরাস্ত করে গুলবর্গার দুর্গ ধূলিসাৎ করেছেন। সেইসঙ্গে পরাজিত শত্রুর প্রতি দয়াদাক্ষিণ্যের জন্যেও খ্যাতি অর্জন করেছেন।

কৃষ্ণদেব রায়ের সিংহাসনলাভের অনেক আগে থেকেই বিজয়নগর রাজপরিবার বিট্‌ঠলভক্ত। রাজা কৃষ্ণদেব রায় তার ওপর মহা বিজয়ী। তাঁর ইষ্টদেবতাকে তিনি বিজয়-বিট্‌ঠল নামে অভিষিক্ত করবেন,—তা খুবই স্বাভাবিক।

কৃষ্ণদেব রায়ের তৈরি বিজয়-বিট্‌ঠল মন্দির আজো বর্তমান। তাঁর মৃত্যুর পঁয়ত্রিশ বছর পরে দাক্ষিণাত্যের পাঁচ মুসলিম সুলতান একসঙ্গে হাত মিলিয়ে বিজয়নগরের সঙ্গে লড়ে যায়। তালিকোটের যুদ্ধে জিতে তারা বিজয়নগর লুঠ করে। তবে মন্দিরটি বেঁচে গিয়েছিল। হাম্পির এই মন্দির আজও পর্যটকদের আকর্ষণ করছে। তারা মন্দিরের স্থাপত্য-ভাস্কর্যের বহিরঙ্গ দেখে আশ্চর্য হচ্ছে,—গর্ভগৃহ কিন্তু বিগ্রহহীন। ঐতিহাসিকরা হলফ করে বলতে পারেন না সেই মন্দিরে পান্ধারপুরের বিট্‌ঠলবিগ্রহ সাময়িক আশ্রয় পেয়েছিলেন কি না।

ভানুদাসের কাহিনীও ইতিহাসের পাতায় লেখা নেই। আছে জনগণের মনের পাতায়। সে লেখা শতাব্দীর পর শতাব্দী পরেও অম্লান। সেই কাহিনীর সম্মানেই আজ এখানে এতো ভিড়, এতো উদ্বেলিত ভক্তির উচ্ছ্বাস, এতো উৎসব।

সেই কাহিনীর উপসংহার টানলেন দেশপাণ্ডেজী।

রাজা কৃষ্ণদেব রায়ের মনে দুঃখ নেই। বিট্‌ঠলপ্রভুর অলৌকিক মহিমা দেখে তিনি ধন্য হয়েছেন। ভক্ত ভানুদাসের চরণ স্পর্শ করে কৃতার্থ হয়েছেন। বিট্‌ঠলবিগ্রহকে তিনি হাসিমুখে ফেরত দেবেন। রাজ্যের শ্রেষ্ঠ ভাস্করকে ডেকে তৈবি করাবেন নতুন বিগ্রহ।

হাঁক দিলেন,—প্রস্তুত হও, চতুর্দোলা সাজাও।

ঢাকঢোল কাঁসিবাঁশি সব নিয়ে বাদকরা প্রস্তুত,—সার বেঁধে দাঁড়িয়েছে পতাকাবাহীর দল। ফলমূল নৈবেদ্যের উপকরণ ঝুড়িতে, আবরণ আভরণ পেটিতে,—বাহকরা তৈরি। চতুর্দোলায় চেপে বিশাল শোভাযাত্রা করে বিট্‌ঠলপ্রভু পান্ধারপুরে প্রত্যাবর্তন করবেন। তাঁর গলায় দুলবে রাজনিবেদিত সপ্তলহরী রত্নহার। সেটি রাজা আবার তাঁর গলায় পরিয়ে দিয়েছেন।

ভক্ত ভানুদাস বললেন,—না রাজা না, ও হার আপনি খুলে নিন। আমাদের ঠাকুর দুঃখীর ঠাকুর, ওঁর গলায় মানায় না। আপনার নতুন বিগ্রহের গলায় ও হার শোভা পাবে।

আরো বললেন,—না রাজা না, আমাদের ঠাকুর চতুর্দোলায় চড়বেন না। প্রভুকে আমার দুহাতের আলিঙ্গনে বেঁধে বুকে করে আমি নিয়ে যাব।

ভক্ত ভানুদাসের কোলে চড়ে বিজয়নগর থেকে নিজের ঘরে ফিরে এসেছিলেন পান্ধারপুরের বিগ্রহ। শূন্য মন্দিরে ভানুদাস আবার তাঁকে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এইদিনে,—কার্তিকের এই শুক্লা একাদশী তিথিতে।

সেই থেকে বিট্‌ঠলমন্দিরে এই কার্তিকী উৎসব। আষাঢ়ের যে তিথিতে তাঁর আবির্ভাব,—পুনরাবির্ভাব কার্তিকের সেই একই তিথিতে। তাই ভানুদাসের স্মরণে ঘণ্টাধ্বনি,—জয়ধ্বনি ভানুদাসের নামে,—

জয় ভানুদাস, জয় বিট্‌ঠল রামকৃষ্ণ হরি।

ভানুদাসের কাহিনী শুনে কানহাইয়ালালের মতো কঠোর বাউণ্ডুলের চোখও ছলছলিয়ে উঠেছিল। চাপা গলায় বললে,—

আহা, চেরিল মেয়েটা যদি থাকত! বড়ো খুশি হোতো এসব কথা শুনে!

আমারই মনের কথা বললে।

॥ ২৩ ॥

কিন্তু কোথায় চেরিল? কোথায় পূর্ণ চৈতন্যজী? কোথায় আঠার মত লেগে থাকা নাথুরাম? এতোদিনের পদযাত্রায় আরো অনেক সহযাত্রী কাছাকাছি এসেছিল, পাশাপাশি হেঁটেছিল। মুখচেনা তো সংখ্যাতীত। কোথায় তারা সব? ভিড়ের মধ্যে কোনো আলাপীরই তো দেখা নেই, কোনো মুখই তো চোখে এসে আটকাচ্ছে না?

এই নাকি বারকরী যাত্রার রীতি! দিনের পর দিন পাশাপাশি

হাঁটো, সন্ধ্যেবেলা পাশাপাশি বসে গান গাও আর ধর্মালোচনা করো, রাত্রিবেলা অচেনা তাঁবুতে বা অতিথিশালায় পাশাপাশি শুয়ে ঘুমোও। তারপর পান্ধারপুর পৌঁছলে, ভীমায় অবগাহন করলে, বিট্‌ঠলমুখ দর্শন করলে,—ব্যস, তখন আর কে কার? তখন আর দল নেই বল নেই,—সব চেনাই পলকে খসে পড়েছে।

শুধু গায়ের সঙ্গে আটকে আছে কানহাইয়ালাল। পূর্বদ্বারের প্রচণ্ড ভিড়ের মধ্যে কঠোর মুষ্টিতে আমার ডানহাতটা চেপে ধরে আমাকে বাইরে বার করে এনেছে।

তারপর? এবার কী করা?

সেই করবীগাছের ছায়ায় দাঁড়ালাম। বেশ মিঠে লাগছে ছায়াটা। এখন দ্বিপ্রহর প্রায়। আকাশে কুয়াশার চিহ্নমাত্র নেই,—উড়ন্ত পাখির ডানায় মাখামাখি হয়ে যাবার মতো নীল রঙ। ঝাঁঝাঁ করছে রোদ।

মন্দির থেকে বার হবার মুখে পরিশ্রমও কম হয়নি,—কানহাইয়ালালের শাদা পিরাণের পিঠটা ঘামে কালো হয়ে গেছে। তবু দাঁড়িয়ে বিশ্রাম করতে মন চায় না। বললাম,—চলো কানহাইয়ালাল, শহর-বাজারটা এক চক্কর ঘুরে আসি।

ঘুরে কী হবে দাদা?

বাঃ? চারদিক ঘুরে কোথায় কী আছে দেখে নিতে হবে না?

হবে, হবে। কিন্তু এখন আর পা ব্যথা করছে না? বসতে ইচ্ছে করছে না? আসলে খুঁজতে হবে হারানো মানুষগুলোকে,—তাই না?

ঘাড় নাড়লাম।

সত্যি কানহাইয়ালাল, সকাল থেকে এতোক্ষণ মন্দিরে কাটালাম,—কাউকে তো দেখলাম না! চলো একটু পথে পথে ঘুরি, যদি চোখে পড়ে কেউ।

কানাহাইয়ালাল বললে,—

না দাদা, ওতে কোনো লাভ নেই। ঘুরতেই যদি হয় বিকেলবেলা নগর-পরিক্রমায় যোগ দিলেই চলবে।

কিন্তু সে তো হাজার লোকের শোভাযাত্রা কানহাইয়ালাল,—তার মধ্যে কাকে খুঁজে পাব?

মাথা নাড়ল কানহাইয়ালাল।

কাউকে পাবেন না। এখন পথে পথে ঘুরেও পাবেন না। অনেক বেলা হয়ে গিয়েছে।

তাহলে?

তাহলে চলুন ঐ সামনের দোকানটায়,—খিদে পায়নি? আসুন, কিছু খেয়ে নিই। সেইসঙ্গে মন্দিরদ্বারের ওপর নজর রাখি।

তাই হোলো। দোকানের সামনের রাস্তার ধারে বেঞ্চিতে পা ছড়িয়ে বসা। দোকানীর ঘটির জলে ভালো করে হাতমুখ ধোওয়া। সুস্বাদু খাদ্য গলাধঃকরণ করা। সদ্যসেঁকা জওয়ারের মোটা রুটি, আগুন-গরম ভিণ্ডি-কচুর তরকারি আর মাসকলাইএর শীতল ডাল। চিটচিটে রসে পাকানো কটকটে লাড্ডু। সবশেষে গ্লাসভর্তি ফুটন্ত চায়ের সঙ্গে একমুঠো করে মুচমুচে নামকিন।

খিদে পেয়েছিল দারুণ, ভরপেট আহারের পর চায়ে চুমুক দিতে না দিতে ঘুমে দুচোখ একটু জড়িয়ে এসেছে। কানহাইয়ালাল ঠেলা দিল।

দেখুন দেখুন দাদা,—ঐ না?

কে? কী দেখব?

ঐ যে হনহনিয়ে চলেছে, আমাদের নাথুরাম না? ও নাথুরাম! ওহে নাথু!

নাথুরামই বটে। তড়বড়িয়ে ছুটছে ভিড়ের ধাক্কাকে তোয়াক্কা না করে। কানহাইয়ালালের হাঁক তার কানে পৌঁছল। থমকে দাঁড়িয়ে চমকে তাকাল। তারপর তেমনি ব্যস্তসমস্ত হয়ে এসে দাঁড়াল আমাদের সামনে।

শুকনো মুখ-চোখ। কেমন পাগল পাগল ভাব।

মেমসায়েবকে দেখেছেন আপনারা? মেমসায়েবকে?

না, দেখিনি তো? কোথায় গেল? কোথায় তোমরা ছিলে সারা সকাল?

দেখেননি না? একবারও চোখে পড়েনি? আচ্ছা, আমি চলি।

আমি জোর করে তার হাত ধরলাম।

কী হয়েছে বলো তো? হারিয়ে গেছে নাকি চেরিল? মহারাজ কোথায়?

নাথুরাম একটু ঢোক গিলে বললে,—

মহারাজ তো জ্ঞানেশ্বর-আশ্রমে। সকালবেলা আমরা একসঙ্গে এলাম জ্ঞানেশ্বরজীর পূজা নিয়ে। পূজা শেষ হলে তিনি ফিরে গেলেন বিশ্রামের জন্যে।

আর চেরিল? চেরিল ছিল না তোমাদের সঙ্গে?

ছিল বৈকি। একসঙ্গেই তো আমরা এলাম। হাতি দেখে কী ফুর্তি, কী হাততালি! তবে মেমসায়েবের মেজাজ জানেন তো? ঐ সিঁড়ির কাছে পৌঁছে হঠাৎ বেঁকে দাঁড়াল। ধপ্ করে বসে পড়ল নামদেবের সমাধির সামনে।

কেন?

বললে,—তোমরা যাও, আমি পরে যাব। আমি বারকরী নই, বারকরীদের সঙ্গে আমি মন্দিরে ঢুকব না।

তারপর?

তারপর আর কী? মহারাজের পেছনে পেছনে আমরা সবাই মন্দিরে গেলাম। বিগ্রহ দেখলাম, পূজো দিলাম। তারপর সবাই যে যার এদিক ওদিক ছড়িয়ে পড়ল। আমি শুধু দরজার সামনে হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইলাম আর মুখ বুঁজে হাজার লোকের ধাক্কা খেলাম।

চেরিল এল না?

কই, চোখে তো পড়ল না!

আশ্চর্য! আমরাও এই রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে হাতি দেখেছিলাম। আমরাও বারকরীদের সঙ্গে মন্দিরে না ঢুকে বাইরে অপেক্ষা

করেছিলাম, নামদেবের সমাধির সামনে খানিকক্ষণ বসেছিলাম। কই, আমাদের চোখেও তো পড়েনি!

নাথুরাম বললে,—তারপর মন্দিরের সারা চাতাল বনবন করে কতোবার যে ঘুরলাম ঠিক নেই। কোথায় মেমসায়েব?

আমরাও ঘুরেছি,—চেরিলের দেখা পাইনি। নাথুরামকে শুধোলাম,—তা এখন আসছিলে কোথা থেকে?

মন্দির থেকে বার হয়ে আবার ছুটেছিলাম আশ্রমে। দেখি, ডেরায় যদি ফিরে থাকে! সেখানেও নেই। মহারাজকে জিজ্ঞেস করলাম, দলের যাকে পেলাম তাকেই জিজ্ঞেস করলাম,—কেউ মেমসায়েবকে দেখেনি। আচ্ছা, এবার আমি যাই, আবার খুঁজে দেখি!

কাঁধে হাত রেখে কানহাইয়ালাল শুধালো,—সকাল থেকে পেটে কিছু পড়েছে নাথুরাম?

বলো কি? খাবার সময় আছে নাকি এখন?

কানহাইয়ালাল চেপে ধরে নাথুকে বেঞ্চিতে বসাল।

নাও, আগে কিছু খাও। ঠিক পাওয়া যাবে,—বাচ্চা তো নয়। অতো ভাবনা কিসের?

উদ্বিগ্ন আমরাও। তবে নাথুরামের উদ্বেগের রকমই আলাদা। চেরিলের সঙ্গে তার বিচিত্র সম্পর্ক,—যেমন ভাব তেমনি ঝগড়া। ভাবের মূলে মহারাজ, ঝগড়ার কারণও মহারাজ। মহারাজই তাদের মাথাদুটো খেয়েছেন। সারাটা বারকরীযাত্রা তারা এক লাইনে হেঁটেছে,—মহারাজের একপাশে একজন আর একপাশে একজন। প্রতি সন্ধ্যায় মহারাজের সেবার ভার তারা ভাগাভাগি করে নিয়েছে। কে মহারাজের কতোটা কাছের,—তাই নিয়ে তাদের দ্বন্দ্ব-কোঁদল।

মনে মনে চেরিলের ওপর নাথুরামের দারুণ টান। সেই টানটাকে সে কথার ঠাট্টা আর কপট কলহ দিয়ে ঢেকে রাখে। তার ছোটোখাটো সুখসুবিধের ওপরও নাথুর তীক্ষ্ণ নজর। পথে হাঁটতে চেরিলের পায়ে ফোস্কা পড়েছে,—সে ফোস্কার খবরদারি করাও তার

চাই। এ নিয়ে কোনো মন্তব্য করলে সে তা হাসির ফুৎকারে উড়িয়ে দিয়েছে। না হয় চেরিলকে শুনিয়ে শুনিয়ে চোখ পাকিয়ে বলেছে,—কেন দাদা, হিংসে হচ্ছে বুঝি? কষে বিট্‌ঠলনাম করুন, জ্বালা কমবে।

সুযোগ পেলেই চেরিলকে সে জ্বালায়। অথচ আমাদের মতো নাম ধরে তাকে ডাকে না। ডাকে মেমসায়েব বলে। সে ডাকে আকর্ষণ আর বিকর্ষণ একসঙ্গে ফুটে উঠে।

একদিন সকলের সামনেই ঝংকার দিয়ে উঠেছিল চেরিল,—

মেমসায়েব, মেমসায়েব! মেমসায়েব আবার কী? বিশ্রী ডাক,—আমার নাম ধরে ডাকতে পারো না?

নিতান্ত করুণ মুখ করে নাথুরাম কিঁউকিঁউ করে উঠেছিল,—

নাম ধরে? মানে,—তোমার নাম ধরে?

হ্যাঁ হ্যাঁ, সবাই যেমন ডাকে। আমার নাম চেরিল,—জানো না?

আবার কাতর গলায় নাথুরাম বললে,—

জানি জানি। ডাকতে বড়ো ইচ্ছেও করে।

তাহলে ডাকো না কেন? ছেলেটার এ কেমন ব্যাভার, বলুন তো বাপ্পা?

পূর্ণচৈতন্যের মুখে হাসি, কোনো মন্তব্য নেই। মাটির দিকে চোখ রেখে ঘনঘন মাথা নেড়ে নাথুরাম বললে,—ডাকব, ডাকব বৈকি। আগে পান্ধারপুর পৌঁছই, বিট্‌ঠলজীকে দর্শন করি,—তারপর ডাকব।

এ আবার কী কথা হোলো? জ্বলে উঠল চেরিল।

নাথুরাম মুখ তুলল। একবার আমাদের চোখে চতুর চোখ বুলিয়ে নিল। তারপর ফ্যালফ্যাল দৃষ্টিতে চেরিলের দিকে তাকিয়ে বললে,—

তার আগে তোমার নাম ধরে ডাকতে যে সাহস হয় না মেমসায়েব! একবার যদি ডাকি, তাহলে দুনিয়ার আর কোনো নাম যে মুখে রুচবে না। বিট্‌ঠলনামও যে ভুলে যাব।

এ কথার জবাব নেই। আসর জুড়ে শুধু অট্টহাসি। যাকে বলা, তার নির্বাক মুখ সিঁদুরের মতো লাল।

এ হেন নাথুরাম তার মেমসায়েবকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। পান্ধারপুরে পৌঁছবার প্রথম সকালেই খোঁজাখুঁজির একটা সাড়া পড়ে গেছে দেখছি। এতোক্ষণ আমরা খুঁজছিলাম,—এখন নাথুরামও দেখি খোঁজার ধান্ধায় ব্যাকুল!

কিন্তু কিসের এতো খোঁজ? কাকে এতো খোঁজ? খুঁজে পেলেই বা কী, আর না পেলেই বা কী? দেখা মিললেই বা কী, আর না মিললেই বা কী? কেউ কারুর নই আমরা,—একমাত্র যিনি সকলের তাঁর দর্শন তো মিলেছে। তিনিই প্রত্যেকের আকিঞ্চন,—তাঁকে দেখলে সব চাওয়ার বিলয়, সব প্রার্থনার পূর্তি।

ভক্ত কূর্মদাসের কথা ভাবো।

কূর্ম নাম কেন? লোকটার হাতও নেই, পাও নেই। জন্মাবধিই যেমন নুলো, তেমনি খোঁড়া। কচ্ছপের মতো চেহারা, কচ্ছপের মতো নড়াচড়া। তাই কূর্ম। কেউ নেই তার। পৈঠানে নদীর ধারে একটা ঝুপড়িতে থাকে—দিন গুজরান করে প্রতিবেশীদের দয়ায়।

একদিন ঘাটে বসে এক সুরদাস বিট্‌ঠলনাম গাইছে,—সেই গান তার মর্মে প্রবেশ করল। বিট্‌ঠল-প্রেমে আকুল হোলো কূর্মদাস। মনে মনে বললে,—বিট্‌ঠল-বিহনে ছার এ জীবন! আমি বিট্‌ঠলের কাছে যাব। কোথায়? না পান্ধারপুরে।

পড়শীরা শুনে তাজ্জব! কূর্ম যাবে পান্ধারপুর। পাগল নাকি?

কূর্মদাস বললে,—পাগলই তো। বিট্‌ঠলনামে পাগল হয়েছি। কতো লোক যায় পান্ধারপুরে, বারকরীরা তো বারে বারে যায়,—আর আমি পারব না? ঠিক যাব। দেখো,—পৌঁছব উৎসবতিথিতে।

বড়োলোকের টাকা আছে,—তারা যায় হাতি-ঘোড়ায় চেপে।

তুমি যাবে কেমন করে, তোমার টাকা আছে কী? বারকরীরা যায় পায়ে হেঁটে,—নাচতে নাচতে। তোমার পা আছে কী?

না, টাকা নেই, পাও নেই। প্রাণ তো আছে! প্রাণের ঠাকুর আমার প্রাণকে টেনেছেন,—প্রাণটুকু নিয়ে ঠিক তাঁর কাছে পৌঁছব।

কূর্মদাসের পা নেই, শুধু প্রাণ আছে। সেই প্রাণটুকু সম্বল করে সে পথে বার হোলো। নুলো হাতে মাটি কামড়ে কামড়ে কোমর টেনে টেনে এগোতে লাগল। খরগোসেব মতো নয়, কচ্ছপের মতো।

ভোর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত মাত্র ক্রোশ খানেক সে ভাঙল। তারপর ক্লান্তিতে লুটিয়ে পড়ল এক গাছের তলায়। প্রত্যঙ্গহীন শীর্ণ-পঙ্গু তার অঙ্গটুকু থরথর করে কাঁপছে। নিভে আসছে ইন্দ্রিয়ের অনুভূতি।

তারপর অন্ধকার যখন ঘন হয়ে এল তখন কে এসে হাত বোলালো কূর্মদাসের দেহে,—জুড়িয়ে দিল তার সারাদিনের শ্রমযন্ত্রণা! আদর করে পাশে বসে কে তার মুখে তুলে দিল খাদ্যের গ্রাস,—মিটিয়ে দিল তার জঠরের জ্বালা! স্নিগ্ধ কোমল কোলের ওপর শুইয়ে কে তাকে ঘুম পাড়াল,—মুছিয়ে দিল সকল ক্লান্তি!

ভোরবেলা উঠে রুক্ষ পথে কোমর টেনে টেনে আবার এগোতে লাগল কূর্মদাস। কষ্ট থাকলেও কষ্টবোধ নেই, শ্রম হলেও শ্রান্তি নেই, নিঃসঙ্গ নিঃসম্বল হলে কী হয়,—নিরাশ্রয় নয় কূর্মদাস। যিনি সকল অশরণের শরণ,—তিনি আছেন সঙ্গে। তিনিই জোগাচ্ছেন কূর্মযাত্রার পাথেয়।

দিনের পর দিন যায়। কূর্মদাস চলে। হাতি চলে, ঘোড়া চলে রথ চলে, পাল্কী চলে,—পদাতিকরা হনহনিয়ে হেঁটে যায়। সবাই পঙ্গু কূর্মদাসকে ফেলে এগিয়ে যায়,—পেছনে ফিরেও তাকায় না। কূর্মদাসের তাতে ভ্রূক্ষেপ নেই, হতাশা নেই। নিজস্ব শিথিল গতিতে সে চলে সারাদিন, রাত্রিবেলা পথের পাশে পড়ে থাকে। আপন মনে বলে,—ঠাকুর, পথেও তুমি আছ, পথের শেষেও তুমি আছ। তুমিই আমার গতি, তুমিই আমার স্থিতি।

অনেক দিন অনেক সপ্তাহ অনেক মাস ধরে এমনি চলল কূর্মদাস : নদী-নালা বন-পর্বত পার হোলো। একদিন এসে পৌঁছল এক জনপদে।

সেখানে দেখে মস্ত জমায়েত। ভারী এক বারকরীর দল। তারা নাচছে গাইছে লাফাচ্ছে,—হনহনিয়ে ছোটার জন্যে কষে মালকোঁচা আঁটছে।

শ্রান্ত কূর্মদাস ভাঙা গলায় চিৎকার করে ডাকল,—

এ কোথায় এলাম গো? ঐ যেখানে আমার বিট্‌ঠলপ্রভুর বসতি,—সেই পান্ধারপুর আর কতো দূর?

দূর আর কই? মাত্র একদিনের হাঁটাপথ।

মাত্র একদিনের? তাহলে পৌঁছবার আর বাকী নেই! তবে এতো হুড়োহুড়ি কিসের তোমাদের? পা ছড়িয়ে জিরোও। দুটো দিন বিশ্রাম করো, তবে তো যাবে!

হাঁ হয়ে গেল বারকরীরা। মূর্খটা বলে কী? শুধু কূর্মগতি নয়, কূর্মবুদ্ধিও লোকটার!

বললে,—জানো আজ কী তিথি? কী মাস? আজ কার্তিকের দশমী তিথি। আগামীকাল একাদশী। বিট্‌ঠলপ্রভুর উৎসব। হাতে মাত্র একটা দিন। শুয়ে বসে জিরোবার সময় আছে?

সবাই চলে গেল। পড়ে রইল পঙ্গু যাত্রীটা। একদিনের হাঁটা-পথ যার লম্বা লম্বা পা আছে তার। কূর্মদাসের লাগবে অন্তত চার দিন। আগামীকাল কার্তিকের শুক্লা একাদশী তিথি। সেদিন সহস্র সহস্র ভক্ত দর্শন পাবে। কেবল কূর্মদাস পাবে না। কূর্মদাস পৌঁছতে পারবে না প্রভুর সকাশে।

ক্লান্ত কচ্ছপের মতো নুলো হাত আর খোঁড়া পা গুটিয়ে পথের পাশে পড়ে রইল কূর্মদাস। সবাই চলে গেল,—কেবল সে ছাড়া। ব্যর্থ তার এতোদিনের পরিশ্রম, অপূর্ণ তার এতোদিনের আকিঞ্চন। তার দুচোখ বেয়ে দরদর করে জল পড়তে লাগল,—

মেটাও ঠাকুর, মেটাও আমার মনের সাধ। এখনো অনেক পথ, —সে পথ পেরোবার সাধ্য আমার নেই, তুমি আমাকে পার করো। একলা চলেছি এ ভবে, এবার প্রভু ঘরে কি মোরে লবে?

কাঁদতে কাঁদতে ঘুমিয়ে পড়েছিল কূর্মদাস। ঘুম ভাঙল প্রত্যূষ-আরতির ধ্বনিবাদ্যে। ধড়মড়িয়ে উঠে চোখ রগড়িয়ে ছাখে,—বিটেবরী উভা কটাবরী হাত,—বিট্‌ঠলপ্রভু তার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন, মৃদুমৃদু হাসছেন। আর্তিহরণ আনন্দ-কৌতুকের ছটায় দৃষ্টি তাঁর উদ্ভাসিত।

পথের ধারে খেলতে খেলতে অবোধ শিশু ঘুমিয়ে পড়ে। ঘুমের মধ্যে মা-মা বলে কাঁদে। মা তার কান্না শুনতে পায়, ঘুমন্ত বাচ্চাকে কোলে করে ঘরে তুলে নিয়ে আসে। তেমনি প্রভুর কোলে চড়ে কখন এসে 'পৌঁছেছে পান্ধারপুরে মন্দিরের গর্ভগৃহে,—কাঁদতে কাঁদতে ঘুমিয়ে পড়া কূর্মদাস তা জানতেই পারেনি।

কূর্মদাসের মতো ভক্তি কজনের থাকে? ভগবানের এমন কৃপা কজনে পায়? পায় বইকি। যতোটুকু চায়, ততোটুকু পায়। যেমন সাধ্য, তেমনি সাধনা,—যেমন সাধনা, তেমনি বরলাভ। কূর্মদাসের পা ছিল না, প্রাণ ছিল,—সেই প্রাণের টানে সে পৌঁছেছিল ভক্তির নীড়ে। আমার তেমনি প্রাণ কী আছে? না থাক, পা আছে,—তাই পায়ে পায়ে ঠিক পৌঁছেছি ভক্তির মহাসংগমে।

এই সংগমে দেখি ভক্তি-প্রীতি, শ্রদ্ধা-স্নেহ, বন্ধুত্ব-বাৎসল্য,—সব একসঙ্গে মিশেছে। চেরিলের জন্যে নাথুরামের উদ্বেগ,—এই সংগমেরই একটি অপূর্ব স্রোতধারা, হৃদয়ের এক কলস্বিনী লীলা।

আবার কানহাইয়ালালকে ছাখো। কানহাইয়ালাল নাথুর হাত ধরে জোর করে বসাল। পেট ভরে তাকে খাওয়াল। তারপর তার পিঠে হাত রেখে আশ্বাস দিল,—

চলো, তোমার মেমসায়েবকে খুঁজে দিচ্ছি। ভাবনা কী?

॥ ২৪ ॥

কানহাইয়ালাল বৃথা আশ্বাস দেয়নি। চেরিলকে আমরা খুঁজে পেলাম আর এক কাহিনীর সূত্র ধরে। সেই কাহিনীর কাছাকাছি এবার আমরা এসেছি।

কান্‌হোপাত্রার কাহিনী।

কবি কান্‌হোপাত্রা, ভক্তিমতী কান্‌হোপাত্রা, নটিনী কান্‌হোপাত্রা। নামটা কি একেবারে অচেনা? সেই যার উল্লেখ করে আকুল কান্না কেঁদেছিলেন তুকারাম,—

কবীর ছিল তাঁতী, রোহীদাস ছিল মুচি,
জনাবাঈ ছিল দাসী,—
আর গণিকাকন্যা কান্‌হা।
তারা যদি তোমাকে পেয়ে ধন্য হোলো
আমাকে তুমি এড়িয়ে যাবে কেমন করে?

এ সেই কান্‌হা,—কৃষ্ণপ্রিয়া কান্‌হোপাত্রা।

নীচ যবনের ঘরের ছেলে কবীর। হিন্দুর ঔরসে হিন্দু নারীর গর্ভে নাকি জন্ম। জন্মমুহূর্তে পরিত্যক্ত, এক মুসলমান পরিবারে মানুষ। সে রহস্য নিয়ে কবীরের মাথাব্যথা নেই। সে বলে,—

জাতি পাতি পুছাই না কৌঈ।
হরিকো ভজে সে হরি কা হৌঈ॥

একদিন কাশীতে মণিকর্ণিকার ঘাটে শেষরাতে শুয়ে আছে। গুরু রামানন্দ এসেছেন প্রাতঃস্নানে। আধো-অন্ধকারে সিঁড়িতে গায়ে পা পড়ল। রামানন্দ চমকে বলে উঠলেন,—রাম রাম!

ধড়মড়িয়ে উঠে বসল কবীর। বললে,—প্রভু, আমার মনস্কাম

আজ সিদ্ধ। অঙ্গে গুরু-পাদস্পর্শ পেয়েছি। কানে শুনেছি গুরু-উচ্চারিত রামমন্ত্র,—আর আমার ভাবনা কী ?

হমন্ হৈঁ এক মস্তানা,—
হমন্ কো হোসিয়ারী ক্যা ?

ভাবনা নেই,—ইহকালের ভাবনা যিনি মেটাবার তিনিই মেটাবেন। তিনি শুধু অযোধ্যাপতি নন। তিনি নিখিলপতি। তিনি বিষ্ণুর অবতার। নররূপী নারায়ণ। সারা জীবন শুধু তাঁর নাম জপ করলেই চলবে, তাঁর নাম করলেই চলবে।

পেশায় তাঁতী,—পালক পিতার কাছেই হাতেখড়ি। বাপ মরেছে, পেশারও পাট উঠেছে কবীরের। দুঃখিনী মা বলছেন,—

ওরে কবীর, কী নাম তুই বিড়বিড় করিস নিশিদিন ? তাঁতীর ছেলে তুই, জাতব্যবসা শিকেয় তুললি বাবা ? তাঁত যদি না বুনিস পয়সা আসবে কোত্থেকে, অন্ন জুটবে কেমন করে ? তুই কি পাগল হলি ?

কবীর বললেন,—

কো বীনৈ প্রেম লাগো রী মাঈ, কো বীনৈ।
রাম-রসায়ন মাতে রী মাঈ, কো বীনৈ॥

মাগো, আমি যে প্রেমে পাগল হয়েছি,—এখন কাপড় বুনবে কে ? রাম-রসায়ন পান করে মাতাল হয়েছে আমার মন,—এখন কাপড় বুনবে কে ?

তাহলে কবীর, তুই কী করবি ?

আমি গান করব।

গানের পর গান। অসংখ্য গান রচনা করলেন কবীর তাঁর মর্ম-দেবতার নামে,—গানই উপাসনা, গানই নির্মাল্য-নৈবেদ্য, গানেই প্রণত আত্মনিবেদন। সেই গান গেয়ে ফিরলেন সুদীর্ঘ জীবন।

তারপর,—নীরব করে দাও হে তোমার মুখর কবিরে। আর গান নয়, কথা নয়। শুধু ভাষাহীন হৃদয়ের স্তব্ধ সিংহাসনে প্রভুর পদার্পণ।

কবীর হম যব গাওয়তে
তব ব্রহ্মা জানা নহীঁ।
অব ব্রহ্মা দিলমে দেখা
গাওনকু কছু নহীঁ॥

আরো একজন ধন্য হয়েছিল গুরু রামানন্দের দয়ায়। রোহীদাস নাম তার। জন্মে একেবারে ছি-ছি—চামারের বেটা চামার।

ভোরবেলা বারাণসীর রাজপথ ঝাঁট দেয়,—তারপর সারাদিন ঝুপড়িতে বসে মরা গোরুর চামড়া দিয়ে জুতো বানায়। রোজ দু-জোড়া করে জুতো। একজোড়া বিক্রী করে। আর একজোড়া রাখে সেবার জন্যে। দিনান্তে সাধুসন্ত তীর্থযাত্রী যাকে দেখে, ডেকে বলে,—এই জুতোজোড়া তুমি নাও, তোমার চরণের ছাপ লেগে আমার সারাদিনের কর্মফল পবিত্র হোক।

সামনের রাস্তা দিয়ে প্রতি প্রত্যূষে প্রাতঃস্নান সেরে রামানন্দ যান মন্দিরে। দূর থেকে হাঁ করে রোহীদাস তাঁর জ্যোতির্ময় মূর্তি দেখে। একদিন রামানন্দের চোখ পড়ল তার দিকে,—আবর্জনায় গজিয়ে ওঠা কাঁটাগাছের ফুলের ওপর প্রভাত-সূর্যের আলো যেমন পড়ে।

কে তুমি? কী চাও?

আমি কাঙাল প্রভু,—শুধু তোমার আশীর্বাদ চাই।

রামানন্দ হাত বাড়ালেন রোহীদাসের দিকে।

ছুঁয়োনা প্রভু, আমাকে ছুঁয়োনা। আমি চামার, তোমার পথের ধূলো আমি ঝাঁট দিই।

রামানন্দ মাথায় হাত দিলেন রোহীদাসের। স্নেহ-উদাস দৃষ্টি রাখলেন তার কাতর চোখে। অস্ফুট স্বরে বললেন,—নারায়ণ, নারায়ণ!

সেই নামে ত্রাণ পেল রোহীদাস। জপ করতে লাগল,—নারায়ণ, নারায়ণ!

গুরুপদ অনুসরণ করে গেল জাহ্নবীতীরে। পাথরের একটা নুড়ি কুড়িয়ে পেল। এই আমার নারায়ণ, চিরবাঞ্ছিত শালগ্রাম।

সেই নুড়িকে বুকে করে ঘরে নিয়ে এল। কোথায় তাকে রাখবে? কোথায় বসাবে? কোথায় পাতবে সিংহাসন? এক ফালি চামড়া পেতে তার ওপর সে তার নারায়ণকে বসাল। পুঁজিপাটা যা ছিল সব বেচে সাজাল নৈবেদ্যের উপচার। বিড়বিড়িয়ে বললে,—নারায়ণ, নারায়ণ! কী তোমাকে দেব? আমার আর কিছু নেই, শুধু আছে আয়ুটুকু। আমার বাকি জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত তোমাকে দিলাম।

রোহীদাসের হাতে তৈরী জুতো পরতে কোনো সজ্জনের আপত্তি নেই,—বিশেষ করে যদি বিনামূল্যে পাওয়া যায়। কিন্তু তার হাতের প্রসাদ ছোঁবে কে? নারায়ণকে উৎসর্গ করে রাস্তার আতুর ভিখিরিদের বিলিয়ে দিল সব।

তারপর দিন যায়, মাস যায়,—রোহীদাস আর কিছু করে না। শুধু তার ভাঙা ভিটেয় নুড়িরূপী নারায়ণের সামনে হাত জোড় করে বসে থাকে। অর্থ নেই, অন্ন নেই, বস্ত্র নেই। চামারের ছেলে নারায়ণ পূজা করে—এতো বড়ো ধৃষ্টতা! তাই তার কোনো সমাজ নেই, সহায় নেই, বন্ধু নেই। এতোদিন ছিল অপাঙ্‌ক্তেয়,—এখন থেকে নিঃস্ব অশরণ।

তার আপন মনের ডাক শরণাগতির কানে পৌঁছল। তিনি যে অন্তর্যামী! অদৃশ্য হাতে সেই চামড়ার সিংহাসনের পাশে রেখে গেলেন একমুঠো স্বর্ণ মুদ্রা। আহা, এই মুদ্রায় নিরন্ন ভক্তের অন্ন জুটুক! রোহীদাস সেই স্বর্ণমুদ্রা হাতে পেয়ে অবাক হোলো না, আকুল হোলো না,—জাহ্নবীর জলে ছুড়ে ফেলে দিয়ে এল।

আবার দিন যায়, মাস যায়। নিরবচ্ছিন্ন তপস্যায় জীর্ণ হয়েছে দেহ। অশক্ত হাত, পা চলৎশক্তিহীন,—ইন্দ্রিয়বোধ অবসন্ন। অন্তর শুধু মন্ত্র জপে নিরন্তর,—নারায়ণ, নারায়ণ।

* এবার প্রভু রেখে গেলেন স্পর্শমণি। পাশে ছিল একটা বাটালি,—টুং করে একটি শব্দ উঠল। রোহীদাস ঝাপসা চোখে দেখল স্পর্শমণির ছোঁয়ায় লোহার বাটালি সোনা হয়ে গিয়েছে। বিস্ময় নেই, পুলক নেই, মুখে শব্দ নেই। সেই স্পর্শমণি পথপাশের আবর্জনাস্তূপে ছুড়ে ফেলে দিল রোহীদাস। তার মন্ত্রজাগর অন্তর বললে,—নারায়ণ, নারায়ণ!

স্বর্ণমুদ্রা নিলে না, স্পর্শমণি নিলে না, তুমি কী চাও রোহীদাস? কীসের জন্যে তোমার এই তপস্যা?

অল্পে আমার সুখ নেই প্রভু। আমি ভূমাকে চাই,—তোমাকে চাই। আমার শ্রেষ্ঠ সম্পদ আয়ু। তাই তোমাকে দিয়েছি। অন্য সম্পদে আমার কাজ কী? আয়ু থাকতে থাকতে তুমি একবার দেখা দাও।

রোহীদাসের মরদৃষ্টির সামনে তার সেই চর্মসিংহাসনে সগুণ স্বরূপে প্রকট হলেন শঙ্খচক্র-গদাপদ্মধারী নারায়ণ।

মীরাবাঈ বলছেন,—মঁয়নে চাকর রাখো জী!

আমি রাজনন্দিনী রাজরাণী, অসংখ্য দাসদাসী আমার সেবায় নিযুক্ত, সমগ্র প্রজাকুল আমার ভৃত্য,—তাতে আমার মন ভরে না। আমাকে তোমার চাকর রাখো,—সব অলঙ্কার কেড়ে নিয়ে দাসীবৃত্তির অলঙ্কারে আমাকে সাজাও।

কিন্তু জনাবাঈ জন্মদাসী।

বিট্ঠলমন্দিরের দ্বারে একটি মেয়ে বসে আছে। একেবারে একলা, সঙ্গীসাথী কেউ নেই। পাণ্ডুরঙ্গজীর মুখের দিকে তাকিয়ে মিটিমিটি হাসছে।

নামদেবের চোখে পড়ল।

কে রে তুই? শুধোলেন তিনি।

মেয়ে বললে,—আমি জানি।

তার মানে? কে তোর বাপ, কে তোর মা?

বাপ আমার বিট্‌ঠল, মা আমার বিঠাবাঈ,—আমি জানি।

আরে? তোর ঘর কোথায়? কোথায় তুই থাকিস?

আমার ঘর এই মন্দির। আমি থাকি এইখানে,—আমি জানি।

কতো দেশ থেকে কতো যাত্রী আসে পান্ধারপুরে। হয়তো তাদেরই কারো শিশু,—দলছুট হয়ে গেছে, হারিয়ে গেছে! কিন্তু আশ্চর্য,—ভয়ডর নেই, কান্নাকাটি নেই! দিব্যি টন্‌টনে জ্ঞান,—দিব্যি বলছে,—এই মন্দিরই আমার ঘর, এই মন্দিরের দেবতাই আমার বাপ-মা।

নামদেব বিস্মিত হলেন, স্নেহসিক্ত হলেন। বললেন,—

হ্যাঁরে বেটি, আমার ঘরে যাবি? থাকবি আমার সংসারে?

ঘাড় নাড়ল কন্যা।

কিন্তু অমনি খেতে পাবিনে। কাজ করতে হবে, দাসীর কাজ।

করব বৈকি। তোমার দাসীবৃত্তি করব না?

হাসলেন নামদেব।

কেন? আমার ওপর এতো সদয় কেন?

বাঃ, তোমার সেবা করলেই তো পিতৃসেবা করা হবে। দেখো, পুণ্ডলিককেও ছাড়িয়ে যাব আমি। বিট্‌ঠল আমার সত্যবাবা,—কিন্তু আমার নিত্যবাবা যে তুমি। আমি জানি।

আমি জানি, আমি জানি। বারবার এই কথা বলে বোঝাতে চায় যে ডাকনাম জানি। পালক পিতা নামদেবের দেওয়া নামে জনাবাঈ। নিত্যবাবা নামদেবের সংসারে সারাজীবনের নিত্যদাসী। চিরব্রহ্মচারিণী জনাবাঈ।

জনাবাঈ উদয়াস্ত পরিশ্রম করে। ঘর নিকোয়, উঠোন ঝাঁট দেয়, বাসন মাজে, কাপড় কাচে, কুটনো কোটে, বাটনা বাটে, গম পেষে আর চন্দ্রভাগা থেকে কাঁখে কলসী করে জল নিয়ে আসে। মাঝে মাঝে শুধু দৌড়ে দৌড়ে নামদেবের সামনে আসে, বলে,—

বাবা, তোমার সেবা কী করব ?

ঘর থেকে নড়ে না, বিট্‌ঠলমন্দিরের পথও ভুলে গেছে।

জনাবাঈএর সারাদিনের পরিশ্রম নামদেবের দৃষ্টি এড়ায় না। বলেন,—তুই একটু পাশে এসে বোস্ তো মা, তাতেই আমার সেবা হবে।

অমান্য করে না। কাজকর্মের অবসরে বসে একটু পা মুড়ে। তবে নামদেবের পাশে নয়,—দাওয়ার এক কোণে

দিনান্তের দিগন্তকোণায় তখন তারার উঁকি। নামদেব অভঙ্গগান করেন,—মৃদঙ্গ-মন্দিরার ছন্দে ছন্দে চন্দ্রকিরণের মতো তাঁর অমিয় কণ্ঠ ছড়িয়ে যায় আকাশে বাতাসে। দুটি হাত জোড় করে চোখ বুঁজে জনাবাঈ শুধু একমনে শোনে।

অনেকদিন পরে ঘন বর্ষার এক অপরাহ্ণে জনাবাঈ বিট্‌ঠল-মন্দিরে গেল। সেদিন ভোর থেকে আকাশের মুখ ভার। ঝেঁকে ঝেঁকে বৃষ্টি,—নির্জন পথঘাট। ভক্তবিরল প্রভুগৃহ,—পুরোহিতরাও বিশ্রাম করছেন।

গর্ভগৃহের মুক্ত দ্বারের সামনে দাসী জনাবাঈ বসল,—ঠিক যেমন করে ঘরের দাওয়ায় বসে নামদেবের গান শোনে। বন্ধ দুটি চোখ থেকে বৃষ্টিধারারই মতো ঝরল অশ্রুধারা।

তারপর প্রভাতের সদ্যজাগা কুঁড়ি যেমন হঠাৎ ফুটে ওঠে তেমনি তার বন্ধ আঁখি খুলে গিয়ে প্রভুর মুখপানে নিষ্পলক হয়ে তাকাল। শিশু কোকিলের গলায় সহসা যেমন ফুটে ওঠে প্রথম ডাক, তেমনি সে গেয়ে উঠল প্রভুর বন্দনাগান,—

বাঁধলে মোরে কঠিন কাজের ডোরে,
ক্ষণেক তরে মুক্তি নেই তো প্রভু,
দিনযামিনী চরণসেবা করে
মুখের পানে চোখ তুলিনে কভু।

পূজারীরা পূজা তোমার করে,
পূজার্থীরা সাজায় উপচার,
কানন থেকে কুসুমসাজি ভরে
মাল্য গাঁথে তোমার মালাকার।

সন্ত কবির প্রণতি-সঙ্গীতে
বারকরী তীর্থযাত্রী নিত্য,
নর্তকীরা ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিতে
রতির সুখে ভরায় তোমার চিত্ত।

আমি শুধু ছিন্ন আঁচল মেলে
মুছি তোমার চরণ-শিলাবেদী,
সাহস না পাই নত নয়ন মেলে
দেখতে তোমার দৃষ্টি মর্মভেদী।

তোমার ভোগের শস্যকণাগুলি
জাঁতায় পেষা এই আমারই কাজ,—
জনমদাসী,—তাই তো আমায় ভুলি
সকল প্রজার তুমি মহারাজ॥

এ কী অশ্রুতপূর্ব কণ্ঠ! এ কী মাধুর্যভরা গান! কোন্ ঘুমভাঙা সুর-স্রোতস্বিনী? পাথরের দেবতা পলকে জাগ্রত হলেন।

কার গান তুমি গাইলে দাসী?

গান? গান নয় প্রভু। তোমার চোখে চোখ রাখার একটু অবসর পেয়েছি, তাই মনের কথা মুখ থেকে বেরিয়ে আসছে। শুনতে কেমন লাগল ঠাকুর?

বড়ো ভালো। আরো বলো, আরো আমাকে শোনাও।

জনাবাঈ গাইল গানের পর গান,—কতো গান।

প্রণাম করে দাসী ফিরে যাচ্ছে, প্রসন্ন বিট্‌ঠলপ্রভু ডেকে বললেন,—

কাল আবার এসো, এই গানগুলি কাল আবার শুনিয়ো।

কালো হোলো জনাবাঈএর মুখ।

তা কী করে পারব প্রভু? মনের কথা একবার মুখ থেকে বার করেছি,—আর কি মনে থাকবে?

মনে না থাকুক, লিখে রাখবে।

লিখে রাখব? ব্যর্থতার বেদনায় বুক ফেটে গেল জনাবাঈএর।

আমি যে দাসী,—শিক্ষাহীনা বিদ্যাহীনা নিরক্ষরা দাসী প্রভু!

লেখনী হাতে নিলেন পাণ্ডুরঙ্গ শ্রীবিষ্ণুবিট্‌ঠল। পরম সাধিকা কবয়িত্রী জনাবাঈএর সমস্ত রচনা তিনি নিজের হাতে লিপিবদ্ধ করলেন।

এবার কৃষ্ণপ্রিয়া কান্‌হোপাত্রার কাহিনী শোনাই।

বেশ্যার মেয়ে,—কিন্তু রূপের গর্বে মাটিতে পা পড়ে না। শুধু ভুবনমোহিনী রূপসী নয়,—গানে কিন্নরী। মার নাম শ্যামা,—নামকরা বারবনিতা। কার ঔরসে এমন মেয়ে পেটে ধরেছে নিজেই জানে না।

বড়ো যখন হোলো, মা অনেক বোঝালো, পাখিপড়া করে শেখালো। কিন্তু যার এতো গুমোর, তাকে শিখিয়ে পড়িয়ে সজুত করার সাধ্য কার? ছোট জনপদ মঙ্গলবেড়,—সেখানে তাদের বাস। কিন্তু আশেপাশের শহরের খানদানি পুরুষরা সেখানে আসে, ডাগুশ ভ্রমররা যেমন উড়ে আসে বনফুলের মধুর লোভে। ঘরের দরজায় রাজপুত্র আর শ্রেষ্ঠীপুত্রের ভিড় লেগেই আছে,—কিন্তু চৌকাঠ পার হবার অধিকার নেই কারুর। নাগরদের সে লাথি মারে, তাদের দেওয়া দামী দামী গয়না আর মুঠো মুঠো মোহর সে ছুড়ে ফেলে দেয়।

মা বলে,—ওরে জাতব্যবসা কর্। নইলে আখেরে অনেক কষ্ট পাবি।

মেয়ে ফুঁসে উঠে বলে,—আমি কি রাতের সরাইখানা? যে আসে আসুক পাতাই আছে বিছানা?

মা কপালে হাত দেয়। শেষ পর্যন্ত বলে,—তাহলে বিয়ে কর!

কাকে বিয়ে করব?

কেন? এতো নাগর তোকে পাবার জন্যে পাগল,—কাউকে পছন্দ হয় না?

না, কাউকে পছন্দ হয় না কান্‌হোপাত্রার। অতুলনীয়া সে,—এমন প্রেমিক তার চাই, তুলনা যার নাই। সেই অতুলের কাছে আত্মনিবেদন করতে সে রাজী,—কিন্তু কোথায় তাকে পাবে?

একদিন তীর্থযাত্রীর দলে ভিড়ে গেল মা আর মেয়ে। গেল পান্ধারপুরে বিট্‌ঠলজীর মন্দিরে। বিষ্ণু-ভগবান পাণ্ডুরঙ্গজীকে দেখে পাগল হোলো কান্‌হোপাত্রা। এই তো আমার নাগর, এই তো অতুল পরম পুরুষ!

ফুলে ফুলে ওঠে বুক, অঙ্গ কাঁপে থরথর,—দুচোখে পলক আর পড়ে না। লজ্জাহীনা প্রেমপাগলিনী বললে,—প্রভু, ভক্তের অর্ঘ্য তুমি তো পায়ে ঠেলো না কখনো। কী অর্ঘ্য আমি তোমাকে দেব? উজাড় করে লও হে আমার যা কিছু সম্বল!

কী সম্বল কান্‌হোপাত্রার?

ভক্ত তার শ্রেষ্ঠ ধন করে সমর্পণ। মহামন্দির গড়েছে রাজা, স্বর্ণ-সিংহাসনে বসিয়ে বিগ্রহের গলায় পরিয়েছে মণিহার, অঙ্গ সাজিয়েছে রত্ন-আভরণে। শ্রেষ্ঠী এনেছে থরে থরে ভোগসামগ্রী, ভরে দিয়েছে দেবতার ভাণ্ডার। নিরম্বু উপবাস করে পুরোহিত পালন করেছে নৈষ্ঠিক পূজাপদ্ধতি। বীণা-তম্বুরা বাজিয়েছে বাদক, বরণমাল্য রচনা করেছে মালাকর। মন্দিরভরা কতো সেবক,—নির্দিষ্ট সেবা।

আর সন্ত করেছে ধ্যান, ভক্ত করেছে আরাধনা, পূজার্থী এনেছে কতোমতো পূজা-উপচার। দীনদরিদ্রের অঞ্জলিতেও একটি কপর্দক।

প্রভুর চরণে সকলেই দেয় তার শ্রেষ্ঠ ধন।

বারাঙ্গনা-কন্যা নটিনী কান্‌হোপাত্রা, পঙ্কে তার জন্ম। সে কি জানে না তার শ্রেষ্ঠ ধন কী? জানে বৈকি। এই ধনের প্রতিচ্ছবি সে দেখেছে কামুকের লালসালোলুপ চোখে। আঁচলচাপা লুকিয়ে রাখা এই তার গোপন ধন বারে বারে হরণ করতে চেয়েছে গৃধ্নু কঠিন হাত।

আর তাকে ঢেকে রাখতে হবে না। লুকিয়ে রাখতে হবে না। উজাড় করে দিতে হবে,—নাও প্রভু নাও!

থাক্ তুই এখানে পড়ে,—আমাদের আর সময় নেই, আমরা যাই!

মা ফিরে গেল, মঙ্গলবেড়ের সব পড়শীরা ফিরে গেল,—ফিরে গেল না কান্‌হোপাত্রা,—কামড়ে পড়ে রইল মন্দিরের মাটি!

বিট্‌ঠলমন্দিরে নাচে গায়, পাণ্ডুরঙ্গজীর পায়ের কাছে দিনরাত পড়ে থাকে। চোখের অদর্শন করে না, পলকহীন আঁখি মেলে চেয়ে থাকে অতুল নাগরের মুখপানে।

নাও প্রভু নাও। আমার অর্থ নেই, বিভব নেই, মান নেই, সম্মান নেই, জ্ঞান নেই, ভক্তি নেই। তবু আমার শ্রেষ্ঠ ধন তুমি নাও!

অনেকদিন কেটে গেছে। একদিন বিদরের নবাব পাঠাল দূত। কান্‌হোপাত্রার রূপগুণের খ্যাতি কানে পৌঁছেছে,—সে নাকি অপরূপা নটিনী। তাই রাজভোগ্যা হবার আমন্ত্রণ।

দূত ফিরে গেল আশাভঙ্গ নিয়ে। তারপর এল নবাবের সৈন্যদল। এবার আর আমন্ত্রণ নয়,—আদেশ। এ আদেশ অমান্য করলে ধরে নিয়ে চলো বেঁধে নিয়ে চলো গণিকাকন্যাকে।

পুরোহিতরা ছুটে এল কান্‌হোপাত্রার সামনে,—তুমি বাঁচাও মা, তুমি যাও মা,—নইলে নবাবের অত্যাচারে সবাই আমরা মারা পড়ব।

শুধু যে তোমার পায়ে শেকল পরাবে তাই নয়। কাউকে ওরা আস্ত রাখবে না। মন্দির গুঁড়িয়ে দেবে।

মন্দিরদ্বারে সশস্ত্র সৈন্যদল। মন্দিরের মধ্যে আর্ত-সন্ত্রস্ত ভক্ত-পুরোহিতের দল। নির্লজ্জা কান্‌হোপাত্রা দাঁড়াল বিট্‌ঠলদেবের সামনে।

বিগ্রহপানে একদৃষ্টে চেয়ে দৃপ্তকণ্ঠে বললে,—তোমার কতো ভক্ত কতো অর্ঘ্য তোমাকে দেয়,—আমার কিছু নেই, আছে শুধু এই দেহ। এই দেহ তোমাকে আমি দিয়েছি। বলো প্রভু, এ অর্ঘ্য তুমি নিয়েছ কি না! আর বলো প্রভু তোমাকে নিবেদন করা অর্ঘ্য আর কেউ ছিনিয়ে নিতে পারে কি না!

পাথরের বিট্‌ঠলমূর্তি জীবন্ত বিষ্ণুরূপে প্রকাশ হলেন। বিট-সিংহাসন থেকে নেমে এসে স্পর্শ করলেন কান্‌হোপাত্রাকে।

ঘোষণা করলেন,—এ নারী আমার। এর দেহের অর্ঘ্য আমি নিয়েছি,—তৃপ্ত হয়েছি।

কান্‌হোপাত্রা বিষ্ণু-পদতলে শেষ মূর্ছায় মূর্ছিত হোলো।

যে পথে এসেছিলাম সেই পথেই ফিরে চললাম। কানহাইয়া-লালের পিছু পিছু। সেই নামদেবের সমাধি। গেটের দুধারে সেই জয়-বিজয়ের মূর্তি, চত্বরে সেই দীপস্তম্ভ।

নাথুরাম চারদিক তাকাচ্ছে,—তার চোখ খুঁজছে। কিন্তু কানহাইয়ালালের কোনো দিকে দৃষ্টি নেই। যেন তার জানাই আছে কোথায় কেন সে চলেছে,—পৌঁছে গেলেই কী সে পাবে।

হনহনিয়ে সে চলেছে। তার সঙ্গে আমরা। উত্তরের দীর্ঘ প্রাচীরকে ডানহাতি রেখে সে সমানে হাঁটল—সোজা পৌঁছল রুক্মিণীমন্দিরে। সেখানে একটু দাঁড়িয়ে চলল দক্ষিণ দিকে। প্রাচীর শেষ হতে মুখ ঘোরালো পুবে। মন্দিরের দক্ষিণ দিকটা ছায়াঢাকা। সেই ছায়ার আশ্রয়ে যাত্রীদের সবচেয়ে ভিড়। চাতাল জুড়ে সবাই বিশ্রাম করছে। হাঁটতে গেলে সেই ভিড়ের মাঝখান দিয়ে এগোতে হয়।

কানহাইয়ালাল একটু থামল। হাতের তেলো দিয়ে কপালটা মুছল। চোখ তুলে এদিক ওদিক তাকালো এতোক্ষণে।

নাথুরাম বললে,—কই! সারা চাতালই তো ঘোরা হয়ে গেল! মন্দিরের ভেতরে নেই তো?

কানহাইয়ালাল বললে,—অতো অধৈর্য কেন? চলো না, কোথায় আছে আমি ঠিক ধরেছি।

দক্ষিণের একটি কোণ। ছায়াশীতল একটি অন্তরাল। দেয়ালে কৃষ্ণ পাথরের মূর্তি। সামনে ক্ষুদ্র একটি সমাধিবেদী। তার সামনে স্ত্রীলোকদের ভিড়। চুপ করে মাথা নিচু করে বসে আছে সবাই।

কানহাইয়ালালের সঙ্গে আমরা আস্তে আস্তে এগোলাম। সেই মূর্তির কাছাকাছি গিয়ে দাঁড়ালাম।

কার মূর্তি? কোন দেবতার? কার চরণে এতোগুলি সতীসাধ্বী নারী-ভক্তের নীরব পূজা?

কান্‌হোপাত্রার।

সেই নির্লজ্জা নটিনী,—যার যৌবনবল্লরী বিট্‌ঠল-বাসনায় সমর্পিত। সেই বিধুরা ভাবিনী,—যার ভাবনা বিট্‌ঠল-প্রাণে সমাহিত।

সেই মূর্তির সামনে সেই সমাধিমূলে একটু ভিড় বাঁচিয়ে একপাশে বসে আছে। আজ তার পরণে সেই সোনালি পোশাক নেই। কার কাছ থেকে জোগাড় করেছে একটা শাদা শাড়ি। শাড়ি পরে সে সকলের সঙ্গে এক হয়ে গিয়েছে। তাই সকলের মধ্যে আলাদা করে তাকে চোখে পড়া শক্ত।

মাথাটি নিচু করে দলছাড়া চেরিল চুপটি করে বসে আছে!

॥ ২৫ ॥

কানহাইয়ালাল একেবারে হাল আমলের ডিটেকটিভ। তাই চেরিলকে খুঁজতে সোজা সে পৌঁছেছিল কান্‌হোপাত্রার সমাধিতে। চেরিলই একদিন শুনিয়েছিল কান্‌হোপাত্রার কাহিনী। এ কথা তার মনে ছিল।

সকলের ভাবনায় সন্তলীলা অন্তঃশীলা। আর কোন ভাবনা নেই কারো মনে। ভোরবেলা শুরু, সন্ধ্যে পর্যন্ত সন্তগান। তারপর সন্তকাহিনীর আলাপনেই দিনান্তের বিশ্রাম।

বড়ো বড়ো শহরে বারকরী যাত্রীদের সান্ধ্য সম্বর্ধনার বিরাট আয়োজন। বাঘা রিসেপশন কমিটি, চূড়ান্ত আদর-আপ্যায়ন, খাওয়া-শোয়ার অঢেল বন্দোবস্ত। গভীর রাত পর্যন্ত ধর্মসভা, জ্ঞানগর্ভ নানান বক্তৃতা।

ছোট জায়গার অন্য ব্যবস্থা। সন্তপাদুকা ও মুখ্য বারকরীদের আশ্রয় কোনো মন্দিরে। মন্দির না হলে কোনো একটি নির্দিষ্ট তাঁবুতে। আর সব যাত্রীরা এখানে ওখানে, অন্য তাঁবুতে, না হয় ধর্মশালায়, স্কুলবাড়িতে, হাসপাতালের দালানে, গৃহস্থবাড়ির উঠোনে। দিণ্ডীতে দিণ্ডীতে ভাগ হয়ে দল পাকিয়ে থাকা, গোল হয়ে সন্তলীলা আলাপন।

বারকরীদের আহার্য অতি আড়ম্বরহীন। দ্বিপ্রহরে সাধারণত ভাত আর ডাল, অন্যথায় কাঁচা চিউড়া আর গুড়। রাত্রে কখনো রুটি আর তরকারী। কাঁচা আহার্য গোরুর গাড়িতে চলে,—লরীর মাথায় বাঁশ আর তাঁবু। কোনো লরীতে জলের ড্রাম। রান্না আর পরিবেশনের জোগাড়যন্ত্র করে দিণ্ডীর স্বেচ্ছাসেবকরা। আহার্যের ভাগ আমরাও পাই। বারকরী না হলেও।

আমাদের দিণ্ডীর কেন্দ্রে আছেন্ পূর্ণচৈতন্য মহারাজ। ছোট

জায়গাতেই আমরা তাঁকে কাছে পাই, গোল হয়ে ঘিরে বসি। তিনি গল্প বলেন, গানের ধুয়োও তাঁর কণ্ঠে। শাসবদ থেকে একদল গাইয়ে আমাদের দলে জুটে গেছে। তিনটে ছেলে আর দুটো মেয়ে। গেরুয়া বসন, চূড়োকরা চুল, গলায় ঝুটো স্ফটিকের মালা। মেয়েদের হাতে পেতলের খঞ্জনি, ছেলেদের হাতে পিড়িং-পিড়িং দোতারা। গলায় হিন্দী ভজন। তারা নাকি কবীরপন্থী। মধ্য প্রদেশের নিমাড় থেকে ঘুরতে ঘুরতে এসেছে।

পুণা থেকে দুজন অধ্যাপক আমাদের দলে যোগ দিয়েছেন। একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের আর একজন ডেকান কলেজের। একজন সাহিত্যের আর একজন ইতিহাসের। তাঁরা মাঝে মাঝে আসর জমান। একজন করেন সন্তকবিদের ধর্ম-দর্শন আলোচনা আর একজন আঁকেন সন্তজীবনের ঐতিহাসিক পটভূমি।

আর আছে বচনবাগীশ নাথুরাম। মধ্যযুগের প্রতিটি সন্তের জীবন ঘিরে নানা অলৌকিক কাহিনী। সেইসব কাহিনীতে নাথুরামের স্মৃতি ভরাট। রসময় ভাবের বুকে ভাষার রঙ ফলিয়ে সেইসব কাহিনী পরিবেশনে নাথুরাম ওস্তাদ। তার বর্ণনায় চিরপুরাতন নতুন মাধুর্যে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

বারকরীরা প্রথম শ্রেণীর যাত্রী। চেরিল, কানহাইয়ালাল, আমি, আর আমাদের মতো আরো কেউ কেউ,—আমরা সেকেণ্ড ক্লাস। তাই বা কেন? সোজা কথায় আমরা ডবলু-টি, এক গাড়িতে উঠেছি, এক কোণেতে আছি। বারকরীদলে ঠাঁই পেলেও আমরা বারকরী নই। দলের মধ্যে বসে কথা বলার নয়, একপাশে বসে মুখ বুঁজে কথা শোনার এক্তিয়ার আমাদের।

এ ব্যবস্থা আমার পক্ষে খুবই ভালো। আমি নামপরিচয়হীন দূরদেশের যাত্রী। আমার যাত্রাপথের জ্ঞানগম্যির হদিস কি ছাপানো টাইম-টেবিল আর গাইড-বুকে মেলে? মুখস্থ করা কোন বিদ্যের গুমরে আমি বকবক করব, নিজেকে জাহির করব? আমি এসেছি

দেখবার জন্যে, শুনবার জন্যে, শূন্য ঝুলি ভরবার জন্যে। চোখ খুলে দেখতে হবে, কান খুলে শুনতে হবে। দোহাই,—মুখ খুলে বলতে হবে না। মুখ বুজে দেখাশোনা না করলে আমার চলবে কেন?

চেরিল একবার অন্য রকমের। কথার পিঠে কথায় তার মুখে খৈ ফুটছে। কিন্তু দলে বসে তার হাঁ বন্ধ। বাপ্পার সঙ্গে তার ভক্তিরসের সম্বন্ধ। আমার সে প্রিয় সখী। আর নাথুরামের সঙ্গে তার তো সকালসন্ধ্যে লেগেই আছে। গম্ভীর-প্রকৃতি কানহাইয়ালালের সঙ্গেও তার নানান খুনসুটি। কিন্তু সভায় সে নিস্তব্ধ। আসরে সে নির্বাক। মোটামুটি সকলের কাছেই সে দূরের মানুষ। সবাই তার বিদেশী চেহারা অচেনা হাবভাব আর আলাদা রকমের পোষাক-আশাক দেখে আশ্চর্য হয়,—কাছে টানে না। তার ইংরিজি মেশানো দেহাতী হিন্দী ভাষাও ভাবের আদান-প্রদানের কাজে খুব একটা সুবিধের নয়।

সারাদিন খুব উৎসাহ নিয়ে চেরিল দলেবলে হাঁটে। কিন্তু দিনের শেষে মুদিত কমলকলি হয়ে যায়। তখন মহারাজের ব্যক্তিগত সেবায় সে নিজেকে ব্যস্ত রাখে। তারপর একটা মোটা চাদর জড়িয়ে মহারাজের পায়ের কাছে কুঁকড়ে শুয়ে ঘুমোয়।

সেদিন ভোর থেকে আকাশের মুখ ভার। হেমন্তের কুয়াশার মাথায় মেঘের টোপর। বেলা হতে না হতেই অকালবৃষ্টির গুঁড়ি-গুঁড়ি ছাট।

আমাদের রাস্তা দক্ষিণ-পূবে। ভোরে যাত্রা করেছি ভেলাপুর থেকে—বেশ জোর-কদম যাত্রা। উৎসব উপলক্ষে মালসিরাস থেকে পান্ধারপুর পর্যন্ত বাস চলে। সুতরাং রাস্তাও ভালো। কাদা নেই, পাথর নেই, খানাখন্দ নেই। ঢালু খাড়াই তো নেইই। সন্ধ্যের মধ্যে সেগাঁওতে পৌঁছব। সেখানে রাতের আস্তানা।

বেলা দশটার পর থেকে সংকীর্তন একটু স্তিমিত হয়ে আসে।

রোদ্দুরের তেজ বাড়ে, ক্লান্তিকর ভ্যাপসা গরম। চতুর্থ মালিকার গানে সকলের গলা সমান তেজে ফোটে না। তবে গলায় জোর কমলেও পায়ের জোর কমে না। দ্বিপ্রহরের ছুটির ঘণ্টার দিকে মন উৎকর্ণ হয়। পায়ের নিচে তাত বাড়লে পা আরো সচল হয়ে ওঠে।

এদিনটা অন্য রকম। রোদ্দুরের তো দেখাই নেই। তার বদলে বৃষ্টি। একবার হচ্ছে, একবার থামছে। ক-মিনিট পরেই আবার শুরু হচ্ছে ঝিরঝির। পাদুকা-শকটের ওপরে একটা ত্রিপল চাপা, যাত্রীদের মাথাচাপা দেবার মতো কিছুই নেই। অনেকেরই চাদরে মাথামুড়ি, কাঁধের পতাকা দণ্ডের সঙ্গে গুটিয়ে নেওয়া, ঝুলির মধ্যে হাতের মন্দিরা। মুখ বুজে হাঁটুর ওপর কাপড় তুলে ছপছপ করে রাস্তা ভাঙতে ভাঙতে সবাই চলেছে। দুধারে ঘর নেই বাড়ি নেই,—শুধু জওয়ারের খেত। বৃষ্টিভেজা বাদামী গুচ্ছগুলি দমকা হাওয়ায় দুলছে।

বেলা বাড়বার সঙ্গে বৃষ্টিও বাড়ল, সেইসঙ্গে কনকনে বাতাস। আমাদের প্রোগ্রাম বদলে গেল। দ্বিপ্রহরে বিরতি করা চলবে না। যতোটা এগোবার এগোতে হবে। থামবার সুযোগ পেলেই থামতে হবে।

বেলা তিনটে নাগাদ একটা গ্রামের কাছে এসে পৌঁছলাম। রাস্তার মোড়। গ্রাম থেকে আড়াআড়ি পথ বড়ো রাস্তার সঙ্গে মিশেছে। মোটা-গুঁড়ি অশথ আর নিমগাছ, ডাইনে বাঁয়ে টিন-ছাওয়া কাঁচা দেওয়ালের ঘর। ছোট বাজার, মোড়ের মাথায় দুটি পাকা বাড়ি। স্কুল আর স্বাস্থ্যকেন্দ্র। স্বাস্থ্যকেন্দ্রের গায়েই কৃষি-সমবায়ের বোর্ড ঝোলানো।

লরীগুলি আগেই এসে পৌঁছেছে। ঝাঁকড়া গাছের নিচে তাঁবু পড়েছে। দিনের বেলা সন্তপাদুকা শকট থেকে নামে না। আজ তার ব্যতিক্রম। বড় তাঁবুতে পাদুকা স্থাপিত হোলো। মূল বারকরীরা সেই তাঁবুতে আশ্রয় নিলেন। বাকি সবাই ছড়িয়ে পড়ল আশেপাশে। কেউ তাঁবুতে, কেউ বাড়ীর দাওয়ায়, কেউ দোকানের বেঞ্চিতে।

একটা স্বল্পপরিসর তাঁবু নির্দিষ্ট ছিল পূর্ণচৈতন্যজীর নামে। পিছল পথে হাত ধরে সেই তাঁবুতে তাঁকে নিয়ে গেল চেরিল। আমাদের দিণ্ডীর প্রধান বারকরীরাও সেই তাঁবুতে আশ্রয় নিলেন। তাঁদের বিশ্রামের ব্যবস্থায় দলের স্বেচ্ছাসেবকরা ব্যস্ত হোলো।

ছোট বড়ো যে জায়গাতেই আশ্রয় নিই, স্থানীয় লোকেরা বারকরীদের অভ্যর্থনার জন্যে তৈরি। ফুল নিয়ে মালা নিয়ে আহারের উপচার নিয়ে। সারা এলাকা জুড়ে মানুষজন উৎফুল্ল উচ্ছসিত। পাদুকা-প্রণামে যেমন আগ্রহ তেমনি উৎসাহ বারকরীদের সেবায়। বারকরীদের স্বাচ্ছন্দ্যবিধানে সবাই তৎপর। স্থানীয় ছেলেমেয়েরা জামার হাত গুটিয়ে কোমরে আঁচল জড়িয়ে মুহূর্তে প্রস্তুত।

এই ক্ষুদ্র গ্রাম প্রস্তুত নয়। এখানে পাদুকা কখনো নামে না, বারকরীরা কখনো থামে না! কৌতূহলী গ্রামবাসীরা শুধু রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে যাত্রা দর্শন করে। এই হঠাৎ-সৌভাগ্যে তারা অপ্রতিভ। তার ওপর ঝরঝর বৃষ্টি। প্রকৃতিও তাদের প্রতি বাম।

আমি পায়ে পায়ে মোড়ের দিকে চললাম। মস্ত একটা ঝুরিনামা পিপুল গাছ। ছড়ানো ডাল, ঘন পাতা, মাটির ওপর জেগে ওঠা মোটা মোটা শেকড়। খোলামেলা জায়গা, অথচ মাথার ওপর বৃষ্টি পড়ে না,—শুকনো মাটি।

সেই গাছের তলায় একটা চায়ের দোকান। গুঁড়িতে হেলান দেওয়া খাপরার চাল, বাঁশের খুঁটি। নিকোনো মাটির উঁচু বেদী,—তার গহ্বরে উনুন। কালো হাঁড়িতে জল ফুটছে। পাশের পৈঁঠেতে পান বিড়ি সিগারেটের উপচার। কৌটোভর্তি বাদাম, চালভাজা, চিউড়ার শুকনো নাড়ু।

পাশাপাশি দুটো বেঞ্চি। হাঁটুর ওপর কাপড় তোলা পাগড়ি মাথায় কটা লোক বেঞ্চিতে বসে আছে। স্থানীয় খদ্দের হবে। তাদের পাশ ঘেঁসে এক কোণে বসলাম।

এই আসন্ন বিকেলে মেঘমুড়ি ঘুমন্ত গণ্ডগ্রাম হঠাৎ যেন জেগে উঠেছে। বেঞ্চিতে বসে বসে দেখছি,—এ-গলি ও-গলি দিয়ে মেয়ে-পুরুষ ছুটে ছুটে আসছে। দোকানপাটের আধ-ভেজানো দরজাগুলো হাট করে খুলে গেছে। স্কুলবাড়ির ছেলেমেয়েরা দৌড়োদৌড়ি করছে। হাসপাতালের সিমেন্ট বাঁধানো চওড়া রোয়াকে চাটাই সতরঞ্চি পাতছে। মুদির দোকানের সামনে বেশ ভিড়। মাল উজাড় করছে দোকানী। ঐ উঁচু-মাথা তাঁবু, যার মধ্যে সন্তপাতুকা আর সন্তপঠ,—সেই তাঁবুতে শুরু হয়েছে অভঙ্গ গান।

এই চকিত-জাগ্রত উদ্যম আর চাঞ্চল্যে আমার গা ভাসাবার দরকার নেই। হঠাৎ বান ডেকেছে শীর্ণ নদীতে,—আমি তীরে বসে দূর থেকে দেখছি।

এই নদী আমার অচেনা, এই তীরও অচেনা। চেনা কেউ নয়। এতোদিন চলেছি,—আরো কতোদিন চলতে হবে ঠিক নেই। কার জন্মে কিসের জন্মে? যাদের সঙ্গে চলেছি তারা আমার কেউ নয়। যার জন্মে চলেছি সেও আমার কেউ নয়। এরা যে ভাষায় কথা বলে তা আমি জানিনে, যে দেবতার জন্মে পাগল তাকে আমি চিনিনে।

এদের সঙ্গে বন্ধু আছে, পরিজন আছে, রোগবিপদে দেখবার লোক আছে,—আমার কে আছে? ঐ তো দেখলাম তারাদগাঁও থেকে কজন দলছুট হোলো। একটা খাটুলিতে একটা মেয়েছেলেকে তুলে রেলস্টেশনে চলল। কী ব্যাপার? না, মেয়েটির গা জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে। তাই তাকে কাঁধে তুলে এবারের মতো ফিরে যাচ্ছে তার আত্মীয়-পরিজনরা। এবার হোলো না,—পরের বার তাঁর ইচ্ছে থাকলে যাত্রা পূর্ণ করবে ঠিক।

এমনি যদি আমার হয়? ভোর থেকে জলে ভিজে এখন যদি ধুম জ্বর আসে আমার? যদি হাঁটবার ক্ষমতা না থাকে? দুম্ করে যদি মাটিতে উল্টে পড়ি? মাথা আর না তুলতে পারি? কেউ দাঁড়াবে না আমার জন্মে। কেউ বাড়াবে না সেবার হাত। মাথা

তুলে খাড়া হব নিজেরই চেষ্টায়। টলতে টলতে এগিয়ে ঐ স্বাস্থ্যকেন্দ্র পর্যন্ত পৌঁছে দাওয়ায় লুটিয়ে পড়ব আবার।

আকাশের অভিমান বুকের মধ্যে বাসা বাঁধল। কার ওপর অভিমান? জানিনে, হয়তো নিজেরই ওপর। নিজেরই মনের সঙ্গে আড়ি-ভাবের খেলা। আসলে সেই খেলার একটু সময় পেয়েছি। চলতে চলতে হঠাৎ থেমে গেছি। দলের সঙ্গে মাখামাখি হয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ এক মুহূর্তের জন্যে দলছাড়া হয়ে এককোণে একলা হয়েছি। নিজের কাছে এসে বসেছি। এই দুর্লভ সুযোগটুকু এতোদিন আর পেয়েছি নাকি কখনো? বিট্‌ঠলের জন্যে হাঁটা, বিট্‌ঠলের নামে গান আর মন জুড়ে বিট্‌ঠলের ভাব-ভাবনা। নিজের জন্যে শুধু নিঃশ্বাসটুকু সম্বল,—আত্মচিন্তার উপায় আছে?

এইবার প্রাণ খুলে আত্মচিন্তা করি। কী রকম চিন্তা? দিনান্তের উদরপূর্তির চিন্তা, রাতে মাথা গোঁজার চিন্তা। চেরিল বাপ্পাকে নিয়ে নিশ্চয় ব্যস্ত। নাথুরামেরও ডিউটি আছে তাঁবুতে। কানহাইয়া-লাল গেল কোথায়? তাকে পেলে একসঙ্গে একটু চা খেয়ে আবার উঠতাম,—আশ্রয়ের খোঁজ করতাম। এখন ক্লান্ত পা আর নড়ছে না।

ছাতা মাথায় একটা ছেলে পাশে এসে দাঁড়াল। ফরসা চেহারা, অল্পবয়সী।

বাবুজী, আপনি একলা?

হ্যাঁ, কেন বলো তো?

আপনাকেই খুঁজছিলাম।

আমাকে খুঁজছিলে? তার মানে? কেন?

রাণীজী আপনাকে ডেকেছেন। চলুন!

আমাকে? রাণীজী?

হ্যাঁ আপনাকে। উঠুন, উঠুন, দেরি করবেন না। দেখছেন না, আবার জোর বৃষ্টি আসছে।

একটা গলির বাঁক ঘুরতেই স্কুলটার ঠিক পেছনে লোহার গুলি-বসানো মস্ত কাঠের গেট। বিরাট দোতলা পাকাবাড়ি। একতলাটা পাথর দিয়ে তৈরি। সামনের দেয়ালে কিছু বিবর্ণ কারুকার্য,—ফুলপাতা পাখি হরিণ,—ম্লান হয়ে আসা তেলরঙ।

ছাদঢাকা দেউড়ি। ঝাপসা অন্ধকার। সেই অন্ধকারে অনভ্যস্ত চোখের সামনে শাদা একটি মুখ আর নমস্কারের ভঙ্গিতে কপালে ছোঁয়ানো শাদা একজোড়া হাত।

নমস্তে, আস্থন, আস্থন—

নমস্তে।

হলুদ শাড়িতে ঘেরা একটি রমণীদেহ। দীর্ঘ চেহারা। ধবধবে রঙ,—ঘন চুল টানটান করে বাঁধা।

এই নাকি রাণীজী? কোন্ রাজ্যের রাণী?

ভাঙা হিন্দীতে বললাম,—আপনি আমাকে ডেকেছেন?

আমি ঠিক ডাকিনি,—ঐ শংকর ছোকরা আপনাকে পছন্দ করে ধরে নিয়ে এসেছে। আপনি বারকরী যাত্রায় চলেছেন,—তাই না?

হ্যাঁ।

কিন্তু মনে হচ্ছে আপনি এদেশের লোক নন! কোথায় আপনার ঘর?

পশ্চিম বাংলায়?

পশ্চিম বাংলায়? সেখান থেকে এসেছেন?

আজ্ঞে হ্যাঁ!

কী কাণ্ড! মহিলার চোখে মুখে ক্ষোভ-মেশানো বিস্ময়!

সঙ্গে সঙ্গে হেঁকে উঠলেন,—শংকর। ওরে শংকর! হ্যাঁরে বাবা শংকর, এই একজনকেই ধরে আনলি? আর কাউকে পেলিনে?

বাঃ! আবার যদি বৃষ্টি আসে? সময় পেলাম কোথায়?

খুব করেছ! যা আবার যা! কোথায় বৃষ্টি? যান যান,

আপনিও যান। আপনার বন্ধু নেই, সঙ্গনেই? সবাইকে ধরে নিয়ে আস্থন এখানে!

এখানে? আপনার কাছে? কেন বলুন তো?

কী আশ্চর্য? ঝংকার দিয়ে উঠলেন মহিলা,—এতো বেলা পর্যন্ত পেটে নিশ্চয়ই কিছু পড়েনি! খেতে হবে না? বিশ্রাম করতে হবে না? রাত্তিরে শুতে হবে না? যা শংকর, বৃষ্টি কমেছে,—সঙ্গে যা,—দেখিস অতিথি যেন পালিয়ে না যায়।

বৃষ্টি ততোক্ষণে উধাও। আকাশের কোণে ঝকঝকে নীলের আভাস। শংকরের সঙ্গে বার হয়ে চেনাশোনা অনেককেই পেলাম। পাশের দোকানে দুই অধ্যাপক, গাছতলায় সেই কবীরপন্থী দল, বাজারের সামনে কান্‌হাইয়ালাল আর পূর্ণচৈতন্যজীর তাঁবুর মুখে চেরিল। আরো দু-একটি চেনা মুখ,—রাজোয়াড়ার রাণীজীর নাম করে সকলকেই একসঙ্গে জুটিয়ে ফেললাম।

শংকর ছোকরার পেছনে পেছনে দলবল নিয়ে আবার ঢুকলাম। সবাইকে বসালাম হাট করা রংমহলে। তারপর বললাম,—তোমার রাণীজী কোথায়?

আস্থন আমার সঙ্গে।

পিছনের বারান্দা। শ্বেতপাথরের ঝিলিমিলি। পদ্মকাটা খিলেন। তারপরেই বাগান। গাছের ফাঁকে ছোট একটি চূড়ো,—গৃহদেবতার মন্দির। বারান্দার এক কোণে তিনি দাঁড়িয়েছিলেন। বিকেলের মেঘভাঙা রোদে তাঁর মুখে হাতির দাঁতের রঙ ফুটেছিল।

সবাইকে ঘরে বসিয়েছেন তো?

হ্যাঁ, শুধু বসা নয়, আপনার নরম কার্পেটে টানটান করে গা এলিয়েছেন সবাই!

আহা,—আপনারা সবাই যে ক্লান্ত!

আমি ভদ্রতা করে বললাম,—তার ওপর যা বৃষ্টিবাদল, আপনি আশ্রয় না দিলে কী যে হোতো আমাদের!

তার মানে? স্বচ্ছ গলায় প্রতিবাদ করলেন,—আমি না ডাকলে আপনাদের আশ্রয় জুটত না? আপনাদের এই যাত্রায় অগুনতি লোক—তারা সবাই পথে বসে আছে?

এ প্রশ্নের কী জবাব দেব? আমি তো চারদিক ঘুরে দেখে এসেছি এইমাত্র। রাস্তার ধারে তাঁবুর পর তাঁবু খাটানো হচ্ছে। স্কুল, স্বাস্থ্যকেন্দ্র আর সরকারী বাড়িগুলির দরজা হাট করে খুলে গেছে। ছোটখাটো যাত্রীদলকে পাকড়ে নিয়ে ঘরে তুলবার জন্যে গৃহস্থরা ব্যস্ত। দোকানদারদের সাগ্রহ হাঁকডাক। যেসব প্রবীণ বারকরীরা তাঁবুতে থাকবেন, তাঁদের খাবার ব্যবস্থার জন্যে চালা খাটিয়ে বড়ো বড়ো উনুন ধরাবার আয়োজন হচ্ছে। বারকরী স্বেচ্ছাসেবকরা তো ব্যস্তই, তাদের সঙ্গে হাত লাগিয়েছে স্থানীয় ছেলেমেয়েরা। কেউ বিপন্ন নয়, কেউ আর অপ্রতিভ নয়। পড়ন্ত বিকেলে সারা গাঁয়ে যেন একটা উৎসব লেগে গিয়েছে।

স্বীকার করলাম,—পথে বসলেই হোলো? আপনি আছেন কী করতে? আপনাদের এই গ্রামের সজ্জনরা আছেন কী করতে?

তবে? হাসিতে ভরে গেল মুখ,—আসলে কী জানেন? বছরের পর বছর আমাদের গাঁয়ের সামনে দিয়ে বারকরীরা যায়,—নাচতে নাচতে গাইতে গাইতে চলে যায়,—দু-দণ্ড থামেও না। এবার বিটঠল দয়া করেছেন।

দয়া করে ঝড়বৃষ্টি নামিয়ে পথ আটকেছেন,—তাই না?

নিশ্চই। এমনি দয়া কবে আবার হবে? বারকরীরা থেমেছেন, পাদুকা নেমেছেন। সেবার এমন সুযোগ পেলে ছাড়া যায়?

করুন, করুন,—কষে সেবা করুন।

করবই তো? আমি কেন, সবাই। এতে কতো পুণ্য জানেন?

আমাদের দলে একমাত্র মেয়েছেলে চেরিল। মেয়েলি গলা শুনে গুটিগুটি সে কাছে এল। গৃহকর্ত্রী তার দিকে মুখ ফেরালেন।

এটি আবার কে গো? ছেলে না মেয়ে? কোন্ দিশী মানুষ? অ্যাঁ! আপনাদের দলে জুটল কোত্থেকে?

এমনি অবাক-হওয়া উক্তি চেরিল এ যাত্রায় অনেক শুনেছে,—এতে সে ঘাবড়ায় না। খিলখিলিয়ে হাসল।

আমি তাড়াতাড়ি সংশয়মোচন করলাম।

এ ছেলে সেজে থাকে। আসলে মেয়ে, বিদেশী মেয়ে,—গুটিগুটি আপনার সঙ্গে আলাপ করতে এসেছে।

আহা, মরে যাই! উট্‌ভুট্টে বেশবাস হলে কী হবে,—কেমন সুন্দর চেহারা, কী কচি মুখ!

চেরিলের চিবুকে আঙুল ঠেকিয়ে একটু চুমু খেলেন।

তা কোথায় তোমার দেশ গো? আমাদের কথা বুঝতে পারো?

চেরিল মুখ খুলল। হাসিমুখে বললে,—

একটু একটু পারি। আমার দেশ অ্যামেরিকায়!

বাঃ? বেশ, বলতেও তো পারো! কী বললে? অ্যামেরিকায়? কিন্তু অ্যামেরিকার মেয়ে এ দলে কী করে জুটলে বোন?

নত মুখে চেরিল উত্তর দিল,—

বিট্‌ঠলদর্শনে চলেছি।

ছাখো কাণ্ড! সাত সমুদ্দুর পার হয়ে বিট্‌ঠল দেখতে এসেছে! আর আমি কিনা বিট্‌ঠলজীর বারবাড়ির দেউড়িতে বসে আছি,—কাছে যেতে পারিনে!

আমি অবাক হয়ে বললাম,—

সে কী? আপনি কখনো পান্ধারপুর যাননি?

আমি যাব? তা হলেই হয়েছে। লোহার বাঁধনে বেধে রেখেছে ভাই! তবে আমিও তেমন মেয়ে নই। আমিও বুকে বেঁধে রেখেছি। কিগো মেয়ে, দেখবে?

গলার আঁচলটা একটু সরিয়ে দিলেন। সোনার হার চিকচিক

করছে। বুকের কাছে লকেট,—কষ্টিপাথরের একটি কড়ে-আঙুল পরিমাণ বিট্‌ঠলমূর্তি।

একটু থমথমে ছায়া পড়ল মুখে। সঙ্গে সঙ্গে হাসি ফুটিয়ে কথা ঘুরিয়ে বললেন,—চলুন, একটু চা খেয়ে নিন সবাই।

পাশ দিয়ে কজন পরিচারিকা হলঘরের দিকে গেল। তাদের হাতে বড়ো বড়ো ট্রে। ঝকঝকে টী-পট আর কাপ। ডিশভর্তি খাবার।

আমি একটু দাঁড়ালাম। শব্দ করে হাসলাম। বললাম,—ঘোলের স্বাদ কিন্তু আপনি দুধে মেটাচ্ছেন। আর অতিথি পেলেন না?

কেন?

আমরা সব সখের যাত্রী,—কেউই বারকরী নই।

একচোখ দেখেই বুঝেছি ভাই! আপনাদের সেবা করেই আমি কৃতার্থ হব।

চেরিলকে নিয়ে আমি এগোলাম। আমাদের সঙ্গে গৃহকর্ত্রী ঢুকলেন। হাত তুলে নমস্কার করলেন।

আমি তাঁর কিছুই জানিনে। কেবল জানি নামটুকু,—যে নামে শংকর তাঁকে ডাকে। তাই ঘোষণা করলাম,—

এঁর আশ্রয়েই আমরা আজ আছি। ইনি এখানকার রাণীজী।

প্রবীণ অধ্যাপক গোখলের দিকে রাণীজীর দৃষ্টি পড়ল। দু-পা এগিয়ে গিয়ে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলেন।

বললেন,—না না রাণীজী নয়। আমার নাম রোহিণীবাঈ।

॥ ২৬ ॥

বেশ কিছুক্ষণ পরে অন্দরমহল থেকে বার হয়ে এল চেরিল। এমনি আয়েশ সে অনেকদিন পায়নি। বেশ ভালো করে স্নান করেছে। মুখচোখ পরিষ্কার করেছে, চুল আঁচড়িয়েছে, বদলে নিয়েছে কুর্তা-পাঞ্জাবী। একেবারে ঝকঝকে দেখাচ্ছে তাকে।

যাত্রীরা সবাই পা ছড়িয়ে বিশ্রাম করছে চা-জলযোগের পর। চেরিল আমাকে আলাদা করে ডাকল,—চলো সখা, একটু বার হই।

চলো, আমি তো তৈরি,—কদ্দুর যাবে এই জলকাদায়?

রোহিণীবাঈও বললেন,—বেশি দেরি করো না কিন্তু,—আবার বৃষ্টি আসতে পারে।

চেরিল বললে,—না, এই যাব আর আসব। একবার খোঁজ নিয়ে আসব বাপ্পার!

বাপ্পা, সে আবার কে?

আমি বুঝিয়ে বললাম,—

এক বৃদ্ধ বারকরী। এই মেয়েটা তাকে বাবা বলে ডাকে।

রোহিণীবাঈ একবার চেরিলের দিকে তাকালেন,—স্নেহভরা চোখ। বললেন,—আর আপনাকে ডাকে সখা বলে। তাই না?

তাই। ও আমার প্রাণের সখী!

মুচকি হাসলেন রোহিণীবাঈ।

আর আমাকে কী বলে ডাকবে বোন?

কিছু বলেই না। তবে পোঁটলা-পুঁটলি বেঁধে কাল যদি আমাদের সঙ্গে চলেন,—তাহলে দিদি বলে ডাকব।

রোহিণীবাঈ কিছু বললেন না। একটা নিশ্বাস চাপলেন বলে মনে হোলো। পাশের বারান্দা থেকে হাঁক মারল কানহাইয়ালাল।

ও হে প্রাণের সখী! শোনো একটা কথা!

কাজ পেয়ে গেছে কানহাইয়ালাল। সন্ধ্যেবেলা একঝাঁক নিমন্ত্রিত। রান্নাবান্নার আয়োজন শুরু হয়েছে। পরিচারকদের সঙ্গে সেও হাত লাগিয়েছে। একটা মস্ত বারকোশে আটা ভিজিয়ে দমাদম্ ঠাসছে।

চেরিল বললে,—ইস্, চ্যাঁচাচ্ছে ছাখো। বলো কী বলবে?

বলি, সখাকে নিয়ে একেবারে হাওয়া হয়ে যেয়ো না! তাড়াতাড়ি ফিরো, কাজ আছে।

ফিরব ফিরব। বাপ্পাকে একবার দেখেই ফিরে আসব।

ফিরবে তা জানি। আমার দাদাকে নিয়ে ভাগবে সে ভাগ্য কি তোমার আছে? আর বাপ্পার জন্যেই বা কতো দরদ! আসলে ঐ ছোঁড়া নাথুরামের জন্যে মনটা কুলকুল করছে,—তা কি আমি বুঝিনে?

চেরিল চটে লাল। কানহাইয়ালালের পিঠে একটা কিল বসায় আর কি?

তখন অন্ধকার নেমে আসছে। বড়ো রাস্তার দোকানে দোকানে টিমটিম আলো জ্বলছে। মেঘেরা সরে পড়েছে, দূর দিগন্তে মিটমিট তারা। পূর্ণচৈতন্য আছেন বারকরী তাঁবুতে। কোনো অসুবিধে নেই তাঁর। তাছাড়া নাথুরাম আছে তাঁর সঙ্গে। তবু চেরিলের মনটা খচখচ করছে।

গ্রাম্য বাজার, এমন কিছুই নয়। ছোট আনাজমণ্ডী,—আর কয়েকটি দোকান। কিরানার, ওষুধের, টুকিটাকি মনোহারি জিনিসের। দু-একটা পান-সিগারেটের গুমটি, চায়ের স্টল। একটা দোকান রবারের জুতোর, তার একপাশে বইখাতাও বিক্রী হয়। দু-একটা সাইকেল মেরামত আর স্টোভ সারাবার কারখানা। পাশেই কেরাসিন বিক্রীর ঘাঁটি।

চা-খাবারের দোকানের সামনে খুব ভিড়। এক সন্ধ্যের জন্যে সেগুলো খাবার হোটেল হয়ে গিয়েছে। উনুনে জোর আঁচ,—ভাজি রুটি বানাবার ব্যস্ততা। সেদিকে আমাদের নজর নেই। রাজবাড়ির অতিথি আমরা। বৈকালিক জলযোগ পেটে গজগজ করছে। একটু হেঁটেহুঁটে খিদে বাড়িয়ে আমরা ফিরে যাব, রাজভোগ খাব,—পা টানটান করে নরম কার্পেটে শুয়ে ঘুমোবো। বারকরী যাত্রায় আজ আমাদের রাজসিক বিরতি।

বাজার অঞ্চল ছাড়িয়ে বারকরীদের সার সার তাঁবু। পূর্ণচৈতন্যজীর তাঁবুর সামনে দাঁড়িয়ে চেরিলকে বললাম,—

যাও, মহারাজের সঙ্গে দেখা করে এস।

তুমি যাবে না?

তুমিই যাও না। আমি একটু এদিকটা ঘুরি।

আমি সামনের দোকানগুলো দেখে বেড়ালাম। একটু পরে চেরিল ফিরে এল। এসেই বললে,—বাপ্পার সঙ্গে দেখা করতে কেন গেলে না সখা?

আমি বললাম,—তাতে কী? ঠিকই আছেন, দেখে এলে তো? তুমি দেখে এলেই আমার দেখা হোলো।

তা কী করে হবে? বাপ্পা তোমার কথা জিজ্ঞেস করছিলেন। আমি বললাম, তুমি বাইরে দাঁড়িয়ে আছ। শুনে কিছু আর বললেন না। তবে একবার গেলেই পারতে।

পারতাম চেরিল। কানহাইয়ালালের কথা মনে পড়তেই আর গেলাম না।

কানহাইয়ালালের আবার কী কথা?

ঐ যে বলল,—শুধু বাপ্পার জন্যে নয়, নাথুরামের জন্যেও তোমার মন উড়ুউড়ু। তা নাথুরামের দেখা পেলে? কথা হোলো তার সঙ্গে?

গম্ভীর হয়ে গেল চেরিল।

এতো তাড়াতাড়ি ফিরলে কেন! আমি নাহয় আর কিছুক্ষণ এখানে দাঁড়াতাম।

কোনো জবাব দিল না। পা বাড়াল সামনে।

বড়ো রাস্তা ধরে আমরা পাশাপাশি হাঁটলাম। চেরিল গুম হয়ে চলল,—একটা কথা নেই মুখে।

ভিড় ছাড়িয়ে কিছু দূর গিয়ে হঠাৎ চেরিল দাঁড়াল। তীব্র কটাক্ষে তাকাল আমার দিকে। চাপা গলায় বলে উঠল,—বেশ করব। নাথুরামকে না দেখলে ছটফট করব। নাথুরামের কাছে ছুটে যাব, নাথুরামকে সব সময় ভাবব,—তোমার তাতে কী?

আমার খুব মজা লাগল। মজা করবার জন্যেই আমি মহারাজের তাঁবুতে যাইনি।

ঠিকই তো, আমার তাতে কী?

কিছুই না তোমার! বয়েই গেছে তোমার! আমারও বয়ে গেছে। শুধু নাথুরাম কেন, সব্বাইএর কথা ভাবব,—খালি তোমার কথা ছাড়া। সক্কলের সঙ্গে কথা বলব, কেবল তোমার সঙ্গে ছাড়া।

একেবারে কথাই বলবে না চেরিল?

কেন বলব? সখা বলে ডেকেছি,—তাতেই হোলো? বড়ো দেমাক যে তোমার? এই নাথুরাম,—নাথুরাম কেন সব্বাই,—সময় পেলেই কতো কথা জানতে চেয়েছে,—কী তোমার নাম, কী পেশা, কোথায় দেশ, কোথায় ঘর? কবে এদেশে এসেছ, কেন এসেছ, কেন তীর্থে চলেছ,—কতো কী? আর তুমি?

আমি কী চেরিল?

আমার পুরো নামটাও তুমি কোনোদিন জানতে চেয়েছ? এতোদিনেও আমি যেমন তোমার অচেনা, তুমিও তেমনি আমার অচেনা। কী সম্পর্ক তোমার সঙ্গে?

রাস্তার ধারে একটা বেঞ্চি। চেরিলের ডান হাতটা চেপে ধরলাম। টেনে নিয়ে গিয়ে বেঞ্চিতে বসালাম। ঘাড় ফিরিয়ে গোঁজ হয়ে বসল। খুব চটেছে! নাথুরামকে নিয়ে কান্‌হাইয়ালাল একবার ঠুকেছে, আর একবার ঠুকেছি আমি,—দারুণ বিগড়িয়েছে তাতে।

সোজাসুজি বললাম,—কে বললে তুমি আমার অচেনা চেরিল? তোমার সব আমি জানি।

কী জানো? মাথা ঝাঁকিয়ে উঠল চেরিল।

যা জানবার সব। ধরো, আমি জানি তুমি অ্যামেরিকার মানুষ, —আমাদের দেশে বেড়াতে এসেছ। নাসিকে মহারাজের সঙ্গে তোমার আলাপ হয়েছে, আমার সঙ্গে আলাপ হয়েছে আলন্দীতে।

তুমি বারকরীদের সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে পান্ধারপুর চলেছ। পান্ধারপুর পৌঁছবার পর আবার কোথাও চলে যাবে,—ধরো নিজের দেশে।

ব্যস ?

ব্যস কেন ? আরো অনেক কিছু জানি। এই যেসব সাধুসন্তদের নাম বারকরীদের মুখে মুখে তাদের জীবনী নিশ্চয় তুমি পড়েছ। যেসব গান তারা গায় তাদের অনেক গানের ইংরেজি তর্জমা তোমার মুখস্থ। কম জানা হোলো ?

মুখ ফিরিয়েছিল। চোখ তুলে আমার দিকে তাকাল। মাথা নেড়ে বললে,—

ঠিক বলেছ সখা। অনেক জেনেছ। তুমিও কি আমার অচেনা নাকি ? এই ধরো তুমিও বলতে গেলে এখানে বিদেশী। বাংলা তোমার মাতৃভাষা,—আমার সঙ্গে তোমার আলাপ আলন্দীতে, বাপ্পার সঙ্গে তোমার চেনা আরো আগে। তুমিও বারকরীদের দলে মিশে পান্ধারপুর চলেছ। মারাঠী না জানলেও মারাঠী সাধুসন্তদের কথা তুমিও পড়েছ,—খুব সম্ভব হিন্দীতে কি তোমার নিজের ভাষায়। পান্ধারপুরে পৌঁছে তুমিও আবার চলে যাবে, হয়তো নিজের দেশে। তবে ? অনেক জেনেছি, আর কি জানার আছে বলো তো ?

ঠিকই চেরিল। বারকরী যাত্রার সহযাত্রী আমরা। আর কিছু জানার নেই। এর বেশি কারুর কাউকে জানার নেই। জানতে নেই।

চেরিল চট্ করে উঠে দাঁড়াল। বললে,—জানাজানি অনেক হয়েছে। এবার তাড়াতাড়ি ফিরে চলো, নইলে সাধুটা আবার আমাকে দুষবে।

আমি চেরিলের মুখের দিকে তাকিয়ে শান্ত হাসি হাসলাম,— চেরিলও হাসল। সামনের দোকানের পেট্রোম্যাক্সের জোর আলো তার মুখে এসে পড়েছে।

দোকানটা বেশ,—খানদানি স্টক। এক ঝলক তাকালেই চোখে পড়ে দালদার টিন, চায়ের প্যাকেট, জমাট দুধ আর কফির কৌটো।

সাবান আর সেফটি ব্লেডের বাক্স। তক্ষুণি ওঠা হোলো না। মোটাসোটা দোকানী আমাদের আটকাল, বেঞ্চির ওপর একটা শতরঞ্চি পেতে আইয়ে-আইয়ে বলে সমাদর করে আবার বসাল। ছোকরা কর্মচারীকে হেঁকে হুকুম দিল,—আরে এ ছটু, রতনের দোকান থেকে দো-কাপ গরম চা লা জলদি,—বড়িয়া চা।

পান্ধারপুরের যাত্রী আমরা,—নতুন মুখ। দোকানী সবিনয়ে জিজ্ঞেস করল,—বাবুজী, আপনারা কোথায় উঠেছেন? কোথায় রাত কাটাবেন? কোনো তকলিফ হবে না তো?

না, না, কোনো অসুবিধা হবে না আমাদের। রাতে থাকবার খুব ভালো জায়গা আমরা পেয়ে গেছি।

কার বাড়িতে বাবুজী?

রাণীজীর বাড়িতে।

রাণীজীর?

হ্যাঁ, মস্ত বড়ো বাড়ি,—আপনাদের কো-অপরাটিভ অফিসের পেছনে।

বুঝেছি বুঝেছি। হনুমন্ত রাজোয়াড়া,—তাই বলুন। কিন্তু ও বাড়ির দরজা তো সবসময় বন্ধ থাকে,—কেমন করে ঢুকলেন আপনারা?

ঐ যে বললাম,—ও বাড়ির এক মালিকানী আছেন, তিনি আমাদের ডেকে নেমন্তন্ন করেছেন। ওরা শুনলাম ওঁকে রাণীজী বলে ডাকে,—আপনি চেনেন না?

রাণীজী? থক্ করে মাটিতে এক ধ্যাবড়া থুথু ফেলল দোকানী।

আপনারা তীর্থ করতে চলেছেন,—আর ঐ মেয়েমানুষটার ঘরে নেমন্তন্ন নিয়েছেন? আর ঠাঁই জুটল না আপনাদের? ছি ছি!

দোকানীর ঠোঁটের থুথুকার আর কথার ছিছিক্কারে চমকে উঠলাম। আন্‌কা জায়গায় এক রাতের জন্যে মাথা গুঁজতে চলেছি,—এ আবার কেমন ধমক?

কী হোলো? অমন করে বলছেন কেন?

পয়সা ছড়িয়ে নোকরদের কাছে রাণীজী নাম কিনছে,—তাতে বদনাম ঢাকে?

ধিক্কারে মাথা নাড়ল কয়েকবার। আবার বললে,—বলব না? তবে বলবই বা কী করে? আপনারা আজ আছেন কাল নেই,—ঘরের কেলেঙ্কারীর কথা বাইরের লোকের কাছে কেউ ভাঙতে চায়?

ঘরের কেলেঙ্কারী?

ঐ হোলো,—গাঁয়ের কেলেঙ্কারী,—সমাজের কেলেঙ্কারী। সমাজ নিয়েই তো ঘর!

গেলাসের চা এক চুমুকে শেষ করে উঠে দাঁড়ালাম।

না ভাঙলেন। চায়ের জন্যে ধন্যবাদ। আচ্ছা, এবার আমরা চলি।

সামনে পথ আটকে দাঁড়াল লোকটা।

যাবেন কোথায়? ঐ রোহিণীবাঈএর বাড়িতে? চলুন বাবু। আপনারা আমার বাড়িতে থাকবেন চলুন। দয়া করে ওখানে রাত কাটাবেন না।

গলাটা আমার একটু তীব্র হোলো।

কেন বলুন তো?

এতোক্ষণ একটু সমীহ করছিল বোধহয়। গলা নামিয়ে একটা খুব নোংরা জায়গার নাম করল। বললে ওখানে থাকা আর সেই জায়গায় থাকা একই কথা।

চেরিলের বুঝতে একটু অসুবিধে হোলো না। সে তার রিনরিনে তীক্ষ্ণ গলায় চিৎকার করে উঠল,—

অ্যায়সা বুরা বাত আপ কিঁউ বোলতে হেঁ?

চেরিল যে এদেশী ভাষায় এমনি দাপটের সঙ্গে প্রতিবাদ করতে পারে তা ভাবতেই পারেনি দোকানী। ধমক খেয়ে থতমত হয়ে গেল, তারপর চিবিয়ে চিবিয়ে উত্তর দিল,—বলি কী আর সাধে? আপনারা

পুণ্য পথে চলেছেন। ভাগ্যে একটা রাত কাটাচ্ছেন আমাদের গাঁয়ে। তাই বলে পাপের ক্লেদ এখানে গায়ে মাখবেন? ঐ রোহিণী— ও কোনো ভদ্র ঘরের মেয়ে নাকি? ও তো গঙ্গাযমুনার গানাওয়ালী। ছোকরা মালিককে বশ করে রাজোয়াড়ায় ঢুকেছে। উড়ে এসে জুড়ে বসেছে!

মালিক কোথায়?

মালিক তো তিন সাল বোম্বাইএ—নাকি ফিলিম করছে। আর তার মেয়েমানুষ রাজত্ব করছে এখানে!

নাগপুরের গঙ্গাযমুনার নাম আমি জানি, যেমন জানি কাশীর ডালমণ্ডীর নাম। কথা বাড়াতে ইচ্ছে করল না। চেরিলের কাঁধে হাত রেখে চাপা গলায় বললাম,—

চলো চেরিল।

বৃষ্টির পর ঝরঝরে চারদিক। আকাশের চেহারা চকচকে পরিষ্কার, তারাফোটা দিগন্ত। সুন্দর ঠাণ্ডা হাওয়া। কিন্তু দোকানীর ঐ কথাবার্তা সব প্রফুল্লতা শুষে নিয়ে একটা ক্লিন্ন কুয়াশার আস্তরণ ছড়িয়ে দিয়েছে মনের ওপর।

এতোদিন ধরে হাঁটছিলাম সমাজ-সংসারের প্রান্ত-ছাড়ানো পথে। যাদের সঙ্গে হাঁটছি তারাও ছুটি নিয়ে এসেছে সমাজ থেকে সংসার থেকে। সংসারে তিক্ততা আছে, সমাজে গ্লানি আছে। কিন্তু তার স্পর্শ একবারও পাইনি। প্রতিদিন অমৃতধারায় স্নান করেছি, অমৃতস্বাদ পান করেছি। আজ বারকরী যাত্রায় হঠাৎ ছেদ। আজ সন্ধ্যায় গান নেই, আলোচনা নেই, বারকরী ব্রত নেই। আজ ছুটি পেয়েছি। খেয়ালখুশিতে ঘুরতে বেরিয়েছি হাটে বাজারে। সুধাসাগরের তীর থেকে এক-পা সরে আসতেই ওষ্ঠের কাছে উঠে এসেছে হলাহল।

রাজোয়াড়ার দিকে ফিরতে ফিরতে চেরিলকে বললাম,—শুনলে তো চেরিল?

শুনলাম,—মনটা তেঁতো হয়ে গেল।

এমনি তিক্ততা কী করে এড়ানো যায় জানো?

কী করে?

না জেনে না শুনে। তাই জানতে নেই শুনতে নেই। আমরা উদাসীন যাত্রী, বিট্‌ঠলের সুবাদে একসঙ্গে জুটেছি, বিট্‌ঠলের জন্যেই চলেছি। আমাদের অতো জানাশোনা কীসের? কার হাঁড়িতে কী আছে তা জেনে আমাদের কী হবে?

মাপ করো সখা, তখন তুমি ঠিকই বলেছিলে।

চেরিল আবার নরম গলায় বললে,—ধরো রাণীজী, মানে ঐ রোহিণীবাঈ। কী সুন্দর চেহারা, কী মিষ্টি ব্যবহার! কাল ভোরবেলা আমরা চলে যাব,—এক রাত্তিরের আশ্রয়। ব্যাস্ এইটুকু—এসব নোংরা কথা না জানলে কি চলত না?

রাস্তার ডানধারে বারকরীদের তাঁবু। আর একটু এগিয়ে আমরা বাঁ দিকে মোড় নেব।

চেরিল হঠাৎ আবার বললে,—

কিন্তু সখা দেখেছ পান্ধারপুরের জন্যে কী আকুতি! গলায় আবার বিট্‌ঠলহার! অথচ পান্ধারপুরে কখনো নাকি যায়নি! কেন বলো তো?

হয়তো দুঃখ আছে, অভিমান আছে। আমি জানিনে চেরিল, তুমিও জানতে চেয়োনা। অতো কৌতূহল ভালো নয়।

ঠিক। তার থেকে গান অনেক ভালো। তাই নয়?

মনে পড়ল, কানহাইয়ালালও তাই বলেছিল।

সেই আয়োজনই চেরিল করল রাজোয়াড়ায় ফিরে গিয়ে। রোহিণীবাঈ-এর রংমহলে গোল হয়ে আমরা বসলাম। গৃহকর্ত্রীকে জোর করে বসালো মাঝখানে। হাত ধরে বললে,—দিদি, আপনাকে একটা গান করতে হবে।

হঠাৎ পাংশু হয়ে গেল রোহিণীবাঈএর মুখ।

গান? আমি কী গান করব বোন?

কেন? কখনো গান করেননি, গান আপনি জানেন না?

মিথ্যে কথা বলব না। গান জানি। কিন্তু বারকরীদের গান তো জানিনে।

আমরাই কি কেউ জানি নাকি? আমরা বারকরী? বারকরীদের গান শুনে শুনে কান পচে গেছে,—এখন অন্য গান শুনব। শোনান দিদি আমাদের।

ঐ রঙিন কার্পেট-মোড়া আর ঝাড়বাতির রোশনাইভরা রংমহলে কতোকাল ধরে কতো গান নিশ্চয় হয়েছে। পরদেশী সাঁইয়ার বিরহে কতো তানের ফুৎকার, কতো মীড়ের মূর্ছনা। শৃঙ্গার-ব্যাকুল হৃৎস্পন্দনের তালে তালে লয়ের কতো বিচিত্র বিস্ফোরণ।

আজ এখানে অন্য গান।

নিমীলিত চোখ। হাঁটুমুড়ে বসা নিশ্চল ভঙ্গী। কোলের ওপর স্তব্ধ দুটি হাত। মুখমণ্ডলে প্রশান্ত একাগ্রতা। রোহিণীবাঈএর দেহে মৃদু হিল্লোল জাগল। কণ্ঠে জাগল সেই গান। যে গান গেয়ে বৃন্দাবনের পথে পথে ঘুরেছিলেন রাজবধূ মীরাবাঈ,—'তুমহারে কারণ সব সুখ ছোড়য়া, অব মোহি কিঁউ তরসাও।'

তোমার জন্যে ছেড়েছি সকল সুখ,
এখনো কেন হে তিয়াসে আমায় রাখো।
বিরহব্যথায় অন্তর জরোজরো,
তোমার প্রেমের অঞ্চলছায়ে ঢাকো॥
ছাড়তে পারিনে তোমাকে কখনো প্রভু,—
কেঁদে মরি শুধু যুগল চরণ তরে।
জনম জনম আমি যে তোমার দাসী,—
অঙ্গ লাগাও আকুল অঙ্গ পরে॥

এবার দোতারার তারে টুংটাং,—সঙ্গে খঞ্জনি। রোহিণীবাঈএর

গানের পর শুরু করল কবীরপন্থীরা—'জাগ পিয়ারী অব কা সোবে। রৈণ গয়ি দিন কাহেকো খোবে।'

সখি রে তুই ঘুমিয়ে আছিস কেমন করে?
ফুরিয়েছে রাত দিন খোয়াবি তন্দ্রাঘোরে?
বুকের মাঝের ত্রিরত্ন তোর হরণ করে
নিত্যজাগর পালিয়ে গেছে ফেলে তোরে।
মূর্খ মেয়ে, গেছে তোরে নিঃস্ব করে,—
এখনো তুই বাঁধা আছিস মোহের ডোরে॥

জেগে ছাখ, তোর বাসব শয়ন শূন্য যে হায়,
সঙ্গীহানা আলিঙ্গনের স্পর্শ না পায়,—
নিঠুর প্রেমিক উষার লগ্নে যায় চলে যায়,—
বিরহিণীর মুখের দিকে ফিরেও না চায়।
মন্ত্রের বাণ অন্তরে যার ব্যথা জাগায়,—
কবীর বলে,—কেমন করে সে জন ঘুমায়॥

সখা, তুমি এবার একটা গান করো।

আমার দিকে তাকিয়ে মিষ্টি হেসে চেরিল বললে।

দারুণ হাসলাম আমি।

এবার ভালো লোককেই তুমি ধরেছ চেরিল? আমি গান জানি? কোনোদিন আমার মুখে গুনগুনটুকু শুনেছ?

না শুনলে কি হয়, তুমি জানো।

এও তুমি জেনেছ? কেমন করে জানলে?

তোমার দেশ গানের গুরুর দেশ। তোমার দেশে গীতাঞ্জলি-গঙ্গার ধারা। আর তুমি গান জানো না? বললেই হোলো?

মনের মধ্যে প্রতিধ্বনি,—বললেই হোলো? মিথ্যে কথা বললেই হোলো? বিশ্বের শ্রেষ্ঠ মরমী কবির কটি গান সারা জীবন পুরে

রেখেছি বুকের মধ্যে। শৈশবে পাখির মতো কণ্ঠে জেগেছে সে গান। বিভোল যৌবনের বসন্ত-বর্ষায় হাটেমাঠে সেই গান গেয়ে ফিরেছি। এখন এই বয়সের বেসুরো গলায় আবার তা ফুটে উঠুক।

তাই গাইলাম। তবে বিরহের গান নয়,—মিলনের গান, পরিপূর্ণতার গান। 'তোমার অসীমে প্রাণমন লয়ে যতো দূরে আমি ধাই।'

তুম্‌হারে অসীমমেঁ প্রাণমন লে কর
জিতনী দূর মৈ যাউঁ,
কহীঁ দুখ কহীঁ মৃত্যু
কহীঁ বিচ্ছেদ না পাউঁ॥
মৃত্যু উয়হ লেবে মৃত্যুকা রূপ
দুখ হোয়ে হে দুঃখকা কূপ
তুম্‌সে জব মৈঁ হোকে বিমুখ
আপনী ঔর নিহারুঁ॥
হে পূর্ণ, তব চরণোঁ মেঁ
সব কুছ হ্যয় নির্ভরতা মেঁ,—
ডর তো কেবল মেরা মন মেঁ
অব নিশিদিন রোঁউ॥
অন্তরগ্লানি সংসারভার
পলক পড়তে হী কহাঁ একাকার
জীবনমেঁ যদি তেরা স্বরূপ
দেখনে হী ম্যয় পাউঁ॥

চিত্রার্পিতের মতো বসেছিলেন রোহিণীবাঈ। গানের শেষে চমক ভাঙল। মৃদু হাসি ফুটল মুখে। চেরিলের দিকে তাকিয়ে বললেন,

—এবার তুমি শোনাও বোন।

চেরিল যেন তৈরি হয়েই ছিল।

বললে,—গান শোনাতে তো পারব না। তার বদলে একটা গল্প শোনাব?

আমি চেরিলের দিকে আশ্চর্য হয়ে তাকালাম। রোহিণীবাঈ বললেন,—

গল্প? বেশ তো গল্পই শোনাও।

চেরিল গল্প শোনালো। তার ভাষার দুর্বলতা ভাবের মাধুর্যে ঢাকা পড়ে গেল। গঙ্গাযমুনার নটিনী রোহিণীবাঈএর আসরে বসে শোনালো আর এক নটিনীর কাহিনী।

কৃষ্ণপ্রিয়া কান্‌হোপাত্রার।

॥ ২৭ ॥

কয়েক বছর আগেকার কথা। সেবার ক-দিনের জন্যে আওরঙ্গাবাদে ঘাঁটি।

পুরোনো শহর হলে কী হয়,—তার ওপর আধুনিকতার ঝকঝকে পলস্তারা। জমজমাট শহর, বড়ো বড়ো হোটেল,—দেশবিদেশের অগুন্তি মানুষের জটলা। চকচকে রাস্তা,—তাতে টুরিস্ট বাস আর দামী মোটরের হরদম আনাগোনা। কাছাকাছি বিমানঘাঁটিও আছে,—কারণ এখান থেকে এলোরা আর অজন্তা দেখার সবচেয়ে সুবিধে। আর যেসব বিদেশী ভারতভ্রমণে আসে,—তাজমহলের পরেই তাদের আকর্ষণ এলোরার স্থাপত্য-ভাস্কর্য আর অজন্তার গুহা-চিত্রাবলী।

দুদিনের প্যাকেজ প্রোগ্রাম টুরিস্ট বাসের সহায়তায়। প্রথম দিন বাস নিয়ে যাবে আঠারো মাইল দূরে এলোরায়। যাওয়া-আসার পথে আরো অনেক কিছু দেখাবে,—যেমন ঘৃষ্ণেশ্বর, আওরংজেবের সমাধি, বিবিকা মকবরা, পানচাক্কি। দ্বিতীয় দিনটা পুরো কাটবে চৌষট্টি মাইল দূরের অজন্তায়।

অজন্তা থেকে অনেকেই আওরঙ্গাবাদে আর ফেরে না। জলগাঁও

স্টেশনে গিয়ে মেল লাইনের ট্রেন ধরে। যারা ফিরে আসে তারা শহর-বাজারে একটু ঘুরে নেয়, দরদস্তুর করে কিংখাব আর আওরঙ্গাবাদী শাড়ির। পরদিন প্যাসেঞ্জার ট্রেনে মনমদ পৌঁছে মেন লাইনে পাড়ি দেয়।

আমি ডবল দিনের টুর সেরে আওরঙ্গাবাদেই ফিরে এসেছিলাম। সন্ধ্যেবেলা হোটেলবাসী সহযাত্রীরা জিজ্ঞাসা করেছিল,—

আবার বাস-গুমটিতে ছুটছ কেন ভায়া?

ভোরবেলাকার পয়লা বাসের খোঁজ করতে।

আবার বাস? কোথায় যাবে?

যাব পৈঠানে।

পৈঠান? সে আবার কোথায়?

পৈঠানের নাম টুরিস্ট ম্যাপে নেই। সেখানে কেউ বেড়াতে যায় না। দেখার মতো কিছুই নেই সেখানে। আওরঙ্গাবাদ থেকে দক্ষিণে তিরিশ বত্রিশ মাইল রাস্তা ভেঙে নড়বড়ে প্রাইভেট বাস পৈঠানে যাওয়া আসা করে। সেই বাসে চেপে পরদিন ভোরবেলা একলা গিয়েছিলাম পৈঠানে।

ভারতের প্রথম সাম্রাজ্য মৌর্য সাম্রাজ্য। সমস্ত উত্তর ভারত আর চের-চোল-পাণ্ড্য-কলিঙ্গ বাদ দিয়ে সমস্ত দাক্ষিণাত্য যার অন্তর্ভুক্ত। উত্তর ভারতে মৌর্য গরিমা যখন লুপ্তপ্রায় তখন দক্ষিণে এক দ্রাবিড় শক্তির অভ্যুদয় হোলো। এই শক্তির নাম সাতবাহন। বেলারি অঞ্চলে রাজ্যসূচনা করে সাতবাহনরা উত্তর দিকে রাজ্যবিস্তার করেন। মহারাষ্ট্র জয় করার পর উত্তর ভারতের সুঙ্গদের তাঁরা মুখোমুখি হন।

সাতবাহন রাজাদের মধ্যে সবচেয়ে নাম গোতমীপুত্র সাতকর্ণীর। তিনি শক যবন পল্লব প্রমুখ বিদেশীদের দাক্ষিণাত্য থেকে তাড়িয়ে কন্নড থেকে মালব পর্যন্ত এক বিশাল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন।

পরবর্তী রাজা বশিষ্ঠীপুত্র পুলমায়ী নতুন রাজধানীর প্রতিষ্ঠা করেন গোদাবরীর তীরবর্তী প্রতিষ্ঠানে। যে নামের অপভ্রংশ পৈঠান।

সাতবাহনের পর দাক্ষিণাত্যে অনেক রাজবংশ গজিয়েছিল। অনেক রাজত্ব উঠেছিল পড়েছিল। ত্রৈকূটক, বাকাটক, চালুক্য, রাষ্ট্রকূট, যাদব। কিন্তু আর কেউ পৈঠানে রাজধানী স্থাপন করেনি। যাদব যুগে পৈঠান অবশ্য হিন্দু গরিমার আর ব্রাহ্মণ্য ধর্মের উজ্জ্বল কেন্দ্র। কিন্তু বর্তমান কালের পৈঠানে কিছুই নেই দেখবার। এক হতশ্রী জীর্ণত্যক্ত জনপদ। ধূলোভর্তি রাস্তা, নোংরা দোকান-বাজার, ভাঙাচোরা বাড়িঘর। গোদাবরীর চওড়া ঘাটের চাঙড় খসে পড়া ধাপ। নদীর ধারে প্রাচীনকালের বিশাল বিশাল পাথুরে বাড়ির স্তূপ। তার ভগ্ন কোটরে কোটরে বেওয়ারিশ মানুষদের জটলা।

যা আছে দেশপাণ্ডেজী ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখিয়েছিলেন। গোদাবরীর তীরে একটি পাথরের স্তম্ভ,—যাকে সাতবাহনদের বিজয়স্তম্ভ বলা হয়। আর নাগঘাট। এই ঘাটের সামনে পণ্ডিতসভায় দাঁড়িয়ে জ্ঞানেশ্বর মহিষকে দিয়ে বেদ পড়িয়েছিলেন। সেই অলৌকিক ঘটনার স্মরণে ঘাটের সিঁড়ির পাশে পাথরের এক মহিষমূর্তি।

বিশেষ যত্নের সঙ্গে দেশপাণ্ডেজী আমাকে দেখিয়েছিলেন একনাথ স্মৃতিমন্দির। এইখানেই ছিল একনাথজীর গৃহ,—এখানেই তাঁর সমাধি। এখানেই তাঁর বংশধররা এখনো বসবাস করেন। একনাথজীর সমাধিতে মাথা ঠেকিয়েছিলাম। সেই সমাধির পিছনে পাণ্ডুরঙ্গ বিট্‌ঠলমূর্তি প্রথম দেখেছিলাম। সেই মূর্তির বৈশিষ্ট্য তখন অনুধাবন করতে পারিনি। একনাথের মাহাত্ম্য বোঝবার মতো করে বুঝিনি।

এবার পান্ধারপুরে এসে আবার দেখা হোলো দেশপাণ্ডেজীর সঙ্গে। একনাথের মাহাত্ম্য ভালো হৃদয়ঙ্গম করলাম। পৈঠান থেকে গোদাবরী নদী অতিক্রম করে সোজা দক্ষিণাভিমুখী যাত্রা করে যে বারকরীর দল পান্ধারপুরে পৌঁছেছে, দেশপাণ্ডেজী সেই দলের মুখ্য

সদস্য। ভক্ত ভানুদাসের কাহিনী তিনি শুনিয়েছেন। সেই ভানুদাসের প্রপৌত্র সন্ত একনাথ।

ষোড়শ শতাব্দীর ঘটনা। মহারাষ্ট্র তেমনই অন্ধকার। পাঁচ সুলতানের আমল,—আহমদনগরে নিজামশাহী, বিজাপুরে আদিলশাহী, বেরারে ইমাদশাহী, গোলকুণ্ডায় কুতবশাহী আর বিদরে বারিদশাহী সুলতানদের রাজত্ব। বাহমনি সাম্রাজ্যকে টুকরো টুকরো করে এই রাজ্যগুলির উদ্ভব,—একে অপরের সঙ্গে হানাহানি মারামারি করাই নিত্য কর্তব্য! একটি বিষয়ে কেবল মিল,—প্রতিবেশী হিন্দু রাজ্য বিজয়নগরের সঙ্গে শত্রুতায়।

রাজায় রাজায় এই হানাহানিতে সাধারণ প্রজার প্রাণ যায়। কিন্তু উচ্চকোটি প্রজার এতে পরম সুযোগ। এরাই প্রজাসমাজের মাথা, এদের হাতে রাখলে সাধারণ প্রজাকে ধমকে-ধামকে ঠাণ্ডা রাখা যায়। রাজ্যের আভ্যন্তরিক শাসনের এরাই কড়া পাহারা। হিন্দু অভিজাতদের দলে টানল পাঠান সুলতানরা। তাদের জমিদারী জায়গীরদারী হোলো,—অনেকে হোলো পদস্থ রাজকর্মচারী। কোন্ সুলতানের সেবায় আত্মদান করবে, কোন্ সুলতানের নেকনজরে সম্পদে সম্মানে ফুলবে ফাঁপবে,—এই হোলো হিন্দু রাজপুরুষ আর জায়গীরদারদের লক্ষ্য,—আর এই নিয়ে নিজেদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা।

এই উচ্চকোটি হিন্দু সমাজের শিরোমণি ব্রাহ্মণরা। একদিকে তারা বিধর্মী শাসকদের কাছে আত্মবিক্রয়ের জন্যে লোলুপ, অন্যদিকে জাত্যাভিমানের দম্ভে সাধারণ প্রজার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন। জাতিবর্ণ নিয়ে দম্ভ, পদবী নিয়ে দম্ভ, পৈতে নিয়ে ছুৎমার্গ নিয়ে দম্ভ, সাধারণের দুর্বোধ্য সংস্কৃত ভাষায় মন্ত্র আওড়াবার কুশলতা নিয়ে দম্ভ। এই দম্ভের রাজধানী হৃতগৌরব পৈঠান।

পৈঠানবাসী ভানুদাস বিট্‌ঠলবিগ্রহকে বিজয়নগর থেকে পান্ধারপুরে ফিরিয়ে এনেছিলেন। বারকরী যাত্রার বিশীর্ণ স্রোতে নতুন করে

প্রাণসঞ্চার করেছিলেন। প্রপিতামহ ভানুদাসের বিট্‌ঠলভক্তি একনাথের অন্তরবাসী। কিন্তু তাঁর কৈশোরকালেই পাঁচ সুলতান এক-জোট হয়ে বিজয়নগরের পতন ঘটিয়েছে। বিট্‌ঠলভক্তিকে সমর্থন করার মতো আর কোনো সমর্থ রাজশক্তি সারা দাক্ষিণাত্যে নেই।

বিজয়নগরের পতনের পর সুলতানদের মধ্যে হানাহানি আরো বাড়ল। পান্ধারপুর অঞ্চলে মুখোমুখি হোলো বিজাপুর আর আহমদনগর। দুই রাজ্যের মাঝখানে ভীমা নদী,—নদীর এপারে ওপারে লড়াই। পান্ধারপুর একবার লুট করছে বিজাপুরের সৈন্য আর একবার ছারখার করছে আহমদনগরের বাহিনী। হিন্দু শ্রেষ্ঠী আর রাজপুরুষরা হয় সক্রিয় হয়ে এপক্ষ ওপক্ষকে মদত দিচ্ছে—না হয় চোখ বুঁজে নিরপেক্ষ হয়ে বসে থাকছে। স্বাধীনতাহারা স্বাজাত্য-বোধহারা হিন্দু মুসলমান সাধারণ মানুষ উভয় কর্তার হাতে মুখ বুঁজে শুধু মার খাচ্ছে। অন্ধকারে পড়ে আছে বিট্‌ঠলমন্দির।

পৈঠান থেকে বারকরীরা এসেছে,—আমাদেরই মতো দিণ্ডীতে দিণ্ডীতে ভাগ হয়ে। একনাথ রচিত অভঙ্গ গান গাইতে গাইতে, একনাথজীর পাদুকা বহন করে নাচতে নাচতে। আর আমরা যেমন মাথায় করে এনেছি গীতা জ্ঞানেশ্বরী, তেমনি তারা এনেছে একনাথী ভাগবত।

পূর্ণচৈতন্যজী যেমন আশ্রয় নিয়েছেন জ্ঞানেশ্বর মঠে, দেশপাণ্ডেজী তেমনি উঠেছেন তনপুরে মহারাজের মঠে। সেখানে অহোরাত্র সন্ত-কথা আর অভঙ্গ গান চলেছে। দেশপাণ্ডেজীর কাছে আমরা গিয়েছি, তাঁদের উৎসবে যোগ দিয়েছি আর সন্ত একনাথের জীবনী স্মরণ করেছি।

একনাথের জন্ম আনুমানিক ১৫৩৩ খৃষ্টাব্দে,—পৈঠানের এক সম্পন্ন আর সম্মানী ব্রাহ্মণ বংশে। শৈশবেই মাতাপিতৃহীন, পিতামহ আর পিতামহীর কোলে মানুষ। শিশুকাল থেকেই ধর্মের প্রতি আকর্ষণ,—সঙ্গীসাথী নিয়ে খেলাধূলার বদলে নিবিষ্ট হয়ে দেবপূজা

আর আপন মনে ধ্যান। মাত্র বারো বছর বয়সে বাড়ি থেকে পালালেন। কোথায় যাবেন? গুরুর সন্ধানে। গুরুই দেখাবেন জীবনের পথ,—গুরু ছাড়া গতি নেই।

আশ্চর্য গুরু পেলেন একনাথ,—জনার্দন স্বামী। পাঠান সুলতানের অধীনে মস্ত চাকরি করেন,—দৌলতাবাদের শাসনকর্তা। কিন্তু যেমনি জ্ঞানী বলে নাম,—তেমনি সাধক বলে খ্যাতি। একদিকে জবরদস্ত রাজকর্মচারী, অন্যদিকে বিদ্যার পাহাড়। অথচ মনের মধ্যে ঈশ্বরভক্তির পুণ্য প্রবাহধারা। জ্ঞান কর্ম আর ভক্তির ত্রিবেণীসংগম।

ছ-বছর গুরুগৃহে থেকে গুরুসেবা করলেন একনাথ। সংসারবুদ্ধিতে পাকা হলেন, সর্বশাস্ত্রে পণ্ডিত হলেন,—এদিকে অন্তর পরিপূর্ণ হোলো ঈশ্বরানুভূতিতে। তারপর গুরু বললেন,—যা পাবার সব তুমি পেয়েছ,—এবার সুদীর্ঘ তীর্থপরিক্রমা করে এস। তারপর সংসারাশ্রমে প্রবেশ করো।

তাই করলেন একনাথ। তীর্থের শেষে পিতৃভূমি পৈঠানে গেলেন। বিবাহ করে সংসারী হলেন।

সংসার কি সাধনা নয়? সংসারাবদ্ধ মানুষ কি সাধনপথ খুঁজে পায় না? জ্ঞানদেব ছিলেন সংসারসম্পর্কহীন সন্ন্যাসী। সংসারে বাস করেও নামদেব ছিলেন সংসার-অনভিজ্ঞ উদাসীন। সংসারাবদ্ধ সাধারণ মানুষের নেতা ছিলেন একনাথ।

সংসারের পথ সন্ন্যাসীর মতো সহজ পথ নয়,—এ পথ আরো বন্ধুর। এ পথের পায়ে পায়ে রিপুর কাঁটা। প্রলোভনের মরীচিকা। সংসার-সাধন সহজ সাধন নয়। সংসারব্রত নিষ্ঠার ব্রত, নিয়মানুবর্তিতার ব্রত, প্রতি দিনের প্রতি ক্ষণের আত্মবিশ্লেষণ আর আত্মসংশোধনের ব্রত। সারা জীবন সেই ব্রত পালন করে মহত্বের সাধনায় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন আদর্শ গৃহী-সাধক একনাথ। জীবনের প্রতিটি দিন তিনি ঈশ্বরনির্দিষ্ট সাধনায় ব্যয় করেছিলেন। তাঁর সাধনা ছিল জ্ঞানার্জন, জ্ঞান বিতরণ, সাহিত্য রচনা, আরাধনা, ধ্যান

ও মঙ্গলকর্ম। তিনি ছিলেন একাধারে পণ্ডিত ও কবি, ভক্ত ও সমাজ-সংস্কারক।

জ্ঞানেশ্বরের অমর কীর্তি একনাথকে মারাঠী ভাষায় ধর্মসাহিত্য রচনায় অনুপ্রাণিত করে। একনাথ ছিলেন সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত,—সর্বশাস্ত্রপারঙ্গম। সংস্কৃত ভাষা মুষ্টিমেয় উচ্চকোটির ভাষা। জ্ঞানেশ্বরেরই মতো একনাথ বুঝেছিলেন এই ভাষার পল্বলেই সমাজ ডুবে আছে। এই ভাষার অর্গলই সাধারণ মানুষকে হেয় করে রেখেছে, চেতনার অধিকার থেকে সাধারণ মানুষকে বঞ্চিত করে রেখেছে। তাই একনাথ ঘোষণা করলেন,—

দেবতা বানালো দেবভাষা সংস্কৃত,—
আর প্রাকৃত বানালো চোরে,—
এ কথাটা কে বলেছে তোরে? .
ভগবানের নাম
যে ভাষাতেই করিস রে তুই
প্রেমে সিদ্ধকাম।
ঠাকুর শোনেন প্রাণের ভাষা,—
তাঁর চরণে কান্নাহাসা
যে ভাষাতেই করিস রে তুই দান,—
সকল ভাষাই তাঁর কাছে সমান।
ভাষা নিয়ে তুচ্ছ বড়াই
মিথ্যে অভিমান॥

জ্ঞানেশ্বরের মারাঠী ভাষা খুব সহজবোধ্য ছিল না,—তাঁর ভাবও ছিল খুব কঠিন। একনাথ কথ্য মারাঠী ভাষাকে আপন করে নিলেন। জ্ঞানেশ্বরের শব্দালঙ্কারকে তিনি অত্যন্ত সরলভাবে প্রয়োগ করলেন। সাধারণ মানুষের প্রাণে ঝংকার তোলে এমনি সহজ সুর ফোটালেন তাঁর উপমায়।

একনাথের সাহিত্য বিপুল। শ্রীমদ্‌ভাগবতের কটি শ্লোকের ব্যাখ্যা করে তিনি প্রথম রচনা করেন চতুঃশ্লোকী ভাগবত। শংকরাচার্যের হস্তামলক গ্রন্থও তিনি সরল মারাঠীতে অনুবাদ করেন। শুকাষ্টক, আনন্দলহরী, চিরঞ্জীবপদ তাঁর আরো কয়েকটি রচনা। কথাকাব্য রুক্মিণী-স্বয়ংবর তাঁর একটি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ। পৌরাণিক উপাখ্যান ও সন্তজীবনীও তিনি সরল মারাঠী ভাষায় লিখেছেন। রামায়ণ মহাকাব্যের অনুসরণে তাঁর গ্রন্থের নাম ভাবার্থ-রামায়ণ। সুললিত ও সরল ভাষায় সহস্রাধিক অভঙ্গ গানের তিনি রচয়িতা।

যে রচনার জন্যে একনাথ নিত্যস্মরণীয়, তা তাঁর ভাগবত। শ্রীমদ্‌ভাগবতের একাদশ স্কন্ধের সটীক অনুবাদ। একনাথী ভাগবত বারকরীদের পরম পূজনীয়।

গুরুভক্তির শ্রেষ্ঠ নিদর্শন একনাথের রচনায়। যেমন জ্ঞানেশ্বরের গুরু নিবৃত্তিনাথ, তেমনি একনাথের গুরু জনার্দন স্বামী। জ্ঞানেশ্বরের মতো একনাথও বলেছেন,—আমার প্রতিটি বাক্য গুরুর বাক্য, আমার প্রতিটি কর্মে গুরুনির্দেশ। আমি অন্ধ অবোধ,—গুরুই আমার দৃষ্টি, গুরুই আমার জ্ঞান। প্রতিটি অভঙ্গে তিনি গুরুনাম স্মরণ করেছেন।

একনাথ যুগপ্রবর্তক। তিনি নতুন যুগের সূচনা করেন। মহারাষ্ট্রের আত্মবিস্মৃত হিন্দু সমাজের বুকে তিনি নতুন আলো জ্বালেন। জ্ঞানের আলো, ঐক্যের আলো, জাতীয়তাবোধের আলো। বিট্‌ঠলের আরতি-প্রদীপের আলো।

জ্ঞানেশ্বর ছিলেন জাতিচ্যুত ব্রাহ্মণ। নামদেব ছিলেন তাঁতী,—আর অন্য সব ভক্ত-সাধকরা ছিলেন তাঁর চেয়েও নীচ বংশজাত। একনাথ ছিলেন উচ্চকূলের প্রতিভূ,—নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ। বিট্‌ঠলচরণে ব্রাহ্মণত্বের সব অহমিকা তিনি সমর্পণ করেছিলেন। বিট্‌ঠলভক্তির লোকায়ত ধারায় স্নান করে তিনি পবিত্র হয়েছিলেন। যুগের মূক বাণীকে তিনি তাঁর জীবনের মধ্য দিয়ে জাগ্রত করেছিলেন।

পিতৃশ্রাদ্ধ করছেন একনাথ। স্বজাতি স্বগোষ্ঠীর সমাজপতিদের নিমন্ত্রণ করেছেন স্বগৃহে। শ্রাদ্ধানুষ্ঠান শেষ হোলো, এবার ভূরিভোজনে তাঁরা পরিতুষ্ট হবেন। একদল দরিদ্র হরিজন দরজার সামনে ভিড় করে দাঁড়াল। নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণদের আগে একনাথ এই দীনদুঃখী হীন জনদের পেট ভরে খাওয়ালেন। বললেন,—এরা তৃপ্ত হলেই আমার পূর্বপুরুষের আত্মা তৃপ্ত হবে।

আর একদিন এমনি আর এক ব্রত। সেদিনও ব্রাহ্মণ ভোজনের আয়োজন। ব্রাহ্মণরা দয়া করে উদরপূর্তি না করলে ব্রত সম্পূর্ণ হয় না। কোথা থেকে তিনজন মুসলমান ফকির এসে হাঁকডাক শুরু করল,—বাবা আমাদের বড়ো খিদে। এতো কাণ্ড হচ্ছে তোমার বাড়িতে—আমাদের কিছু জুটবে না?

জুটবে না? বলো কী? তোমরা আমার অনিমন্ত্রিত অতিথি, ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর! আপনি এসে আমার ঘরে পা দিয়ে আমাকে ধন্য করেছ!

নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণদের সামনে একনাথ সেই বিধর্মী ফকিরদের আদর করে বসালেন,—পা ধুইয়ে দিলেন নিজের হাতে। নিজের হাতে তাদের খাদ্য পরিবেশন করে কৃতার্থ হলেন।

একনাথ চলেছেন তীর্থযাত্রায়। দলেবলে চলেছেন। সকল যাত্রীর হাতে ঘটিভর্তি জল। গঙ্গার জল নিয়ে চলেছেন তীর্থক্ষেত্রে শিবের মাথায় দেবার জন্যে। পথে শুষ্ক মরু। একটা অবোলা জন্তু তৃষ্ণায় ছটফট করছে। একনাথ তাঁর ঘটির জল আর্ত জন্তুর মুখে ঢেলে দিলেন। দেবেন বৈকি,—জীবই যে শিব, জীবের সেবাই যে ভগবানের আরাধনা!

এতো গেল একদিক। অন্ত্যজ বিধর্মী আর অমানুষের সেবা,—অপাত্রে দানের অপবিত্রতা। আর অপাত্র যদি তোমার দিকে সেবার হাত বাড়ায়? সে সেবা কি তুমি নেবে? তার ছোঁওয়া কি তোমাকে আরো অপবিত্র করবে না?

রণ্যা মহার মড়া গোরুর সৎকার করে। ঘৃণ্য তার পেশা, থাকে শহরের প্রান্তে ঘৃণ্যতম অন্ত্যজদের পাড়ায়। তাহলে কী হয়, পরম ভক্ত সে। ভগবানের নির্গুণ রূপ সে ধ্যান করে। মন্দিরে ঢুকে তাঁর সগুণ মূর্তি দেখার অধিকার নেই,—সেই তার একটিমাত্র দুঃখ। ফুলনৈবেদ্য সাজিয়ে দেববিগ্রহের সামনে নিবেদন করবে, জীবনে এমন একটি দিন তার আসবে না।

রণ্যার বউ বললে,—

অতো খেদ কিসের? দেবতার ঘরে ঢুকতে না পাও তাতে কী? একদিন দেবতাকে ডেকে নিয়ে এসো আমাদের ঘরে।

বউএর কথাটা মনে লাগল,—তাই করল রণ্যা। ভোরবেলা গোদাবরীতে স্নান করেছেন একনাথ। ঘাটে বসে জপ করছেন নিবিষ্ট মনে। প্রভাত-সূর্যের আলো বাঁচিয়ে রণ্যা একপাশে গিয়ে দাঁড়াল,—অচ্ছুতের ছায়া যেন গায়ে না পড়ে। এক মুহূর্ত ভাবল, তারপর হাতজোড় করে বললে,—

ঠাকুর, ওঠো, আমার ঘরে চলো।

তোর ঘরে যাব? কেন রে রণ্যা?

তুমি তো সকলের ঠাকুর, সর্বভূতে আছ,—যাবে না কেন? আমার বউ মালা গাঁথছে, চন্দন বাটছে, ভোগ রান্না করছে। চলো ঠাকুর, আমরা তোমার পুজো করব।

একনাথ গেলেন। রণ্যা তাঁকে পথ দেখিয়ে চলল।

এ পথে আর কেউ যায়নি সে যুগে,—ব্রাহ্মণত্বের গণ্ডি ছেড়ে অচ্ছুতের অঙ্গনে। যুগাবতার হয়ে একাই গিয়েছিলেন,—তাই তিনি একনাথ।

অদ্বৈতবাদী একনাথ,—ঈশ্বরের মতো একা। সেই একের সঙ্গে এক হয়ে মিলতে হবে। পার হতে হবে মায়ার সাগর। বেদ বলো, পুরাণ বলো, ধর্মের সংস্কার বলো, সমাজের বিধান বলো,—সবই মায়া। সেই মায়াসাগরে একমুখী একটি স্রোত নিভৃতে বয়ে যাচ্ছে,

—ভক্তির স্রোত প্রেমের স্রোত। সেই স্রোত জীবনতরীকে নিয়ে যাবে একের তীরে, একের অনির্বচনীয় সান্নিধ্যে।

সংসারী একনাথ মায়াকে অস্বীকার করেননি,—মায়ার সাগর উত্তরণ করেছিলেন। অনাসক্ত কর্ম তাঁর জীবনতরীর কঠোর হাল, নিষ্কাম প্রেম তার উড্ডীন পাল। সেই তরণী পৌঁছবে কার পায়ে? অদ্বৈত-অভেদ পরমাত্মার পায়ে। কেমন করে তাঁকে চিনব? ঐ সগুণ-স্বরূপ বিট্‌ঠলকে চিনে রাখো,—ভুল হবে না।

তাই একনাথ ছিলেন বারকরী। পরম বারকরী নামদেব বলেছেন, —জীবনবৃক্ষের মূল হোলো ভক্তি, ফুল বৈরাগ্য আর ফল হোলো জ্ঞান। ভক্তিরসে মূল যদি না ভেজে, তাহলে বৈরাগ্যফুল ফুটবে কী করে, কেমন করে ফলবে জ্ঞানফল? তাই একনাথ পরম ভক্ত,— বিট্‌ঠলপদে নিবেদিত।

নির্দিষ্ট তিথিতে বার বার তিনি যান গোদাবরী থেকে ভীমা নদীর তীরে, পৈঠান থেকে পান্ধারপুরে। দুই সুলতানের লড়াইএর পথ মাড়িয়ে,—এক সুলতান থেকে আর এক সুলতানের রাজত্বে।

কী দীনবেশ প্রভুর! কোথায় উৎসব, কোথায় বৈভব? রাজায় রাজায় লড়াই,—অন্ধকার মন্দির। পূজারীরা ভয়ে ভয়ে কাঁপে,— কোনো রকমে নিত্য পূজা করে। যুদ্ধের দামামা যখন মঙ্গলবাদ্যকে ছাপিয়ে যায়,—তখন মন্দির থেকে বিগ্রহকে তুলে নিয়ে ঘরের মধ্যে লুকিয়ে রাখে। আবার মন্দিরে এনে বসায়। মুষ্টিমেয় ভক্ত চোরের মতো আসে, চোরের মতো যায়।

বিট্‌ঠল-ভগবানের মুখের দিকে নির্নিমেষ চোখে তাকিয়ে একনাথ বলেন,—প্রভু, তুমি চোখ খুলে রাখো। তোমার প্রেমই জাতির সঞ্জীবনী। তুমিই জাতির প্রাণ, আপামর জনসাধারণের হৃদয়রতন। এই সাধারণের মন থেকে তুমি মুছে যেয়ো না।

দিনান্তে ম্লান গর্ভগৃহে বসে একনাথ প্রভুর সংগীতারতি করেন,—

কী মন্তরে করব আমি বিঠল আরাধন—
সহস্রদীপ আরতিতে মূর্ত হন না তিনি,
পান্ধারীনাথ হৃদয়মাঝে থাকেন যে গোপন,
প্রাণ-প্রদীপের উজল আলোয় কেবল তাঁরে চিনি।

ভাষায় প্রকাশ করতে নারি তাঁহার মহিমায়,—
চতুর্বেদের সিংহাসনে আসীন তিনি নন,—
ভক্তিপ্রেমের বাঞ্ছা মানি আপন ইচ্ছায়
রূপ নিয়েছেন কোল দিয়েছেন অরূপ নারায়ণ।

জ্ঞানের খনি তুমি প্রভু প্রেমের শতদল,
অনির্বচনীয় তোমার নির্গুণ উদ্‌ভাস,—
ভক্তচোখে করবে বিরাজ ঘুচিয়ে সকল ছল,
সগুণ রূপে তাই তো তোমার বিট্‌ঠল প্রকাশ।

কে বলেছে দাঁড়িয়ে আছ কঠিন বিটের পরে।
নিত্য তোমার চরণ রাজে একারই অন্তরে॥

॥ ২৮ ॥

মহাদ্বার ঘাটের এক কোণে দাঁড়িয়ে নিশানের মতো উত্তরীয় নাড়লেন দেশপাণ্ডেজী,—ওহে বাঙালী ভাই, এসো, এসো। এই যে আমি।

বাঙালী ভাই একলা নয়,—সঙ্গে আরো কজন। কানহাইয়ালাল আছে,—একসাথে যার সঙ্গে রাত্রিবাস। জ্ঞানেশ্বর মঠ থেকে ডেকে নিয়েছি চেরিল আর নাথুরামকে। বিট্‌ঠলমন্দিরের পেছন দিকে এক গুজরাটি যাত্রীনিবাসে উঠেছেন গোখলেজী। তিনিও জুটেছেন সঙ্গে।

এরা সব কারা বাঙালী ভাই?

পথের বন্ধু,—আমরা সবাই একসঙ্গে আলন্দী থেকে এসেছি।

এই মেমসায়েবও?

হ্যাঁ, এই মেমসায়েবও।

চেরিলকে সামনে এগিয়ে দিলাম। কানহাইয়ালালকে আগেই তিনি দেখেছেন,—পরিচয় করিয়ে দিলাম গোখলেজী আর নাথুরামের সঙ্গে। আর দেশপাণ্ডেজীর পরিচয়ে শুধু বললাম,—

ইনি আমাদের গাইড। সব কিছু আমাদের ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখাবেন,—কথা দিয়েছেন।

দেশপাণ্ডেজী হাসলেন।

বেশ তো, চলো এগোই। দেখো, ভিড়ে কেউ হারিয়ে যেয়ো না যেন।

হারিয়ে যাওয়া অস্বাভাবিক নয়। যেদিকে তাকাও, যেদিকে যাও দারুণ ভিড়। কালকের মতো ভিড় নয়, আজকের ভিড় অন্য রকম। কাল সারা শহরের জনপ্রবাহ ছিল একমুখী,—নদী থেকে মহাদ্বার ঘাট,—সেখান থেকে বিট্‌ঠলমন্দিরের দিকে। সকলের মনে একই বাঞ্ছা,—ভীমাস্নান আর বিট্‌ঠলদর্শন। আজকের ভিড় এলোমেলো,—এদিকে ওদিকে, এ রাস্তায় ও রাস্তায়।

বারকরীদের ভাঙা হাট। ব্রত সম্পূর্ণ হয়েছে,—আর কালক্ষেপণে কাজ কী? পান্ধারপুর বারকরীরা অনেক দেখেছে,—অনেকবার দেখবে আবার। নতুন করে দেখবার কিছু নেই তাদের। আমরা কেউ বারকরী নই। নাথুরামেরও এই প্রথম ব্রত। পান্ধারপুর দর্শন এই আমাদের প্রথম,—হয়তো শেষ। নাথুরাম ছাড়া এখানে আর কেউ আমরা আসব না। তাই দেশপাণ্ডেজীকে জপিয়েছি। পান্ধারপুর তাঁর নখদর্পণে।

নদীর দিকে আমরা চললাম। সামনে নদীতীরের মন্দিরগুলি। সূর্য-জ্বলজ্বলে চূড়া। দেশপাণ্ডেজী বল্লেন,—কেবল মঠ আর

মন্দির,—এছাড়া আর কিছু দেখবার নেই এখানে। মেমসায়েবের ভালো লাগবে?

আমি বললাম,—লাগবে বৈকি? ও তো মন্দির দেখতেই এসেছে! তবে সব কিছু ভালো করে বুঝিয়ে দেবেন। ফাঁকি দেবেন না।

বটে? এমন কথা? পৈঠানে তোমাকে ফাঁকি দিয়েছিলাম?

সামনেই পুণ্ডলিকের মন্দির। এই মন্দিরে বসেই দেশপাণ্ডেজীর কাছে পুণ্ডলিক-মাহাত্ম্য শুনেছিলাম কাল। আজ মন্দিরদ্বারে বৈকুণ্ঠজী নেই। অন্য পুরোহিত আছেন। সকলে মিলে মন্দিরে ঢুকলাম। সমাধির ওপর একটি লিঙ্গরূপী স্তম্ভ,—তার মাথায় পেতলে তৈরি পুণ্ডলিকের মুখ। নদীতীরে এইখানেই নাকি পুণ্ডলিকের কুটীর ছিল। এইখানেই দাঁড়িয়েছিলেন বিট্‌ঠলপ্রভু। সেই মহান্ আবির্ভাবকে স্মরণে রাখার জন্যে এইখানে প্রথম মন্দির নির্মাণ করেছিলেন যোগী চাঙ্গদেব। সেই প্রাচীন মন্দিরের ভিত্তির ওপরেই এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠা। পুণ্ডলিকমন্দিরের পাশে আরো দুটি মন্দির। একটি পুণ্ডলিকের পিতার সমাধি, আর একটি ভক্ত ভানুদাসের স্মৃতি।

পান্ধারপুরের পল্লীপথ পাথর-বাঁধানো। সরু সরু আঁকাবাঁকা। ঘাটগুলিও পাথর-বাঁধানো। ঘাটের ধারে ধারে মন্দির। হরিদাস ঘাটের ওপর দত্তাত্রেয় মন্দির। মহাদ্বার ঘাট দিয়ে উঠেই রামচন্দ্র আর মুরলীধর মন্দির। কাসার ঘাট ছাড়িয়ে তুকারাম স্মৃতিমন্দির। কুম্ভার ঘাট থেকে ক-পা এগিয়ে অমৃতেশ্বর মন্দির।

শহরের মধ্যে বিট্‌ঠলমন্দিরকে কেন্দ্র করে মল্লিকার্জুন আর শাকম্ভরী মন্দির, ত্র্যম্বকেশ্বর আর বেণুগোপাল মন্দির। তাছাড়া আরো কয়েকটি বড়ো বড়ো মন্দির নগর-পরিক্রমার পথে,—যেমন তাকপিঠা বিটোবা, তেত্রিশ-কোটি, বেলিচা মহাদেব মন্দির।

মন্দিরের পর মন্দির,—কোনোটি বড়ো, কোনোটি ছোট,—কোনোটিতে দারুণ ভিড়, কোনোটি অপেক্ষাকৃত জনবিরল। কারুর সামনে দোকানপাট, কোনো মন্দির মুক্তাঙ্গন।

মনে রাখবার মতো পাণ্ডা-পুরোহিতদের ব্যবহার। তারা ভদ্র, — কথাবার্তায় তারা বিনয়ী, মার্জিত তাদের আচরণ। আমরা বহিরাগত, —অন্য ভাষা আমাদের। তা জেনেও কেউ আমাদের ওপর নিগ্রহ করেনি, চেরিলকে বিদেশী ভেবে বর্জন করেনি। দক্ষিণার জন্য লুব্ধ হাতও তারা বাড়ায়নি। বোঝা যায় তাদের আত্মাদর আছে,—সংযত গাম্ভীর্য আছে। দেবার্চনা আর পুজার্থীদের সাহায্য করা এখানকার পূজারীদের পুরুষানুক্রমিক পেশা। এই পেশাই এখানকার শ্রেষ্ঠ।

পাথুরে পথ আর পাথুরে মন্দিরের হাঁফধরা ভিড় কাটিয়ে আমরা দক্ষিণ দিকে বেঁকেছি। মোড় নিয়েছি ডানহাতি। এ রাস্তাটা বেশ চওড়া,—অনেকটা সোজা গিয়ে স্টেশনের রাস্তায় মিশেছে। সে রাস্তায় পালাই পালাই রব। স্টেশন যাবার মোড় ছাড়িয়ে সোজা রাস্তা শহর ঘুরে আবার নদীতীরের দিকে চলেছে,—শেষ হয়েছে উদ্ধবঘাটে এসে।

ওদিকটা পুরোনো,—এদিকে নতুন বসাত ছড়াচ্ছে, আধুনিক প্যাটার্নের বাড়ি উঠছে,—লোহা-সিমেন্টে তৈরি। ব্যাংক, সরকারী অফিস,—নতুন নতুন অট্টালিকা। অনেক বাড়ির সামনে পাঁচিল ঘেরা ফাঁকা বাগান,—সামনে লোহার গেট। দেয়ালে আর গেটে চকচকে রঙ। নতুন কিছু চোখে পড়লেই পুরোনোর কথা মনে ভেসে ওঠে। তাই জিজ্ঞেস করলাম,—

এই পান্ধারপুর কতোদিনের দেশপাণ্ডেজী?

কতোদিনের কি ভায়া? অনাদি অনন্তকালের! ভগবান বিষ্ণু-অবতার হয়েছিলেন দ্বাপর যুগে, মনে নেই?

গোখলেজী ফস্ করে বললেন,—ঠিক ঐ পাণ্ডাদের মতোই আওড়ালেন—তাই না দেশপাণ্ডেজী?

আমি চমকে উঠলাম। রাগ করলেন নাকি দেশপাণ্ডেজী? শুধোলাম—পাণ্ডাদের মতো কেন?

যে কোনো তীর্থে যান,—আর একটা মন্দিরের দিকে তাকিয়ে

ঐ কথা জিজ্ঞাসা করুন। ঐ একই উত্তর শুনবেন—বহুত বহুত প্রাচীন,—কবেকার তা কেউ জানে না। আসলে এই পান্ধারপুরে প্রাচীন খুঁজতে যাবেন না। এখানে প্রাচীন কিছু নেই।

প্রাচীন নেই? বলেন কী?

আমি অবাক হলাম। গোখলেজী না হয় ইতিহাসেরই অধ্যাপক। তবু এমন বিজ্ঞস্বরে উল্‌টো কথা বলেন কী করে?

গোখলেজী আবার বললেন,—এ সব পেশোয়া যুগের। সে কি প্রাচীন যুগ? তার আগে যা ছিল তার কিছু নেই। সব ভেঙে চুরে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে!

ঠিকই বলেছেন, দেশপাণ্ডেজী সমর্থন করলেন,—তবে মানুষের হাতে, কালের হাতে নয়। এতো মন্দির, ঘাট, বড়ো বড়ো বাড়ি,—সব দুশো-আড়াইশো বছরের। এই ভিড় আর মেলা, বারকরীর এই বানডাকা গান,—পান্ধারীনাথের এই বৈভব,—তার আগে এ সব কিছুই ছিল না। স্বাধীন মারাঠা যুগে পান্ধারপুরের নবজন্ম,—বাজীরাও পেশোয়ার আমল থেকে। বিট্‌ঠলমন্দিরের ঐ যে ষোলোথাম্বা মণ্ডপ—পেশোয়ার উপহার। ঐ মণ্ডপে দাঁড়িয়ে তুকারাম গান করেননি।

তার চেয়ে পুরোনো দিনের কিছুই নেই?

আছে হয়তো। তবে প্রত্নতাত্ত্বিকরা ছাড়া তা নিয়ে কে মাথা ঘামায়? মন্দিরের গর্ভগৃহ আর অন্তরালের ভিত্তি নিশ্চয়ই আগেকার, কটা শিবমন্দিরের গায়েও সংস্কারের নিচে প্রাচীনতার চিহ্ন,—বাকি সবই নতুন।

নতুন!

হ্যাঁ, ঐ পাওয়ার-স্টেশনটার মতো নতুন নয়, তবে নতুন। নতুন হবে না? এই পুরোনো ভারতবর্ষে জাতীয়তাই তো সবচেয়ে নতুন জিনিস,—আর এই জিনিসের আবিষ্কার করেছে এই মারাঠারা।

ইতিহাসের অধ্যাপক গোখলেজী আবার শোনালেন,—সারা

মহারাষ্ট্রের মন্দিরে মন্দিরে পুরোনো পাথর খুঁজে কোনো লাভ নেই। পুরোনো পাথর সব মরা পাথর,—যেমন এলোরায়, এলিফ্যাণ্টায়। এদেশের জীবন্ত তীর্থগুলি প্রাচীন কিন্তু তীর্থমন্দির প্রাচীন নয়। সহ্যাদ্রি পাহাড়ের ত্র্যম্বকেশ্বর, ভীমশংকর, মহাবলেশ্বর তো আপনি দেখেছেন। তাছাড়া বড়ো বড়ো শক্তিতীর্থ,—কোল্‌হাপুরে মহালক্ষ্মী, পুণায় সাবিত্রী, তুলজাপুরে ভবানী,—তীর্থমাহাত্ম্য অনাদিকালের, কিন্তু মন্দির সব স্বাধীন মারাঠা যুগের।

চেরিল মুখ বুজে হাঁটছিল, হঠাৎ প্রশ্ন করল,—

কাশীর বিশ্বনাথের মন্দিরও তো মারাঠাদের,—তাই না?

গোখলেজী একটু হাসলেন। এদেশের সংস্কৃতি-ইতিহাস নিয়ে নানা কথা টুকরো প্রশ্ন তিনি চেরিলের মুখে শুনেছেন,—তাই চমকালেন না। বললেন,—

ঠিক বলেছ তুমি। ঐ মন্দির গড়েছেন হোলকার রাণী অহল্যাবাঈ। আগের মন্দির গুঁড়িয়েছিল আওরংজেবের হাতে।

আর উজ্জয়িনীর মহাকাল?

মহাকাল মন্দির গড়েছেন রণোজী সিন্ধিয়া আর তাঁর বংশধররা।

আমি অনেক নদীর ঘাটে ঘাটে ঘুরেছি। বারাণসীর জাহ্নবীঘাট, উজ্জয়িনীর শিপ্রাঘাট, মহেশ্বরের নর্মদাঘাট, ওয়াইএর কৃষ্ণাঘাট, নাসিকের গোদাবরীঘাট। এবার এসেছি পাণ্ধারপুরে,—ভীমা নদীর ঘাটে। বিশাল ঘাট সব, পাথরে বাঁধাই। চওড়া চওড়া সিঁড়ি। হাজার মানুষের ভিড়,—স্নান, পূজা, শ্রাদ্ধ, তর্পণ। দিনান্তে স্রোতে প্রদীপ ভাসিয়ে মনস্কামনা।

এই সব ঘাট বানিয়েছে কারা? মারাঠারা। এই সব ঘাটের ধারে ধারে অসংখ্য দেবমন্দির বানিয়েছে কারা? মারাঠারা। সারা দেশ জুড়ে নতুন নতুন মন্দির আর ঘাট বানিয়ে তারা তাদের নবলব্ধ স্বাধীন স্বাজাত্যবোধের চিহ্ন রেখে গেছে। একশো বছরের পরিধির মধ্যে ফুটিয়ে গেছে এমন নিদর্শন যা হাজার বছরেও ম্লান হবে না।

গল্প করতে করতে আমরা হাঁটছিলাম। স্টেশন রোডের মোড় ছাড়িয়ে গেলাম। পশ্চিম সীমানার রাস্তা। এ রাস্তায় বাড়িঘর ঘিঞ্জি হয়নি,—বেশ ফাঁকা। ভিড়ও অনেক কম।

গোখলেজী বলছিলেন মারাঠা যুগের জাতীয় জাগরণের কথা, হিন্দু জাতির পুনরুজ্জীবনের কথা। তিনি বলছিলেন,—

আমরা যখন ছাত্রদের ইতিহাস পড়াই, দেশের ইতিহাসকে মোটামুটি তিনটি ভাগে ভাগ করে নিই,—হিন্দু যুগ, মুসলিম যুগ আর বৃটিশ যুগ। এই তিন যুগের পরে হাল আমলের স্বাধীনতার যুগ। বলতে ভুলে যাই মোগল আর বৃটিশদের মাঝখানের একটা যুগের কথা,—মারাঠা যুগ,—একটা জাতির কথা,—মারাঠা জাতি। আমরা মনে রাখি না যে এ দেশকে জয় করতে সবচেয়ে মোক্ষম লড়াই ইংরেজদের করতে হয়েছিল মারাঠাদের সঙ্গে। কথায় কথায় আমরা বলি ইংরেজ আমাদের শেকলে বেঁধেছিল। ইংরেজকে হটিয়ে আমরা স্বাধীন হয়েছি। তার মানে ইংরেজ আসার আগে আমরা স্বাধীন ছিলাম? শুনতে ভালো, কিন্তু সত্যি কি তাই? তার আগে আমরা পরাধীন ছিলাম না? পরাধীন না থাকলে মন্দির ভাঙে? জিজিয়া কর দিতে হয়? মার খেয়ে খেয়ে মরীয়া হয়ে উঠতে হয়? তেমনি মরীয়া হয়ে উঠেছিল মারাঠারা। দিল্লীর সবচেয়ে জবরদস্ত বাদশা আলমগীর আওরংজেবের বিরুদ্ধে।

আমি বললাম,—

শুধু মারাঠা কেন? শিখদের রাজপুতদের কথা বলুন।

নিশ্চয়ই। তাদের কথাও বলতে হবে বৈকি। তবে শিখরা ছিল একটা সামরিক গোষ্ঠী, রাজপুতরা ছিল কয়েকটা রাজ-পরিবার,—আর মারাঠা ছিল একটা গোটা জাতি। জাতি বলেই পঁচিশ বছর ধরে সমানে লড়াই চালিয়েও আওরংজেব হার মেনেছিল তাদের কাছে। জাতি বলেই তারা সারা ভারত জুড়ে হিন্দু বাদশাহীর নিশান তুলতে পেরেছিল,—কৃষ্ণার তীর থেকে পঞ্চনদের তীর পর্যন্ত।

গোখলেজীর কথা নাথুরাম একেবারে গিলছিল। সে মারাঠা তরুণ,—নিজের জাতের কথা শুনতে কার না ভালো লাগে,—কার না বুক ফুলে উঠে? ধর্ম-ধর্ম করে ব্যাকুল নয় নাথুরাম,—সে নিজের দেশকে জানতে চায়, নিজের জাতকে বুঝতে চায়, তাই বারকরী হয়েছে। তার চোখদুটো জ্বলজ্বল করে উঠল। গরগরে গলায় সে বলে উঠল,—

আর সেই হিন্দু সাম্রাজ্যের প্রতিজ্ঞা বুকে নিয়েই পানিপথের যুদ্ধে একলা লড়তে হয়েছিল মারাঠাদের,—প্রাণ দিয়েছিল হাজার হাজার মারাঠা সৈন্য।

কোথা থেকে কী—কীসের থেকে কী কথা? বারকরীর পতাকা থেকে সেনাবাহিনীর নিশান, মন্দিরা থেকে রণদামামা, গান থেকে যুদ্ধনিনাদ।

আমি বললাম,—

কিন্তু এই পান্ধারপুর দেখে ও সব কিছু তো বোঝা যায় না গোখলেজী।

কী বোঝা যায় না?

মারাঠা জাতের শৌর্যবীর্যের কথা, লড়াইয়ের কথা, রাজ্যজয়ের কথা।

কেন বলুন তো?

এখানে তো শুধু প্রেম আর ভক্তি, পূজা আর গান।

ততোক্ষণে রাস্তা আবার বেঁকেছে। নদীতীরে উদ্ধবঘাটে গিয়ে সোজা মিশবে। আবার যথেষ্ট ভিড়। আবার ভক্তির হিল্লোল, গানের তান।

ভজনদাসের মঠের সামনে একদল যাত্রী মন্দিরা-মৃদঙ্গ বাজিয়ে ভজনের জোর রোল তুলেছে।

দেশপাণ্ডেজী চুপ করে গিয়েছিলেন। স্নিগ্ধ গলায় এবার বললেন,—

বুঝবে ভায়া বুঝবে,—তৃপ্তিনিলয় পান্ধারপুর ঘোচায় সকল ভ্রান্তি।

তাই নাকি? বোঝান তো শুনি!

আমি কেন বোঝাব? সামনে ঐ মন্দির দেখছ না? চূড়ায় ঐ মস্ত গেরুয়া নিশেন, দেয়ালে লাল রঙের হনুমান। ঐ মন্দিরে চলো। অনেক হাঁটা হয়েছে, একটু পা ছড়িয়ে বোসো। আস্তে আস্তে আপনিই সব বুঝবে।

মন্দিরে ঢুকলাম।

সমর্থ রামদাস প্রতিষ্ঠিত মারুতিমন্দির।

শিবাজীর গুরু রামদাস স্বামী।

॥ ২৯ ॥

শিবাজী এসেছেন সন্ত তুকারামের কাছে।

তুকারাম তখন বিট্‌ঠলের নামে মহারাষ্ট্রের সকল মানুষকে এক করছেন। আর একদিকে বিজাপুর আর অন্যদিকে মোগল শক্তির সঙ্গে মোকাবিলা করে স্বাধীন মারাঠা রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করছেন শিবাজী।

তুকার জন্যে শিবাজী এনেছেন বহুমূল্য উপহার। স্বর্ণমুদ্রা স্বর্ণ-অলঙ্কার। তুকা তা ছোঁননি, বলেছেন,—রাজা, শ্রেষ্ঠ ধনের কাঙাল আমি,—কী ধন তুমি আমাকে দেবে? এ সব তুমি বিলিয়ে দাও।

শিবাজী অধোমুখ হলেন।

প্রভু আমি দিতে আসিনি,—নিতে এসেছি।

নিতে এসেছ? আমার কাছ থেকে? ঈশ্বরপদে আমার সমস্ত প্রাণ আমি নিবেদন করেছি, আর জীবনের যা কিছু কৃত্য তা দিয়েছি সকল মানুষকে। তোমাকে আমার দেবার তো কিছু নেই!

শিবাজী বললেন,—আপনি আমাকে মন্ত্র দিন!

হাসলেন তুকারাম।

মন্ত্র আমার গাথায় আমার কীর্তনে। সেই মন্ত্র আমি ছড়িয়ে দিয়েছি সকল মানুষের প্রাণে প্রাণে। সেই মন্ত্রে সকল মানুষকে আমি বেঁধেছি। আমার মন্ত্র প্রেমের মন্ত্র,—সে মন্ত্র জাতির হৃদয়ে কান পেতে তুমি শুনতে পাবে।

পাব প্রভু?

নিশ্চয়ই পাবে। উচ্চনীচ ধনীদরিদ্র ছুত-অছুত—প্রেমের মন্ত্রে সমস্ত জাতিকে একসূত্রে আমি বেঁধেছি। এবার বীর্যমন্ত্রে জাতিকে তুমি উদ্বুদ্ধ করো।

সেই বীর্যমন্ত্র আপনার কাছে পাব না?

না। যাঁর কাছে পাবে তাঁর শরণ নাও।

কে তিনি?

তিনি রামদাস স্বামী।

মহারাষ্ট্র-নায়ক শিবাজীর কানে সন্ত তুকারাম শুনিয়েছিলেন একতার গান। গুরু রামদাস তার প্রাণে দিয়েছিলেন সংগ্রামের দুর্জয় মন্ত্র।

১৬০৮ সালে রামদাসের জন্ম। বাল্যকাল থেকে সংসার-উদাসীন। বারো বছর যখন বয়স,—বিবাহের ব্যবস্থা করলেন বাবা-মা। সাবধান, সাবধান! কানের কাছে কে সাবধান বলে চেঁচিয়ে উঠল। বিবাহ-সভা থেকে পালালেন রামদাস। বাড়ি ছেড়ে গ্রাম ছেড়ে সমাজ-সংসারের স্নেহমমতা কাটিয়ে কোথায় যে লুকোলেন কেউ খোঁজ পেল না।

গোদাবরীতীরে নাসিকের কাছে এক অজানা গ্রামে গিয়ে পৌঁছলেন। অদূরে ঘন অরণ্য। রামায়ণের পঞ্চবটী। এইখানে বনবাসী শ্রীরামচন্দ্র পর্ণকুঠী বেঁধে প্রিয়তমা সীতাকে নিয়ে বাস করতেন। এইখানে রাবণ কর্তৃক সীতাহরণ। এইখানে রাক্ষস তস্করের হাত থেকে সীতা-উদ্ধারের প্রতিজ্ঞা।

রামভাবনায় ভাবিত হলেন রামদাস। এই অরণ্যে বারো বছর ধরে রামতপস্যা করলেন। রাম শুধু সূর্যবংশোদ্ভূত ক্ষত্রিয়তনয় নন, রাজ্যহারা পত্নীহারা হতভাগ্য রাজপুত্র নন। তিনি বিষ্ণুর অবতার। রাবণরূপী অধর্মকে পরাস্ত করে পৃথিবীতে ধর্মরাজ্য স্থাপনের জন্যে তাঁর আবির্ভাব। কল্যাণরূপিনী সীতাকে তিনি উদ্ধার করেছিলেন। আর্যধর্মের বিস্তার করেছিলেন। শ্রীরামচন্দ্র যোদ্ধা, শ্রীরামচন্দ্র স্রষ্টা,—রামরাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। ধর্ম ন্যায় আর কল্যাণের মূর্ত প্রতীক,—নররূপী নারায়ণ।

তপস্যায় তুষ্ট হয় শ্রীরামচন্দ্র রামদাসের সামনে প্রকট হলেন। রামনির্দেশে অরণ্য ছেড়ে রামদাস ফিরে এলেন সংসারে।

যে রামরাজ্য শ্রীরামচন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সে রাজ্য কোথায়? কোথায় সেই আর্যগরিমা? অনার্য বিধর্মীর কবলে পড়ে আছে সেই দেশ, আত্মবিস্মৃত পরপদানত জাতি। রামরাজ্যের বিবর্ণ স্মৃতি লুকিয়ে আছে অবজ্ঞাত বিষণ্ণ কটি হিন্দু তীর্থে। তপস্যাব্রত শেষ করে পরিব্রাজকের ব্রত নিলেন রামদাস,—বারো বছর ধরে সারা ভারতে তীর্থপর্যটন করলেন।

ছত্রিশ বছর বয়সে তীর্থপরিক্রমা শেষ করে ফিরে এলেন রামদাস, —স্থিত হলেন কৃষ্ণানদীর তীরে চাফল গ্রামে। নদীগর্ভ থেকে রামমূর্তি লাভ করে এক মন্দির বানিয়ে করলেন ইষ্টদেবতার প্রতিষ্ঠা। শ্রীরামচন্দ্রের নাম তিনি প্রচার করতে লাগলেন আর স্বপ্ন দেখতে লাগলেন সেই সুদিনের যেদিন দেশের সুপ্ত মানুষ জাগবে, দেশের বুকে রামচন্দ্রের মতো একজন নেতার আবির্ভাব হবে। বন্দিনী সীতার শৃঙ্খলমোচনের মতো যে নেতা একদিন দেশকে স্বাধীন করবে।

১৬৪৯ সাল,—বর্ষাঋতু।

আষাঢ়ী যাত্রায় বারকরীরা চলেছে পান্ধারপুর। কৃষ্ণানদীর তীরে রামদাসের রামমন্দিরের সামনে তারা রাত্রিবাসের জন্যে জমেছে।

তোমরা কারা ?

আমরা বারকরী।

কোথায় চলেছ ?

চলেছি পান্ধারপুরে,—বিট্‌ঠলনাথের কাছে। তুমি যাবে আমাদের সঙ্গে ?

না, না,—আমি কেন যাব ? বিট্‌ঠল আমার কে ? আমার প্রভু রাম।

বারকরীরা গাইল,—

জয় জয় বিট্‌ঠল রামকৃষ্ণ হরি !

কী আশ্চর্য,—এরা বিট্‌ঠলনাম কৃষ্ণনাম হরিনামের সঙ্গে রামের নামও করে যে! সারারাত ধরে গান গাইল বারকরীরা,—সেই গানের অক্ষরে অক্ষরে রামদাস শুনলেন রামনাম। গানের ছন্দে ছন্দে জপ করলেন রামমন্ত্র।

পরদিন সকালে রামদাস বারকরীদের দলে ভিড়লেন। তাদের সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে পৌঁছলেন পান্ধারপুরে।

আষাঢ়ী একাদশীর মহোৎসব সারা মহারাষ্ট্র ঝেঁটিয়ে বারকরীরা এসেছে, তীর্থযাত্রীরা এসেছে। সব জাতের সকল মানুষ বিট্‌ঠল-নামে এক হয়েছে। আর তাদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে তুকারাম গাইছেন একতার গান।

প্রভু আমার মর্মে ছোঁয়াও
পরশমণি,—
তন্দ্রা ছুটুক শুনি তোমার
পায়ের ধ্বনি।
অপলকে তাকিয়ে তোমার
মুখের পানে
হৃদয় আমার ভরে উঠুক
তোমার গানে।

সেই গানেতে সকল মানুষ
পাগল হবে,—
তোমারি নাম সকল মানুষ
কণ্ঠে লবে।
তোমার নামে সকল মনের
মেশামিশি,—
তোমার প্রেমে আকুল সবাই
অহর্নিশি।
লক্ষ ঢেউএ সাগর যেমন
কল্লোলিনী,
লক্ষ গলায় বাজুক তোমার
জয়ধ্বনি।
সেই সাগরের পারে বসে
তুকা একা,—
লক্ষ চোখের আলোয় আবার
তোমায় দেখা॥

হাঁ করে দেখলেন রামদাস। উৎকর্ণ হয়ে শুনলেন। তারপরে পায়ে পায়ে গেলেন মন্দিরের দিকে।

কে তুমি বিট্‌ঠল? উচ্চনীচের ভেদ, ধনীদরিদ্রের ভেদ, জাতি-ধর্মের ভেদ ঘুচিয়ে এই মারাঠা দেশের সকল মানুষকে কাছে ডেকেছ—কী তোমার দারুণ শক্তি, কী তোমার চুম্বক-আকর্ষণ!

মন্দিরে ঢুকলেন রামদাস। দেখলেন বিট্‌ঠলবিগ্রহ। কলিকালের বিষ্ণু-অবতার। বিটেবরী উভা, কটাবরী হাত। না না, তুমি তো আমার ইষ্টদেবতা নও!

তুমি পাণ্ডুবর্ণ কৃষ্ণ,—অঙ্গে তোমার নবদুর্বাদল শ্যামদ্যুতি কই? হাতে তোমার শঙ্খপদ্ম, ধনুর্বাণ কই? কর্কশ একটা ইঁটের ওপর তুমি খাড়া, তোমার রাজসিংহাসন কই? মাথায় তোমার লিঙ্গসদৃশ

চূড়া, রাজমুকুট কই ? পরপদানত ভীতশঙ্কিত ভক্তদল তোমাকে ঘিরে, বীরসৈন্যপূজিত সে রামরাজ্য কই ? তুমি আমার ইষ্টদেবতা নও !

হঠাৎ আধো-অন্ধকার গর্ভগৃহ অরুণ আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। রামদাস বিস্ফারিত চোখে দেখলেন—তাঁর মরদৃষ্টির সামনে শ্রীরামচন্দ্র। অনির্বচনীয় বিস্ময়ের চকিত আঘাতে উপলব্ধি করলেন,—যিনি বিট্‌ঠল তিনিই রাম। যিনি বলরাম তিনিই লক্ষ্মণ আর যিনি রুক্মিণী তিনিই জননী জানকী।

আর তুমি কে রামদাস ?

আমি ভক্ত। পবননন্দন মারুতির মতো ভক্ত। আমার বুকের পাঁজরে পাঁজরে লেখা অক্ষয় ইষ্টনাম।

তারপরে মারাঠা ইতিহাসের এক অবিস্মরণীয় তাৎপর্যময় ঘটনা ঘটল। রামদাসের সঙ্গে শিবাজীর সাক্ষাৎকার।

চেরিলই কথাটা তুলল। প্রশ্ন তুলতে তার জুড়ি নেই। যে দেশে সে বেড়াতে এসেছে, সে দেশের কতোটা সে জানে আর কোথায় তার অজানার সুরু সেই সীমারেখা আমাদের জানা নেই। বিদেশী গলার ভাঙা উচ্চারণে তার নিতান্ত সহজ প্রশ্নও নিগূঢ় হয়ে কানে বাজে। সে প্রশ্ন করল গোখলেজীকে,—

আচ্ছা, তুকারামের ইষ্টদেবতা বিট্‌ঠল আর রামদাসের ইষ্টদেবতা রাম। কিন্তু শিবাজীর ইষ্টদেবতা ভবানী হলেন কী করে ? গুরু রামদাস কী ইষ্টমন্ত্র তাঁকে দিয়েছিলেন ?

ইষ্টমন্ত্র ? গোখলেজী নাথুরামের দিকে হেসে তাকালেন।

কী হে পণ্ডিত ? শিবাজী মন্ত্র জপ করতেন না কি ?

নাথুরাম বললে,—পাগল ? সারা জীবন যে লোকটা ছুটেছে আর লড়েছে, বসে বসে মন্ত্র জপের সময় কোথায় তার ?

ঠিক বলেছ। শিবাজী কর্মযোগী ছিলেন, মন্ত্রযোগী ছিলেন না। আর তাঁর সব কর্মে ছিল ভবানীর আশীর্বাদ।

চেরিল অপ্রতিভ হবার নয়। বললে,—

সেই কথাই তো জানতে চাইছি। শিবাজীর মনে ভবানীর অধিষ্ঠান হোলো কী করে?

হতেই হবে, গোখলেজী বললেন,—ভবানী যে মা,—শুধু স্নেহময়ী নন, শক্তিময়ী মা। এই মা-ই তো শিবাজীর সব, শিবাজীর সব প্রেরণার মূলে। জন্মকালেও মা ছাড়া কেউ নেই। শিবাজীর মায়ের কথা শুনবে?

রামদাস-মন্দিরের চাতালে বেশ আয়েশ করে আমরা বসেছি। হাত পা ছড়িয়ে। ভোর থেকে হটরহটর চষে বেড়াচ্ছি—দেখে বেড়াচ্ছি মন্দিরের পর মন্দির। প্রায় সব মন্দিরেই হাঁসফাঁস ভিড়, এগোতে পেছোতে ধাক্কাধাক্কি। সে তুলনায় রামদাস-মন্দির অনেক ফাঁকা। খোলা দালান, চকচকে রেলিংএর পিছনে রামসীতা বিগ্রহ। দালানের মাঝখানে মস্ত এক শিলাপট্টে কুঁদেকাটা মারুতি,—রামবিগ্রহের মুখোমুখি।

পাথর-বাঁধানো চাতালের মাঝখানে একটা মোটা-গুঁড়ি বটগাছ, ঘন ধূসর ছায়া। সেই ছায়াতে গোল হয়ে বসেছি আমরা। কানহাইয়ালাল বন্দোবস্তে ওস্তাদ। গোখলেজীর বগলের খবরের কাগজটা টেনে নিয়ে সে মাঝখানে বিছিয়েছে, তার ওপর ঢেলেছে একগাদা মুচমুচে চিউড়া আর বাদাম। তাতে অবশ্য জীজাবাঈএর কাহিনী-কীর্তন আটকায়নি। গোখলেজী বলছেন,—

জুনার থেকে কয়েক মাইল দূরে শিবনের পাহাড়। গিরিশৃঙ্গের সেই কঠিন দুর্গে বাস করেন জীজাবাঈ। স্বামী শাহজীর আর এক বিয়ে, সেই সুন্দরী বউকে নিয়ে তিনি মহাসুখে থাকেন মহীশূরে। আর এই নির্জন পাহাড়ী কেল্লায় পড়ে থাকেন জীজাবাঈ,—স্বামী-পরিত্যক্তা নির্বাসিতা দুঃখিনী। দুর্গদ্বারের পাশে এক মন্দির। মন্দিরে থাকেন শিবাভবানী।

পেটে সন্তান। সেই অবস্থায় পাহাড়ী পথ ভেঙে জীজাবাঈ

রোজ যান শিবাভবানী মন্দিরে। পূজা দেন আর প্রার্থনা করেন,—মা, আমার যেন ছেলে হয় আর ছেলে যেন হয় শিবের মতো।

শিবাভবানীর বরে ছেলেই হোলো। জীজাবাঈ তার নাম রাখলেন শিবাজী।

গোখলেজী বললেন,—নাথুরাম ঠিকই বলেছে,—সারা জীবন ধরে শিবাজী যুদ্ধই করেছেন,—নিবিষ্টমনে বসে মন্ত্র জপের তাঁর সময় কোথায়? ধর্মের যুদ্ধ, জাতীয়তার যুদ্ধ, স্বাধীনতার যুদ্ধ। এই শিবনের দুর্গশিখরে সেই যুদ্ধের দীক্ষা পুত্র শিবাজীকে দিয়েছিলেন জীজাবাঈ।

আমরা চুপ করে শুনতে লাগলাম,—

মায়ের কোলে জন্ম, মা ছাড়া কেউ নেই। মা-ই প্রথম গুরু! শিবনের দুর্গে দিনের পর দিন কোলের কাছে বসিয়ে জীজাবাঈ ছেলেকে শুনিয়েছেন রামায়ণ-মহাভারতের কথা, ন্যায়যুদ্ধ আর অন্যায়ের পরাজয়ের কথা, প্রাচীন ভারতের দিগ্‌বিজয়ী মহাপুরুষদের কথা। রামচন্দ্র আর যুধিষ্ঠিরের সত্যনিষ্ঠায় তাকে অনুপ্রাণিত করেছেন, অর্জুন আর কৃষ্ণের কাহিনী শুনিয়ে বীরত্বের সঙ্গে কূটনীতির পাঠ দিয়েছেন। আর কী করেছেন জানেন? প্রত্যেক দিন ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে গেছেন মন্দিরে,—ছেলের মনে দেবী ভবানীর প্রতি অচলা ভক্তি সঞ্চারিত করেছেন।

জন্ম থেকে কিশোরকাল পর্যন্ত শিবাজী মা ছাড়া কোনো আত্মীয়কে দেখেননি,—দুঃখিনী মা, নিভূষণা পরিত্যক্তা মা, বিদেশী শাসকের অত্যাচারে নিপীড়িতা মা। এই মাকে মুক্ত করতে হবে। এই মার জন্যে জীবন পণ করতে হবে। এই মা জীজাবাই, এই মা দেবী ভবানী, এই মা দেশজননী।

গোখলেজী যেন আপন মনে বলে চললেন,—শিবাজীর নিজে হাতে তৈরী দুর্গ প্রতাপগড়,—দুর্গ তৈরী করে মাকে নিয়ে গেলেন। মা বললেন,—ভবানীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করো। ভবানীই তোমাকে প্রতাপান্বিত করবেন।

সেই প্রতাপগড়ে এসেছেন বিজাপুরের সেনাপতি আফজল খাঁ। সঙ্গে বারো হাজার ঘোড়সওয়ার সৈন্য। পথে পড়েছে তুলজাপুর, সেখানে তুলজা-ভবানী মূর্তি তিনি গুঁড়োগুঁড়ো করেছেন। পথে পড়েছে পান্ধারপুর। পুরোহিতরা বিট্‌ঠলমূর্তিকে লুকিয়ে রেখেছে। গোরক্ত ছিটিয়েছেন মন্দিরের গর্ভগৃহে।

শিবাজী বললেন,—কী করব মা? পালাব? ধরা দেব?

জীজাবাঈ বললেন,—ভবানীর পায়ে প্রণাম করে মুখোমুখি হও শত্রুর।

তাই হলেন শিবাজী। আফজলের যেমন বিরাট চেহারা, তেমনি বিশাল শক্তি। অতর্কিতে ভীম হাতে টুঁটি চেপে ধরলেন শিবাজীর। তরোয়াল তুললেন শিবাজীর মাথার ওপর। বাঘনখ দিয়ে আফজলের পেটের নাড়িভুড়ি ছিন্নভিন্ন করে দিলেন শিবাজী।

জীজাবাঈএর কথা বলতে গোখলেজীর কথা ফুরোয় না।

তারপর সিংহগড়ের কাহিনী স্মরণ করুন।

আমরা সাগ্রহে বললাম,—

বলুন গোখলেজী।

ঐ প্রতাপগড় দুর্গে একদিন ভোরবেলা। মা জীজাবাঈ পূজায় বসেছেন ভবানীমন্দিরে। মন বড়ো উচাটন,—দিল্লীর সম্রাট আওরংজেবের হাতে কাশীর বিশ্বনাথ মন্দির ধ্বংস হয়েছে। এ খবর তাঁর কানে এসেছে। শুনে শিউরে উঠেছেন। পায়ে পায়ে বুরুজের কাছে এসে দাঁড়ালেন। পূবদিকে তাকালেন। দূরে এক পর্বতচূড়া, তার মাথায় আর একটি দুর্গ।

ওটা কোন্ দুর্গ?

জীজাবাঈ উত্তর শুনলেন,—কোণ্ডানা।

শিবাজী যখন শিশু তখন মোগল সৈন্যরা ঐ দুর্গে তাঁকে একবার বন্দিনী করে রেখেছিল। অকথ্য যন্ত্রণার সেই ভয়ংকর দিন ভোলা যায় না,—সেই অপমান, সেই অত্যাচার।

ডেকে পাঠালেন ছেলেকে।

ঐ দুর্গ আমার চাই।

বলো কী মা? ঐ দুর্গ যে মোগলের! দিল্লীর শাহেনশা ওর মালিক।

পাঠানকে ভয় পাওনি,—ভয় পাবে মোগলকে? ভয় করবে শুধু পাপকে, ভীরুতাকে, আত্মবিশ্বাসের অভাবকে। যেমন করে পারো ঐ দুর্গ জয় করতে হবে। ওর তোরণে তোমার পতাকা ওড়াতে হবে। নতুন করে দুর্গের নাম দিতে হবে সিংহগড়।

মাতৃ-আজ্ঞা পালন করলেন শিবাজী।

মাত্র তিপ্পান্ন বছর আয়ু ছিল শিবাজীর। কুড়ি বছর বয়সে লড়াই শুরু করেছিলেন,—সেই লড়াই জীবনের শেষ বছর পর্যন্ত। স্বাধীনতার লড়াই,—অনুপ্রেরণা মা জীজাবাঈ।

আর মা ভবানী। দুই মা একই মা।

বারো বছর বয়সে গৃহত্যাগ করেছেন। বারো বছর বনে বসে তপস্যা, তারপর আরো বারো বছর ভূ-ভারতে তীর্থপরিক্রমা। তীর্থে তীর্থে দেখেছেন ভাঙা মন্দিরচূড়া আর তীর্থদেবতার অবমাননা। বিধর্মী শাসকের হাতে ভীতসন্ত্রস্ত ভক্তের নিগ্রহ। যৌবনের রক্ত টগবগিয়ে ফুটেছে প্রতিকারহীন ক্ষোভে। কেন এমন হোলো? এই বিশাল জাতি,—মহান যার ধর্ম,—এমন দুর্দশা তার হোলো কেমন করে?

চাফলে আশ্রমবাসী হয়ে রামদাস প্রথম সমাজের প্রত্যক্ষ সম্পর্কে এলেন,—উত্তর খুঁজলেন তাঁর প্রশ্নের। কোন্ সমাজ? ব্রাহ্মণ সমাজ। সংসার ছাড়লে কী হয়, ব্রাহ্মণ বংশে রামদাসের জন্ম, ব্রাহ্মণ বলে মনে মনে দারুণ গর্ব। নিজের সমাজের হীনতা দেখে তাঁর মন বিষতিক্ত হয়ে গেল। ব্রাহ্মণের বিদ্যা নেই, বিদ্যার আড়ম্বর আছে। জ্ঞান নেই, জ্ঞানের অহঙ্কার আছে। ঈশ্বরানুরাগ নেই, সংস্কারের আবিলতা

আছে। আদর্শভ্রষ্ট চরিত্রভ্রষ্ট। তারা মিথ্যা অহমিকায় নিজের দেশবাসীকে ঘৃণা করে। ক্ষুদ্র স্বার্থের জন্যে নিজেদের মধ্যে কলহ করে আর নির্লজ্জের মতো পদলেহন করে বিধর্মী শাসকের।

ক্ষত্রিয় রামচন্দ্রের গুরু ছিলেন ব্রাহ্মণ,—জাতির গুরু। সে ব্রাহ্মণ কই, সে ক্ষত্রিয় কই,—সে জাতিই বা কই? কেমন করে খাড়া থাকবে সে জাতির মন্দিরচূড়া?

পান্ধারপুরে গেলেন রামদাস। জাতিকে দেখলেন, জাতিকে চিনলেন। উচ্চ নীচ সব সমাজের একাকার মারাঠা জাতি। একতার শোভাযাত্রা দেখলেন,—একতার গান শুনলেন শূদ্র তুকারামের গলায়। সঙ্গে সঙ্গে মনে ভেসে উঠল আর এক শূদ্র নেতার নাম যিনি স্বাধীনতার নামে সকল মারাঠা হিন্দুকে এক করার ব্রত নিয়েছেন। তিনি শিবাজী।

রামদাসের প্রধান গ্রন্থের নাম দাসবোধ। শিবাজীর প্রতি গুরু রামদাসের উপদেশ তাঁর দাসবোধ গ্রন্থে সন্নিহিত আছে।

শিবাজীকে মহারাজ সম্বোধন করে রামদাস বলছেন,—

মহারাজ, উপদেশ চাও আমার? ভগবৎগীতায় শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে যে উপদেশ দিয়েছিলেন স্মরণ করো,—কর্মযোগ সাধনা করো। তুমি শিরে পরো বুদ্ধির রাজমুকুট, অঙ্গে পরো বীর্যের রাজবেশ। শত্রুকে তুমি জয় করো, জাতিকে পরাক্রান্ত করো, ম্লেচ্ছের হাত থেকে স্বদেশকে মুক্ত করে ধর্মরাজ্য স্থাপন করো।

শিবাজী প্রতিজ্ঞা করলেন,—

এক ধর্মরাজ্যপাশে খণ্ড ছিন্ন বিক্ষিপ্ত ভারত বেঁধে দিব আমি।

শুধু কর্মযোগ নয়,—নিষ্কাম কর্মযোগ,—অনাসক্তিযোগ। শিবাজীর ক্ষমতা তখন তুঙ্গে। সারা কোঙ্কন পায়ের নিচে, সারা পশ্চিম মহারাষ্ট্র হাতের মুঠোয়। পাঠানরা তাঁর কাছে কাবু। তাঁর ভাবনায় মোগল সম্রাটের ঘুম নেই। সহ্যাদ্রির দুর্গে দুর্গে তাঁর ঘাঁটি,—

প্রতিটি ঘাঁটিতে সৈন্যসামন্ত, অস্ত্র-শস্ত্র আর রাজকোষ। সারা দেশ জুড়ে শিবাজী মহারাজের জয়ধ্বনি।

সাতারার অদূরে পারলি দুর্গ। শিবাজীর বড়ো ইচ্ছে ঐ দুর্গটি গুরু রামদাসকে দেবেন। গুরু ঐখানে থাকবেন,—দেশের সব সাধু মহাত্মারা ঐখানে গুরুকে ঘিরে থাকবেন। নতুন করে দুর্গের নাম দেবেন সজ্জনগড়।

নগ্নপদ, পরনে কৌপীন আর বহির্বাস। কাঁধে একটি ঝুলি। রামদাস পথে পথে ভিক্ষা করে বেড়াচ্ছেন।

শিবাজী দেখে অবাক।

এ কি প্রভু? মহারাজের গুরু হয়ে তুমি প্রজার দ্বারে দ্বারে মুষ্টিভিক্ষা করছ?

হ্যাঁ, তোমার সামনেও আমার ঝুলি পাতলাম বৎস,—তুমিও এক মুঠো দাও!

দিলেন শিবাজী। যেমন গুরু শিষ্যও তেমন। দানপত্র লিখে তাঁর সমস্ত রাজ্য সমর্পণ করলেন গুরুর চরণে। নিঃস্ব হলেন,—গুরুর কাঁধ থেকে ভিক্ষার ঝুলি নিজের কাঁধে তুলে নিলেন।

রামদাস তখন বললেন,—এ রাজ্য আর তোমার নয়। আমি সন্ন্যাসী,—আমারও নয়। পরম প্রভু পরমেশ্বরের। মনে রেখো তাঁর দ্বারে তুমি ভিখারী,—তাঁর মন্দিরে তুমি সেবক। লাভলোভবিহীন সেবকের মতো এই রাজ্য তুমি পরিচালনা করো।

নিজের গেরুয়া বহির্বাস শিবাজীর হাতে তুলে দিয়ে বললেন,—বৈরাগী সাধক-শাসকের নিত্য-নিদর্শন এই ভাগবে ঝাণ্ডা হোক তোমার রাজ্যের নিশান।

প্রতাপগড়ে ভবানীমূর্তি যেদিন শিবাজী প্রতিষ্ঠা করেন সেদিন রামদাস স্বামী ছিলেন তাঁর পাশে। রায়গড়ের অভিষেকসভায় শিবাজী যেদিন ছত্রপতি উপাধিতে ভূষিত হন,—সেদিন তাঁকে আশীর্বাদ করেন গুরু রামদাস। শিবাজীর মৃত্যুর পরের বছর ১৬৮১ সালে সজ্জনগড়ে রামদাস সমাধিস্থ হন।

দেহত্যাগের আগে শম্ভাজীকে ডেকে বলেন,—

শিবাজীকে মনে রেখো,—যিনি শুধু তোমার পিতা নন, জাতির পিতা। জাতিকে মনে রেখো,—যে জাতি হিন্দু নয় মুসলমান নয়, মারাঠা জাতি। ধর্মকে মনে রেখো,—ব্রাহ্মণের ধর্ম নয় ক্ষত্রিয়ের ধর্ম নয়,—মহারাষ্ট্রের সকল মানুষের লোকধর্ম।

॥ ৩০ ॥

আমরা সকলেই লক্ষ করেছিলাম, সকলেরই চোখে পড়েছিল। মনের ভাবনাটা চেরিলই প্রকাশ করে বললে,—

বাপ্পা কেমন যেন হয়ে গিয়েছেন,—দেখেছ সখা?

কেমন আবার?

কেমন নয়?

না না, ও কিছু নয়। এতোদিন এতোটা পথ হেঁটেছেন, কতো পরিশ্রম, কতো অনিয়ম,—তার ওপর এতোটা বয়েস—সব মিলিয়ে দারুণ একটা ক্লান্তি। চুপ করে বসে থাকুন না, বিশ্রাম করুন না দুটো দিন।

তাহলেই ঠিক হয়ে যাবেন?

নিশ্চয়ই।

চেরিলের ব্যাকুলতা বুঝি,—আবার বুঝিওনে। অমন শ্রদ্ধা অমন দরদ অমন সেবা মেয়েও করে না। যে মেয়ে নয় সেই বোধহয় করে। আবার যে মেয়ে নয়, তার বাঁধনের জোর কতোটুকু? সে টান টিকবে ক-দিন আর? আর দুদিন পরে কোথায় চেরিল আর কোথায় তার বাপ্পা? এই যে আমাকে সখা বলে ডাকে,—এ ডাক ক-দিন আর শুনব?

তবে সত্যিই অন্য রকম হয়ে গেছেন পূর্ণচৈতন্য মহারাজ। বিট্‌ঠলের দর্শনলাভের পর থেকেই,—একদিন যেতে না যেতেই।

আর চলা নেই, চঞ্চলতা নেই। বাঞ্ছিত লাভের পরিতৃপ্তি নিয়ে স্তব্ধ হয়ে যাওয়া। এ শুধু দেহের ক্লান্তি নয়।

একাদশীর দিন সন্ধ্যেবেলা জ্ঞানেশ্বর-মন্দিরে বারকরীদের আনন্দ-মিলন। আলন্দীর বারকরীদের শেষ সান্ধ্যসভা। গান, নামকীর্তন, আলোচনা। পুনর্যাত্রা ও পুনরাগমনের অঙ্গীকার। এবার সংহতি ভাঙবে। ভোর হতে না হতেই যে যার রাস্তা দেখবে। শুক্লা একাদশীর সন্ধ্যায় মিলনোৎসব আর বিদায়-আলিঙ্গনের মধ্যে বারকরী যাত্রার সমাপ্তি।

যাত্রাপথে এমনি সান্ধ্যসভায় কতোদিন বসেছি। পূর্ণচৈতন্যজীর কথা শুনেছি। সকলের সঙ্গে তিনি হেঁটেছেন। সকলের পরিশ্রমের অংশভাগী হয়েছেন। কিন্তু দিনান্তে একটুও ক্লান্ত হননি,—বিশ্রামের জন্যে দূরে সরে যাননি। কিন্তু এই শেষ সভায় তিনি নীরব। এক কোণে বসে রইলেন চুপ করে, কোলের ওপর হাতদুটি জোড় করে। কেবল নামগানের সময় অস্ফুট উচ্চারণে ঠোঁটদুটি নড়ল।

দ্বাদশীর ভোর থেকে দেশপাণ্ডেজীকে নিয়ে সারাদিন ঘুরলাম। বিকেলবেলা তিনি বিদায় নিলেন। হাসিমুখে নমস্কার করলেন সবাইকে। বাঙালী ভাই বলে আলিঙ্গন করলেন আমাকে,—চেরিলের মাথায় রাখলেন হাত।

বিকেলবেলা গেলাম জ্ঞানেশ্বর-মন্দিরে। মন্দির ফাঁকা হয়ে গিয়েছে। অধিকাংশই চলে গিয়েছেন। আজ আর কোনো সভা নেই, উৎসব নেই।

পূর্ণচৈতন্য কোথায়?

তিনিও নেই।

সে কি? ফিরে গিয়েছেন? আমাদের না বলে? আমাদের শেষ প্রণামকে পরিহার করে? এমন তো কথা ছিল না?

না,—তিনি আছেন বিট্‌ঠলমন্দিরে।

দ্বাদশী থেকে বিট্‌ঠলমন্দিরে তাঁর আশ্রয়। সারারাত মন্দির-চাতালে অসংখ্য ভক্ত পড়ে থাকে। তিনিও তাই। ষোড়শস্তম্ভ মণ্ডপের এক কোণে ঠাঁই দিয়েছে পূজারীরা। সেইখানেই চুপটি করে বসে থাকা,—শেষ আরতির পর সেখানেই রাত্রিবাস।

শুক্লা ত্রয়োদশী তিথি। ভোর থেকে আমরা আছি বিট্‌ঠল-মন্দিরে,—পূর্ণচৈতন্যজীর আশেপাশে। ঠিকই বলেছে চেরিল। একেবারে অন্য রকম হয়ে গেছেন মহারাজ। ধ্যানস্থ ভাব,—মুখে কথাটি নেই। নিজের মনে কী ভাবছেন,—কখনো মুখে মৃদু হাসি, কখনো চোখে জল।

চেরিল চুপ করে থাকার মেয়ে নয়। মহারাজের হাঁটুতে হাত ছুঁইয়ে সে ডাকল,—বাপ্পা, ও বাপ্পা?

সম্বিত ফিরে পেলেন পূর্ণচৈতন্য। সম্বিত ফেরাবার এমনি দাবী চেরিল ছাড়া আর কার?

বাপ্পা,—শুনুন না বাপ্পা!

বলো মা?

কী ভাবছেন বাপ্পা?

ভাবছি? কই ভাবছি? কিছু তো ভাবছি নে মা!

ভাবছেন বৈকি। মুখে হাসি কিন্তু চোখে জল কেন?

একটু ভাবলেন পূর্ণচৈতন্য। তারপর আস্তে আস্তে বললেন,—মায়ের কোলে বসেছি,—হাসব না? আবার তুমি মা এবার কোল ছেড়ে চলে যাবে,—কাঁদব না?

বিদায়ের করুণ সুর। সবাইকারই মনে বাজছে। হাসিকান্নার সুর।

চেরিল শক্ত মেয়ে। বললে,—চলে তো যাবই। একটি কথা বলছেন না আমার সঙ্গে,—কীসের জন্যে থাকব? আজই চলে যাব।

কতো কথা তো বলেছি মা, কথার বাকি কি আছে আর?

সত্যি, অনেক কথা বলেছেন পূর্ণচৈতন্যজী। তাঁর কথার আকর্ষণ

আমার চেয়ে কার? ব্রহ্মগিরিতে তাঁর কথা প্রথম শুনেছিলাম,—সেই কথার টানেই আলন্দীতে তাঁকে খুঁজেছি। আলন্দীতে তিনি কথা বলেছিলেন,—সেই কথার তরঙ্গেই ভাসতে ভাসতে পৌঁছেছি পান্ধারপুরে। কথার সাগর যিনি,—আজ তিনি কথা-কৃপণ।

নাথুরাম বললে,—বাবা, যাবেন না?

যাব? কোথায় যাব?

কেন? ব্রহ্মগিরিতে? আপনার আশ্রমে?

কেমন বিহ্বল চোখে তাকালেন।

অনেক দূর,—তাই না?

তাতে কী? আমি আপনার সঙ্গে যাব। গোখলেজীও যাবেন। ট্রেনে ফিরব। একেবারে নাসিক পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে আসব আপনাকে। আষাঢ় মাসে আবার আসতে হবে না?

চুপ করে বসে রইলেন পূর্ণচৈতন্য। সামনে গর্ভগৃহের দিকে তাকিয়ে। এতোদিন সঙ্গে আছি। এতো ক্লান্তি কখনো দেখিনি। বয়েস হলে কী হয়, মাথার চুল শাদা হলে কী হয়,—তেজী ঘোড়ার মতো। আর আজ শুধু বসেই আছেন।

চোখ পড়ল আমার দিকে।

বাঙালী ভাই, সব দেখেছ?

সব দেখেছি মহারাজ,—দূরে দূরে কয়েকটা জায়গা বাকি।

দূরে কিছু নেই,—সব এইখানে। তবে হ্যাঁ, বিষ্ণুপাদ আর গোপালমন্দির দেখে এস।

আজই যাব মহারাজ।

একটু চুপ করে থেকে শান্ত গলায় বললেন,—

কেমন লাগল বাঙালী ভাই?

খুব ভালো মহারাজ।

আবার বললেন একই কথা,—যা দেখাতে চেয়েছিলাম,—দেখেছ?

আমিও দিলাম একই উত্তর,—দেখেছি।

বুঝেছ ?

কিছু কিছু বুঝেছি। আবার আপনার কাছ থেকে বুঝে নেব।

আমার কাছ থেকে ? আবার ?

হ্যাঁ, আবার আমি ব্রহ্মগিরিতে যাব, আপনার কাছে থাকব।

কোনো কথা বললেন না। নীরবে মাথা নাড়লেন।

নাথুরাম আবার বললে,—

আমাদের কিছু তাড়া নেই বাবা। আজ রাত্রে আরতি দেখব, কাল সকালে তনপুরে মহারাজের মন্দিরে উৎসব। কাল সন্ধ্যে ছটায় ট্রেন,—ফিরতি যাত্রা। কেমন ?

কাল ? যাওয়া আসা অনেক করেছি বাবা, ভাবছি আর যাব না, —ফিরে তো আসতেই হবে।

কতো দূরে যাওয়া, কতো দূর থেকে ফিরে আসা ? ব্রহ্মগিরির আশ্রমটির ছবি আমার মনে ভেসে উঠল, যেখানে পূর্ণচৈতন্যজীর আশ্রয়। সহ্যাদ্রির পর্বতচূড়া ব্রহ্মগিরি, ত্র্যম্বকেশ্বর তীর্থের পশ্চিমে। গঙ্গাদ্বার মন্দির থেকে কিছুটা দূরে পূর্ণচৈতন্যজীর আশ্রম। পাহাড়ের কিনারে, ব্রহ্মাসাবিত্রী মন্দিরের গায়ে, ঘন বনের মাঝখানে। মেঝেয় পাতা দুটি কম্বল, দেয়ালে ঝোলানো কখানা ঝুলি কাপড়, কোণের তাকে কটি বই আর টুকিটাকি,—ঐ সম্বল। এক মাইল দূরে পাহাড়েব পূবকোণায় গোরখগুম্ফায় থাকেন এক কন্‌ফট যোগী। ঐ একমাত্র বন্ধু।

অনেকদিন ঐ আরণ্য আশ্রয়ে কাটিয়েছেন পূর্ণচৈতন্যজী আর বারকরী হয়ে নিয়মিত এসেছেন পান্ধারপুরে। আর ফিরে যেতে দেহ চাইছে না, মন চাইছে পান্ধারীনাথের কাছে নিত্য আশ্রয়। সবাই ফিরে যাক, যে যার কাজে গিয়ে রত হোক,—থাকুন শুধু পূর্ণচৈতন্য। পাণ্ডুরঙ্গের পায়ের তলায়। তাঁর কোনো কাজ নেই।

আর এক অকাজের লোক কানহাইয়ালাল। সে খুব খুশি। অকাজের নেশায় অনেক ঘুরেছে সে,—হেঁকে উঠল আনন্দে,—ঠিক আছে, কেটে পড়ো সব। আমি মহারাজকে নিয়ে থাকব।

বিট্‌ঠলমন্দির থেকে সোজা দক্ষিণ দিকে, বিষ্ণুপাদ আর গোপালপুর দেখতে আমরা চলেছি। অনেক যাত্রী চলেছে।

চওড়া রাস্তা পিচ বাঁধানো,—ছোট বড়ো দল, দলের পেছনে পেছনে আমাদের দলও আছে। দলপতি হয়েছেন পুণ্ডলিক মন্দিরের বৈকুণ্ঠভাই। বিনয়ী বৈষ্ণব, মুখে মিষ্টি হাসি লেগেই আছে।

মাইলটাক হাঁটার পর পাকা রাস্তা ছেড়ে বাঁ দিকে ঘুরলাম। নদীতীরের দিকে চললাম। সামনে নাকি গোপালপুর?

না, বৈকুণ্ঠভাই বললেন,—এখন দেখবেন বিষ্ণুপাদ তীর্থ। গোপালপুর আরো দূর, বিষ্ণুপাদ দেখে গোপালপুর যাব।

কাঁচা রাস্তা নদীতীর পর্যন্ত এঁকেবেঁকে এগিয়েছে। পাশে পাকা বাড়ি নেই, উঁচু উঁচু গাছ, কয়েকটা কাঁচা কুটীর। এক একটা কুটীরের দাওয়ায় ছোট ছোট বিগ্রহ,—কৃষ্ণকিশোর বনমালী, নীলবর্ণ রাম, লাল-টকটকে মারুতি। সামনে ধূপধুনো, ফুলজল, খুচরো প্রণামী ফেলবার থালা।

নদীর বুকে একটি শিলাদ্বীপ। সংকীর্ণ একটি সেতুর ওপর দিয়ে পৌঁছতে হয়। এই দ্বীপটির নাম বিষ্ণুপাদ। জল থেকে সাত-আট ফুট উঁচুতে সমচতুষ্কোণ মণ্ডপ। চূড়াবিহীন ছাদ। মণ্ডপের চারধারে ঘাটের সিঁড়ি। ঠিক মাঝখানে শিলাপটে বিষ্ণু-ভগবানের চরণচিহ্ন। দুপাশে দুটি স্তম্ভের গায়ে বেণুগোপাল আর নারায়ণ।

এই বিষ্ণুপাদ বড়ো পবিত্র তীর্থ, তীর্থযাত্রীদের এখানে আসতেই হবে, এখান থেকে তীর্থপুণ্য সংগ্রহ করতেই হবে। স্নান তর্পণ উপনয়ন শ্রাদ্ধ, এ সব সংস্কার বিষ্ণুপাদের ঘাটে করতে হয়। আর যথাসাধ্য দান করতে হয় ভিখারীদের।

এই সব ক্রিয়ার জন্যে অনেক পুরোহিত। তাছাড়া প্রতিদিন বিষ্ণুচরণে নিত্য পূজা আর আরতি। ক-সপ্তাহ পরেই বিট্‌ঠলমন্দিরের ভক্তি-তরঙ্গের প্লাবন বিষ্ণুপাদে এসে লাগবে। অঘ্রান মাসে এখানে

মস্ত উৎসব। তখন বিট্‌ঠল-পাদুকা রথে চড়ে বিষ্ণুপাদে এসে অবস্থান করবেন। সঙ্গে আসবে বিরাট শোভাযাত্রা। আছড়ে পড়বে যাত্রীর দল।

আরো কয়েক মাইল দূরে গোপালপুব। শান্ত নির্জন জনপদ। গোপালপুরের আকর্ষণ গোপালকৃষ্ণ মন্দির। মস্ত এলাকা জুড়ে মন্দিব, পাথরের উদার চাতাল, চারদিকে উঁচু প্রাচীর। প্রাচীরের ধারে ধারে ছোট ছোট কক্ষ, যাত্রীদের আশ্রয়।

মন্দির একটি নয়,—কয়েকটি। প্রধান মন্দির গোপালকৃষ্ণের। অনেকগুলি সিঁড়ি বেয়ে উঠে অনেকটা উঁচুতে মস্ত মণ্ডপ। গর্ভগৃহে কষ্টিপাথরের মূর্তি, মাথায় রূপার মুকুট। একটি মন্দিরে রুক্মিণী-পিতা ভীমকরাজের পিতলের মুখ আর একটি মন্দিরে পদ্মাসনে বসে আছেন শিলাময় নারদমুনি।

মন্দিরগুলি ঘুরে ঘুরে আমরা দেখলাম। তারপর গোপাল মন্দিরের পাশে নিচু একটি দরজার সামনে বৈকুণ্ঠভাই আমাদের আনলেন। দরজাব দুপাশে দুটি মেয়ে বসে মালা বিক্রী করছে। চেরিলকে বললেন,—দুটি মালা কিনুন।

মালা কেনা হোলো। এবার আমরা কোথায় যাব?

বৈকুণ্ঠভাই নির্দেশ দিলেন,—ঐ দরজার মধ্যে। ওখানে একটা সুড়ঙ্গ পাবেন। মাথা নিচু করে আস্তে আস্তে নেমে যান।

কোথায় পৌঁছব? কী আছে সুড়ঙ্গের তলায়?

গিয়ে দেখুন না,—ওখানে জনাবাঈএর সমাধি।

বড়ো বড়ো পাথরের কটা ধাপ। সেই ধাপ বেয়ে নিচে নেমে অন্ধকার একটি কক্ষ। সেই কক্ষতলে পাথরের নিচে ঘুমিয়ে আছেন জনাবাঈ। সমাধির ওপর পাথরের দুটি মূর্তি। মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বিট্‌ঠলপ্রভু আর সাধিকা জনাবাঈ। কোণে একটি মৃৎপ্রদীপ অনির্বাণ। তার নিশ্চল নম্র শিখা। চেরিল হাতের মালাদুটি দুই মূর্তির গলায় পরিয়ে দিল।

কানহাইয়ালাল ঘাড় তুলে বললে,—

দাদা, নজরটা একটু ফেরান, ওদিকটা দেখছেন? কী কাণ্ড শুরু হয়েছে!

গোপালমন্দিরের ছায়ায় বসে গোখলেজীর সঙ্গে গল্প করছিলাম। প্রায় দ্বিপ্রহর, মাথার ওপর সূর্য,—মন্দিরের এদিকটা কিছুটা ঠাণ্ডা। চেরিল আর নাথুরাম গিয়েছে চা-খাবারের সন্ধানে। বৈকুণ্ঠজী মন্দিরের মধ্যে। সিঁড়ির ধাপে আড় হয়ে গা এলিয়েছে কানহাইয়ালাল।

কী দেখব?

ঐ দেখুন, কী ভিড়,—মচ্ছব লেগেছে।

বলতে না বলতেই কে যেন টুটারি শিঙা বাজিয়ে দিল। কড়া আওয়াজ শিঙার,—একবার, দুবার, তিনবার। সঙ্গে সঙ্গে জোর হইচই উঠল। চারদিক থেকে লোক ছুটতে লাগল,—গেট দিয়ে ঢুকতে লাগল ভেতরে,—জমায়েত হতে লাগল জনাবাঈ মন্দিরের পাঁচিলের গায়ে।

সাধু, ভবঘুরে, ভিক্ষার্থী। আর দেহাতী তীর্থযাত্রীর পাল। ঠেলাঠেলি, ধাক্কাধাক্কি, চেঁচামেচিও মন্দ নয়।

কানহাইয়ালালকে ঠেলা দিলাম আমি। ওঠো ওঠো,—আমরা যাই?

আমরাও যাব? ঐ ভিড়ে? কেন?

দেখছ না, সবাই যাচ্ছে? মনে হচ্ছে গোপালের অতিথিসৎকার, এক্ষুনি পাত পড়বে। নাঃ, ও ছুটো আবার কোথায় যে গেল?

কী বলো তুমি? কী হবে ঐ ভিড়ে গিয়ে?

গোখলেজীর বিস্ময়!

বারে, খাব না? বিনে পয়সায় পেট ভরবে। তাছাড়া মহারাজকে একলা ফেলে এসেছি। তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে না?

শিঙার ডাকে চেরিল নাথুরামও হনহনিয়ে আসছে। চেরিল কাছে এসে শুধোলে,—ব্যাপার কী?

আমি বললাম,—ডাক পড়েছে, এবার পাত পড়লেই হয়। দলেবলে গোপালের ভোগ!

মন্দির থেকে বার হয়ে এলেন বৈকুণ্ঠভাই,—সঙ্গে একজন পুরোহিত। পুরোহিতের জোড়হাত, বিনয়ী বদন।

বৈকুণ্ঠভাই বললেন,—এঁরা বলছেন আপনারা একটু ভোগ-প্রসাদ নিয়ে যাবেন। এখুনি আসছে,—হাত পেতে নেবেন,—তার আগে চলে যাবেন না।

নাথুরাম ব্যাপারটা সঙ্গে সঙ্গে ধরে নিয়েছে। চোখ পাকিয়ে চট্ করে বলে উঠল,—

হাত পেতে? আমি চিৎপাবন ব্রাহ্মণ, হাত পেতে ভোগ নেব? কে করেছে এই ভোগের ব্যবস্থা?

পুরোহিত সবিনয়ে বললেন,—

আজ্ঞে, ভক্তরাই করেছেন। ভক্তের মানসিকেই ভোগ।

বটে? আমরা পাত পেতে ভোগ চাই, হাত পেতে নয়! তাই তো চেরিল?

চেরিলের কানের পাশে চুলের ঘণ্টা বাজল। সে মাথা নেড়ে বললে,—নিশ্চয়!

পূজারী করজোড়ে বললেন,—বেশ তো বেশ তো! এদিকটাতে আলাদা করে এখনি আপনাদের ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।

কানহাইয়ালাল একবার কটাক্ষ করল আমার দিকে। সেই কটাক্ষের মানে বুঝে সঙ্গে সঙ্গে আমি হাঁকলাম,—

আলাদা কেন বসব আমরা? আমরা কি অচ্ছুত?

মাথা নেড়ে সায় দিলেন অধ্যাপকও।

তবু বৈকুণ্ঠভাই কিছুটা অস্থির। আমাকে নিয়েই তাঁর সবচেয়ে দ্বিধা। আমতা-আমতা বললেন,—

আপনি গৌড়ীয় ব্রাহ্মণ। পবিত্র বংশে জন্ম। পংক্তিভোজে আপনি বসবেন? জানেন আপনার পাশে বসে খাবে কারা?

মন বললে,—জানি, জানি,—মহার বসবে, চামার বসবে, কুম্ভার বসবে। ওই যে ঠাকুরের নামে গান গেয়ে গেয়ে বেড়ায়,—ঐ সব ঠুনঠুনা-বাজিয়ে গন্ধালী,—ওরাও বসবে।

আমি কানহাইয়ালালের দিকে ফিরে তাকালাম। কানহাইয়ালালের হাত ধরে এগোলাম। পংক্তিতে গিয়ে পৌঁছলাম। ওখানে আমার জন্যে অপেক্ষা করে আছেন নামদেব আর চোখামেলা, একনাথ আর তুকারাম। প্রাণের মধ্যে সন্তমণ্ডলীর ডাক শুনলাম,—

এসো, এসো, গৌড়বাসী এসো, বাঙালী ভাই এসো।

ফেরার পথে, বৈকুণ্ঠভাইকে বললাম,—আপনার অনেক দয়া,—গোপালমন্দিরে ভোগ না খেলে যাত্রা সম্পূর্ণ হোতো না।

সম্পূর্ণ হোলো বাঙালী ভাই?

নিশ্চয়! জানেন আমি যে দেশের অধিবাসী সেখানে গঙ্গা সাগরে বিলীন হয়েছেন, সগররাজার বংশধরদের পাপ থেকে পরিত্রাণ করেছেন। পবিত্র হবার মানস নিয়ে আমিও গঙ্গাসাগর সংগমে স্নান করেছি। কিন্তু আজ ঐ পংক্তিভোজে বসে মনে হোলো আমি এতো পবিত্র হলাম যে অপবিত্রতার ভয় আর রইল না।

আর সবাই আগে আগে। আমি আর বৈকুণ্ঠজী পেছনে পেছনে হাঁটছিলাম।

বৈকুণ্ঠজী হঠাৎ বললেন,—

আপনাকে দেখে খুব বেশী আশ্চর্য হইনি আমি।

আমাকে দেখে? আমাকে দেখে আশ্চর্য হবার কী আছে?

নেই? আমি অনেকদিন পান্ধারপুরে আছি বাঙালী ভাই। বারকরী দলে কোনো বাঙালীকে এ পর্যন্ত দেখিনি। অন্য সব তীর্থে পাণ্ডা-পুরুতরা তাদের খাতার যাত্রীদের নাম লিখে রাখে। এখানে তেমনি রীতি নেই। যদি থাকত, তাহলেই বা তাদের খাতায় কজন বাঙালীর নাম থাকত কে জানে?

আমি হাসলাম। বললাম,—নিশ্চয় থাকত, অনেক নাম থাকত। বাঙালীরা খুবই তীর্থপ্রেমিক,—গঙ্গোত্রী থেকে কন্যাকুমারী পর্যন্ত বাঙালী তীর্থযাত্রীর আনাগোনা। পান্ধারপুরে বাঙালী আসেনি,—কোনো বাঙালী প্রণাম করেনি বিট্‌ঠলপ্রভুর পায়ে?

তা নিশ্চয় করেছেন। অন্তত একজনের নাম জানি। পান্ধারপুরের সার্থক মন্ত্রকে প্রাণে নিয়ে নিজের দেশে ফিরে গেছেন। তাঁর কথা ভেবেই তো আপনাকে দেখে আশ্চর্য হতে পারলাম না।

এমনি করে কার কথা বলছেন বৈকুণ্ঠজী? কোন বঙ্গবাসী বিরল তীর্থযাত্রীর কথা তাঁর মনে পড়েছে?

স্মৃতিরোমন্থন করে বললাম,—চৈতন্যদেব? হ্যাঁ, তিনি পান্ধারপুরে এসেছিলেন,—কৃষ্ণদাস কবিরাজ লিখে গেছেন।

কাছাকাছি পৌঁছেছেন—কিন্তু একটু ভুল হোলো। চৈতন্যদেব মন্ত্র নিতে আসেননি—মন্ত্র বিলোতে এসেছিলেন। এসে দেখেছিলেন এ তীর্থ তাঁর মন্ত্রের জন্যে অপেক্ষা করে নেই। এখানে মন্ত্রলাভ করেছিলেন তাঁর অগ্রজ।

অগ্রজ?

হ্যাঁ নিত্যানন্দ। চৈতন্যজননীকে তিনি বলেননি,—আমি নিমাইএর দাদা নিতাই, তোমার বড়ো ছেলে? বিশ্বরূপের হাত ধরে বহু বছর বহু তীর্থ ঘুরে নিত্যানন্দ এলেন পান্ধারপুরে। এইখানে বিশ্বরূপ তাঁর সমস্ত শক্তি দিয়ে নিত্যানন্দকে পরিপূর্ণ করে লীলা সংবরণ করলেন। গুরুর শক্তিতে উদ্বুদ্ধ আর গুরুর শোকে কাতর নিত্যানন্দ পাগলের মতো ঘুরে ঘুরে বেড়ালেন এখানকার পথে পথে। কানে এল বিট্‌ঠলের নাম। চোখে দেখলেন বিট্‌ঠলমন্দিরের চূড়া। ঢুকে গেলেন মন্দিরে। দাঁড়ালেন বিট্‌ঠল-বিগ্রহের মুখোমুখি।

আমি হাঁ করে শুনছিলাম। শুধু বললাম,—

তারপর?

অবধূত নিত্যানন্দ বিট্‌ঠলের সামনে হাতজোড় করে দাঁড়ালেন।

বললেন,—প্রভু, তীর্থব্রত শেষ হয়েছে,—এবার আমি ফিরে যাব আমার স্বদেশে। গুরুর কাছ থেকে শক্তিলাভ করেছি,—এবার তুমি মন্ত্র দাও।

মন্ত্র পেলেন?

পেলেন বৈকি বাঙালী ভাই,—আপনার বুকেও সেই মন্ত্রের গুঞ্জন যে আজ শুনলাম!

কী মন্ত্র বৈকুণ্ঠভাই?

পান্ধারপুরের সাধু বৈকুণ্ঠভাই খুব হাসলেন। তুহাতে আমার তু-কাঁধ চেপে ধরে মাথা নেড়ে বললেন,—

বাঙালী গোঁসাই, নিত্যানন্দের মন্ত্র আপনি জানেন না? ঠাট্টা করছেন আমার সঙ্গে?

হরি বোল হরি বোল।
সুখ তুঃখ এক রোল॥
আচণ্ডালে দিবে কোল।
হরি বোল হরি বোল॥

॥ ৩১ ॥

মনের সঙ্গে মুখোমুখি হবার একটু সুযোগ,—মন নিয়ে খেলব। মনকে কাছে পেয়েছি আবার অনেক দিন পরে।

অনেক দিন মুখ ফিরিয়েই ছিলাম। সকলের সঙ্গে মাখামাখি, সকলের গলায় গলা, সকলের সঙ্গে খোশা। মনের সঙ্গে কেবল আড়ি।

এখন যাত্রা শেষ, পান্ধারপুর দর্শন শেষ। আর কোনো যাত্রা নেই, বিদায়যাত্রা ছাড়া। অনেকেই বিদায় নিয়েছে,—বাকি সবাই তৈরি হচ্ছে। কটি প্রিয় মুখ এখনো কাছে আছে,—এবার সে মুখগুলিও হারিয়ে যাবে।

আমাকেও ফিরতে হবে। ইন্দ্রায়ণীর তীর থেকে ভীমা নদীর তীরে এসে পৌঁছেছি। এবার ফিরতে হবে ভাগীরথীর তীরে। বঙ্গদেশে। যে দেশে জন্মেছিলেন নিত্যানন্দ-শ্রীচৈতন্য।

আচণ্ডালে দিবে কোল,—এই মন্ত্র নিত্যানন্দের। বৈকুণ্ঠজী বললেন নিত্যানন্দ এই মন্ত্র লাভ করেছিলেন পান্ধারপুরে। হয়তো সত্যি, হয়তো কথার কথা। তবে একথা ঠিক, নিত্যানন্দের আগে কোনো বঙ্গবাসী এ মন্ত্র উচ্চারণ করেননি, এ বাণী ঘোষণা করেননি। ভক্তগৃহে বসে প্রিয় পরিকরদের সন্নিধানে নামকীর্তন করেন শ্রীগৌরাঙ্গ,—নিত্যানন্দই তাঁর হাত ধরে তাঁকে ঘরছাড়া করলেন। বললেন,—প্রভু, তোমাকে মহাপ্রভু বলে ডেকেছি। কিন্তু পথে যদি না বার হও, পথের মানুষকে যদি আপন না করো, জগাই-মাধাইকে যদি উদ্ধার না করো, তাহলে কীসের তুমি মহাপ্রভু? সকল মানুষের প্রভু না হলে মহাপ্রভু হবে কেমন করে?

মনের সঙ্গে মজার খেলা নদীতীরে। ঘাটে এলেই নদীর তরঙ্গ কুলুকুলু কথা বলে,—মনের সঙ্গে মিতালী পাতায়। ঘাটে বসে আমার মন নদীর কথা শোনে, নদীর সঙ্গে একাত্ম হয়। সংস্কৃতি-বাহিনী সভ্যতাবাহিনী গণজননীর স্নেহস্পর্শ পায়। কতো ঘাটে এমনি করে আমি বসেছি,—ঘাটের স্মৃতিকে বুকে তুলে নিয়েছি। ঘাটে ঘাটে ঘোরে আমার জীবনতরী।

এ ঘাটেও নোঙর তোলার সময় এল। এখান থেকেও ফিরে যাব। বঙ্গদেশে,—নিত্যানন্দের দেশে। মন, তুমি কার কথা ভাবো? ভাবো নিত্যানন্দের কথা। নদী, তুমি কার গান করো? করো নিত্যানন্দের গান।

এ ঘোর কলির ভবনদী
ও তুই অমনি হবি পার।
এ ঘাটে নিতাই কর্ণধার॥

জাত-ধরমের জড়াজড়ি
পঁইঠা-নোঙর দড়াদড়ি
সব ঘুচিয়ে তরীতে তোর
ভরবে সারাৎসার।
এ ঘাটে নিতাই কর্ণধার॥

কাণ্ড ভাখো পাগল অবধূতটার। চোদ্দ বছর বয়সে ঘরছাড়া, সংসার চেনে না, সমাজ চেনে না, সন্ন্যাসীর দলে ভিড়ে চীরমাত্র সম্বল করে পথে পথে ঘুরে বেড়ায়। স্ত্রীপুরুষের ভেদজ্ঞান নেই, বিন্দুমাত্র লাজলজ্জা নেই, যখন তখন কৌপীন খসিয়ে নাঙ্গা হয়ে নাচে। সে কিনা নবদ্বীপে এসে দণ্ডী ভাসাল, দিব্যি সংসার পেতে বসল, গোঁসাই সেজে সমাজে এসে জমাল।

কেমন সে সংসার? কেমন সে সমাজ? পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীর বাংলার ছিন্নভিন্ন হিন্দু সমাজ। বল্লালী নিদানে উচ্চনীচের কঠোর ভেদ,—জাতিভেদ, বর্ণভেদ, শ্রেণীভেদ। ভেদের শৃঙ্খলই সমাজের অলঙ্কার। ধর্ম বলতে পুরাণ আর স্মার্ত পণ্ডিতের ব্যাখ্যা। ধর্মের নামে লোভ, অনাচার আর পরপীড়ন,—ধর্মের নামে মানুষে মানুষে বীভৎস হিংস্রতা।

যাদের ধর্মে ভেদ নেই, তারা বৌদ্ধ। ভেদ নেই বলেই তারা সবার নীচুতে। তারা আচারভ্রষ্ট সমাজভ্রষ্ট, অস্পৃশ্য বিধর্মী। সহজিয়ার সহজ টানে অন্ধকার আবর্তে তারা ডুবন্ত।

আসল বিধর্মী যারা তারা মুসলমান। এই আত্ম-অচেতন জাতির বিজাতীয় শাসক। উচ্চবর্ণের হিন্দুসমাজ ধর্মের গর্বে মুসলমান শাসকের দিকে নাক সিঁটকোয় আবার ঠেকায় পড়ে লোভে পড়ে সেই নাক সেই শাসকের পায়ে ঘসে। আর ঐ হিন্দু উচ্চবর্ণের অত্যাচারে অবহেলায় হাজার হাজার নিরুপায় বৌদ্ধ আর নিম্নশ্রেণীর হিন্দু মুসলমান হয়ে আত্মরক্ষার পথ খোঁজে।

পান্ধারপুরের মন্ত্র বুকে নিয়ে নিত্যানন্দ ফিরে এলেন বাংলায়। অগ্রজ হয়ে শ্রীচৈতন্যকে বার করলেন ভক্তিপথের পরিক্রমায়।

ভক্তিই প্রেম, ভগবৎভক্তির রোমাঞ্চ-প্রেরণায় প্রেমের সঞ্চার,—ভক্তিই জাতিকে বাঁধবে, প্রেমই জাতিকে এক করবে। আচণ্ডালে দিবে কোল, বল হরি হরি বোল। এই মন্ত্রের পরীক্ষা কোথায়? সমাজে সংসারে। তাই নিত্যানন্দকে সংসারবাসী হতেই হবে। সংসার ছাড়া দুঃখ কোথায়? দুর্গতি কোথায়? সমাজ ছাড়া ঘৃণা কোথায়, পাপ কোথায়?

জগৎ যারে ত্যাগ করে
নিতাই তারে বুকে ধরে।
অদৃশ্য অস্পৃশ্য বলে
জগৎ যারে দূরে ঠেলে,
ভয় নাই তোর, আছি বলে
নিতাই তারে রাখে কোলে॥

নিত্যানন্দ পারেননি। প্রাণপণ চেষ্টা করেছিলেন বালির বাঁধ বাঁধতে। নিম্ন শ্রেণীর মানুষকে ধর্মের আশ্রয়ে রক্ষা করতে, এক করতে। হিন্দু সমাজের অবক্ষয়কে রোধ করতে। কিন্তু রাঢ়ের লোক, গঙ্গাতীরে আগন্তুক,—কতোটুকু তাঁর সাধ্য? শেষদিন পর্যন্ত মাটি কামড়ে ছিলেন, হাল ছাড়েননি। মেরেছিস কলসীর কানা, তাই বলে কি প্রেম দিব না?

চৈতন্যদেবও পারেননি তাঁর ভাবাবেগকে বাংলার গণমানসে সঞ্চারিত করতে। ভক্তির সঙ্গে ঐক্যের, ঐক্যের সঙ্গে বীর্যের যে সংমিশ্রণ তিনি ঘটিয়েছিলেন তা দেখে রুষ্ট হয়েছিল মুসলমান শাসক, শঙ্কিত হয়েছিল হিন্দু শাসিত। তারা একসঙ্গে মিলে তাঁকে বাংলা থেকে তাড়িয়েছিল। বাংলার সমাজ-সংসার থেকে বহু দূরে নীলাচলে তাঁর নির্বাসিত সন্ন্যাসী জীবন কেটেছিল।

ভারতবর্ষ বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের সাধনা করেছে, এ কথা বাঁধা বুলি মাত্র। আসলে ভারতের সমাজ নিত্যকাল ধরে একটি সাধনাই করেছে, বিভেদকে পাকিয়ে তোলার বজায় রাখার সাধনা।

সমাজ আমাদের রূঢ় শিক্ষা দিয়েছে। বিভেদের বেড়াজাল তুলে তুলে ইতিহাসের সম্ভাবনাকে যুগে যুগে ব্যর্থ করে দিয়েছে। আর সেই বিভেদের পূর্ণ সুযোগ নিয়েছে বিদেশী শাসকের দল।

চেরিল শুধিয়েছিল গোখলেজীকে,—

এতো সাধনা এতো আয়োজন ব্যর্থ হোলো কেন? শিবাজীর নিশান ধূলোয় লুটিয়ে গেল কেন?

গোখলেজী বলেছিলেন,—

ব্যর্থ হয়নি চেরিল। ইতিহাসের কোনো শিক্ষাই ব্যর্থ হয় না। পরবর্তী নায়করা তাঁর প্রেরণাকে মহারাষ্ট্রের গণ্ডী ছাড়িয়ে সারা ভারতবর্ষে ছড়িয়েছিলেন। আবার সেই নায়করাই রাজ্যকে শুধু ভাগ করেননি, জাতির একাত্মবোধকে বর্ণ আর শ্রেণীর ভাগে টুকরো টুকরো করেছিলেন। এই হাজার বিভেদের দেশে জাতীয় ঐক্যের কতো প্রয়োজন আর সেই ঐক্যকে বজায় রাখা কতো শক্ত মহারাষ্ট্রের ইতিহাসই তা শিখিয়েছে।

নাথুরাম বলেছিল,—সে শিক্ষা আমরা কখনো পাব না গোখলেজী?

বলো কী? ইতিহাসের শিক্ষা কি এক দিনের এক বছরের এক শতাব্দীর শিক্ষা? এই শিক্ষা যুগে যুগে জাতির কানে বাজে,—সুদিনে বাজে, দুর্দিনে বাজে। সেই শিক্ষা পেয়েছি বলেই তো আজও আমরা বেঁচে আছি।

কার কাছে পেলাম আবার?

কানাইলালের প্রশ্ন!

ইতিহাসের অধ্যাপক গোখলেজী হাসলেন।

শিবাজী মহারাজের পর আর এক মহারাজের কাছ থেকে। তিনি শুধু মারাঠার মহারাজ নয়, সারা ভারতবাসীর মহারাজ। তাঁকে চেনো না? গান্ধী মহারাজ। এই মহারাষ্ট্রেই তাঁর রাজধানী। এক পিপুল গাছের নিচে রুক্ষ মাটির বুকে তাঁর রাজসিংহাসন। নাম শোনোনি সেবাগ্রামের?

হঠাৎ চকচক করে উঠল চেরিলের চোখ। মনের ভাবকে মনে চেপে মূক হয়েই সে রইল।

আমিও আলোচনায় যোগ দিইনি, নীরবে শুনছিলাম। গোখলেজীর কথায় আমার মন ভরে গেল।

মহারাজই বটে। সারা পরাধীন জাতির মহারাজ গান্ধী মহারাজ। ছুত আর অচ্ছুত, উচ্চ আর ব্রাত্য, ধনী আর দরিদ্র—সকল মানুষকে যিনি ডেকেছেন, বিভেদ-বিচ্ছিন্ন সকল মানুষকে যিনি বেঁধেছেন। ত্রস্ত দীন ভারতবাসীকে মুক্তির মন্ত্রে যিনি সঞ্জীবিত করেছেন। খণ্ড ছিন্ন বিক্ষিপ্ত ভারতকে এক মহারাষ্ট্রে পরিণত করেছেন। জাতির জনক তিনি।

জানিনে, শুধু ভয় করে। এই মহারাষ্ট্র কি আবার অদূর কালে খণ্ড ছিন্ন বিক্ষিপ্ত হবে? ইতিহাসের শিক্ষা কি আবার আমরা ভুলে যাব?

এলোমেলো ভাবনার ভাঁটায় ভাসছিলাম,—টেনে তুলল নাথুরাম। কখন্ সে এসেছে, পেছন থেকে লক্ষ করেছে আমাকে। কাছে এসে পিঠে খোঁচা দিয়ে কানের কাছে হাঁক মেরেছে,—

দাদা?

অ্যাঁ? কে, নাথুরাম?

আজ্ঞে, নাথুরাম ছাড়া আর কে? তা ঘাটে বসে কী হচ্ছে দাদা? এদিকে সারা তল্লাটে আপনাকে যে আমরা গরুখোঁজা করছি!

গরুখোঁজা? গরু তো মাঠে চরে, ঘাটে তাকে পাবে কী করে?

ইস্! মুখ ফসকে বলে ফেলেছি দাদা, ঘাটে এসে ঘাট মানছি।

নাকে কানে হাত দিল নাথুরাম।

আমি হেসে বললাম,—ব্যস ব্যস, খুব হয়েছে। তা মাঠেই বা কেন ঘাটেই বা কেন? আমি তো আছিই!

সপ্রতিভ নাথুরাম সামলে নিল নিজেকে। খুব হৃষ্ট হয়ে বললে,—

কোথায় আছেন? সবাই মন্দিরে গিয়ে জমিয়েছে। আর আপনি কিনা এখানে একলা চুপটি করে গালে হাত দিয়ে বসে! উঠুন উঠুন, —মন্দিরে চলুন।

হাত ধরে তুলে হিড়হিড়িয়ে টেনে নিয়ে চলল নাথুরাম।

আজ সন্ধ্যাবেলা মন্দিরের সামনের চেহারাই বদলে গেছে। ভিড় অনেকটা কম। কিন্তু জলুস অনেক বেশি। রাস্তার ওপরকার রোশনাই কিছুটা ম্লান, তবে মন্দিরের দরজায় নতুন আলোর মালা। নামদেবের পেতলের মুখটা জ্বলজ্বল করছে। চোখামেলার সমাধির সামনে বেশ কয়েকটা ঝকঝকে মোটরগাড়ি। এমনি গাড়ি এখানে এ পর্যন্ত চোখেই পড়েনি।

সিঁড়ি পার হয়ে মন্দিরে ঢুকতেই নতুন রকমের আলোকসজ্জা জয়-বিজয় মূর্তির মাথায়, প্রত্যেকটা দীপস্তম্ভে। সামনে লাল শালুমোড়া উঁচু তোরণ, তার ওপর সানাই-বাঁশি। চাতালে ভিড় নেই বললেই হয়। তবু সার সার রক্ষী, হাতে পেতল-বাঁধানো লাঠি, গায়ে তকমা-লাগানো ইউনিফর্ম। পুরোহিত আর সেবকরাও প্রত্যেকে শাদা পিরাণের ওপর হলুদ চাদর পরে সুসজ্জিত।

ষোড়শস্তম্ভ মণ্ডপের সামনে প্রহরীর পাহারা। যাতায়াত অবারিত নয়। নাথুরাম প্রহরীকে কী যেন বলল,—তারপর আমাকে নিয়ে দ্রুত এগোলো কোনোদিকে না তাকিয়ে।

আমি শুধোলাম,—ব্যাপার কী নাথুরাম?

দারুণ ব্যাপার,—একেবারে স্পেশ্যাল ব্যাপার দাদা!

তার মানে? রাস্তার ওপর মস্ত মস্ত মোটরগাড়ি,—এতো পাহারাদার,—আগে তো এমন চোখে পড়েনি!

সাঙ্গলি থেকে মস্ত এক শেঠ এসেছেন দাদা! আগে তো রাজা জমিদাররা আসতেন,—এখন আসেন শেঠরা। এ শেঠ কাপড়কলের মালিক। লোকলস্কর অনেক এসেছে সঙ্গে,—ঐ সানাইওয়ালারাও। পুজো দিয়েছেন পাঁচ হাজার এক টাকার!

কবে?

আজ সকালে। বিরাট পূজো, তারপর অঢেল ভাণ্ডারা। চাঙারির পাহাড়। দলে দলে লাইন করে লোক দাঁড়িয়েছে,—আর প্রত্যেকের হাতে তুলে দিয়েছেন এক একটা চাঙারি। চাঙারি ভর্তি দামী দামী মেঠাই!

অ্যাঁ? আমরা তখন কোথায়?

আমরা তখন গোপালপুরে। শালপাতা চেটে চেটে আলুনি খিচুড়ি খাচ্ছি!

তাহলে এখন?

এখন সন্ধ্যা-আরতির জন্যে অন্তরালে প্রভু সাজছেন আর শেঠ-শেঠানারা দেখছেন। মহারাজকে দেখলাম খুব খাতির করেন,—সেই খাতিরে সজ্জাদর্শনের সুযোগ আমরাও পেয়েছি। চলুন, দেখবেন চলুন।

বিট্ঠল-বিগ্রহের স্নান-সজ্জা সাধারণ দর্শকদের অগোচরে। মণ্ডপ আর অন্তরালের দ্বার রুদ্ধ। হাতদ্বারের সামনে বন্দুক হাতে প্রহরী। নাথুরাম তাকেও আবার কী বলল,—সে আমাদের পথ ছেড়ে দিল।

গর্ভগৃহের একেবারে সামনে যাঁরা বসে আছেন তাঁরাই যে শেঠজী আর তাঁর পরিবারবর্গ তা বুঝতে অসুবিধে নেই। তাঁদের পেছনে একপাশে পূর্ণচৈতন্য, চেরিলের কাঁধে তাঁর হাত। ঠিক তার পাশে কানহাইয়ালাল। একধারে গোখলেজী। বৈকুণ্ঠভাইও উপস্থিত। আরো কয়েকজন সম্মানী ভক্ত। আমরাও আসন নিলাম।

পূজারীরা নিবিষ্টমনে তাঁদের কাজ করে চলেছেন। বৈকালিক অঙ্গসেবা এইমাত্র সম্পূর্ণ হয়েছে। তেল আর আতরের সুগন্ধে সব ভরে রয়েছে। সেই সুবাসে মিশেছে ধূপের সুরভি। বিগ্রহের নিম্নাঙ্গ বিচিত্র বসনে সজ্জিত হয়েছে। সবুজ কিংখাবের ওপর জড়োয়ার কাজ করা কৌপীন, কোমর থেকে প্রায় হাঁটু পর্যন্ত সামনে ঝোলানো,—তার নিচে একই রঙের রেশমের স্বচ্ছ বস্ত্র। পেছন

দিকে পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত প্রলম্বিত সোনালি-হলুদ বহির্বাস। ঊর্ধাঙ্গে কোনো আবরণ নেই,—শ্যামকান্তি বিশাল বক্ষে চন্দনের পুষ্পশোভা। শিরস্ত্রাণ পর্যন্ত সমস্ত কপাল জুড়ে চন্দনের ত্রিভুজ এঁকে দিচ্ছেন পূজারী, চোখের পাতায় আর ভ্রূতে পরিয়ে দিচ্ছেন কাজলের রেখা।

কারো মুখে কথা নেই। শুধু চুপ করে দেখা। সেই স্তব্ধতার মধ্যে চেরিল ফিসফিসিয়ে উঠল,—লুক বাপ্পা লুক!

আমরা সচকিত হয়ে উঠলাম।

বিরাট একটা পেতলের থালা দুদিক থেকে দুই-দুই চার হাতে ধরে বিগ্রহের সামনে বয়ে নিয়ে এলেন দুজন পূজারী, লাল বস্ত্র দিয়ে থালাটা ঢাকা। ঢাকা সরিয়ে সেই থালা থেকে তুললেন একটা মোটা দড়ি,—খাঁটি সোনার তৈরি। হলুদ বিদ্যুৎশিখার মতো চোখ ধাঁধিয়ে দিল। স্বর্ণরজ্জুর মাঝখানটি উঁচু করে তুলে বিগ্রহের বাঁ কাঁধে ঝুলিয়ে দিলেন পুরোহিত। তারপর দুটি দিক পিঠ আর বুক ঘুরিয়ে এনে কোমরের ডানদিকে বেঁধে দিলেন।

নাথুরাম নিচু গলায় বললে,—

বুঝলে কিছু?

না তো। কী ওটা?

বিট্‌ঠলদেবের উপবীত, সোনার উপবীত।

শেঠ উঠে দাঁড়ালেন। পাশে দাঁড়ালেন শেঠানী। শেঠের হাতে একটি সোনার হার। সেই হারটি তাঁরা পুরোহিতের হাতে দিলেন। অলঙ্কারটি শোধন করে পুরোহিত বিগ্রহের গলায় পরিয়ে দিলেন, শেঠ-শেঠানী আভূমি নত হয়ে প্রণাম করলেন।

বুঝলাম সারা মন্দির-চত্বরে এতো প্রহরীর সমাবেশ কেন। তাদের আজ দায়িত্বপূর্ণ ডিউটি। শেঠ-শেঠানীর অনুরোধে আজ বিট্‌ঠলদেবের রাজাধিরাজ বেশ।

একের পর এক করে পুরোহিতরা অন্তরালে আসতে লাগলেন।

প্রত্যেকের হাতে বড়ো বড়ো থালা বা পেটিকা। অজস্র অলঙ্কার। সোনার সঙ্গে মণিমাণিক্য। দেবতা সাজতে লাগলেন। কতো রকমের কণ্ঠাভরণ,—হার, সীতাহার, সাতনরী, চিক,—হারের পর হার। এইসব হার এক একটি করে বিগ্রহের গলায় তুলতে লাগল,—কণ্ঠ থেকে নাভি পর্যন্ত সমস্ত উর্ধ্বাঙ্গ শুধু সোনায় আর মণিমুক্তায় ভরে গেল। তারপর তুটি বাহু। কতো অলঙ্কারে বিগ্রহের তুই বাহু সজ্জিত হোলো। তারপর বিগ্রহের শিরোদেশ। শিলামুকুটের ওপর চড়ল হিরণমুকুট। মুকুটের মাঝখানে জ্বলন্ত একটি মরকত মণি।

কষ্টিপাথরের বিট্‌ঠল-বিগ্রহ। স্বর্ণভূষণে সজ্জিত হয়ে সোনার রূপ ধারণ করেছেন। মাথা থেকে পা পর্যন্ত সোনায় মোড়া।

পঞ্চপ্রদীপ জ্বলল। আমরা উঠে দাঁড়ালাম। প্রদীপের আলো রত্নে রত্নে বিকীরিত হয়ে চোখ ধাঁধিয়ে দিল। বিট্‌ঠলদেব আলোক-রশ্মির রূপ পরিগ্রহ করলেন। বিস্ফারিত অপলক চোখ মেলে আমরা আরতি দেখলাম। মেঘগম্ভীর ডম্বরুর সঙ্গে ধ্বনিত হোলো আরতি-সংগীত,—

অষ্টাবিংশ যুগ ধরে বামেতে রুক্মিণী লয়ে
পাণ্ডুপুরে বিট্‌ঠল বসতি।
পুণ্ডলিক পিতৃপূজা দর্শন পুলক লাগি
কঠিন বিটের পরে স্থিতি॥
অঙ্গে দোলে পীতাম্বর কপালে চন্দনশোভা
কণ্ঠে দোলে তুলসীর মালা।
বক্ষের কৌস্তুভ মণি চন্দ্রসূর্য জ্যোতি জিনি
বিশ্বের নয়ন করে আলা॥
চন্দ্রভাগা নদীতীরে গৈরিক কেতন লয়ে
ভক্তগণ সবে মিলি ধায়।
আষাঢ় কার্তিক মাসে একাদশী তিথিপাশে
বিট্‌ঠল বন্দনাগান গায়॥

পরম ভকতি ভরে পঞ্চেন্দ্রিয় দীপ জ্বালি
নৃত্যসহ করিছে আরতি।
হে বিট্ঠল হে প্রাণেশ প্রিয় প্রভু পাণ্ডুরঙ্গ,
তব পদে রহে যেন রতি॥

॥ ৩২ ॥

দেখতে দেখতে সাতটি মাস কেটে যাবে। কুয়াশাভরা হেমন্তের পর পাতাঝরা শীত, দেখনহাসি বসন্ত আসতে না আসতেই ফুটিফাটা গ্রীষ্মের মাটি। তারপর আকাশে ঘন মেঘের মেলা। আষাঢ় ঘনিয়ে আসতে দেরি হবে না।

সারা মহারাষ্ট্র জুড়ে তখন আবার চলিচলি রব উঠবে। পূব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ সব দিকে সাড়া জাগবে। কোঙ্কন, দেশ মারাথবাড়া বিদর্ভ সব অঞ্চল জেগে উঠবে। আষাঢ়ী যাত্রার জন্যে নানান দিক থেকে নানান দল এসে জুটবে। টগবগ করবে উৎসাহে।

বর্ষাকে ডরায় না বারকরীরা। যখন বিরহিণীর কালো চুলের মতো সারা আকাশ ভরে যায় কালো মেঘে, ক্ষরা খেতে বৃষ্টি ঝরে আশীর্বাদের মতো, নবপ্রসূতির স্তনের মতো ভরন্ত হয় নদীর বুক,—তখন বিট্ঠল-বাঁশরীর আহ্বানে বারকরীরা পথে নেমে আসে। জওয়ারের খেতে লাঙল ঠেলার অবশ্য-কর্তব্যকে পরিহার করে ছুটির নেশায় মাতে।

আষাঢ় মাসের একাদশী তিথিতে আবার পান্ধারপুরে উৎসব। এই দিনেই পান্ধারীনাথ অবতীর্ণ হয়েছিলেন পুণ্ডলিকের কুটীরের সামনে। কার্তিকের উৎসবের চেয়ে এই উৎসব প্রাচীনতর। এই তিথিতেই পান্ধারপুরে প্রথম বিট্ঠল-দর্শন করেছিলেন জ্ঞানেশ্বর আর নামদেব।

সারা মহারাষ্ট্রের পথ আবার এক পথ হয়ে যাবে। এই পথে

বারকরীরা হাঁটবে। আকাশ ভরে যাবে তাদের নামগানে,—জয় জয় বিট্‌ঠল রামকৃষ্ণ হরি।

কতো চেনা মুখ। পথে পথে চেনা, পান্ধারপুরে চেনা। একে একে বিদায় নিচ্ছে সবাই,—আষাঢ়ী তিথিতে আবার তারা এসে মিলবে। রাস্তার মোড়ে সন্থ বিদায়বাণী উচ্চারণ করে ঐ যে গোখলেজী চললেন স্টেশনের দিকে,—পথের বাঁকে মিলিয়ে গেল তাঁর চেহারা। পুণায় পৌঁছে সাত মাস ব্যস্ত থাকবেন অধ্যয়ন আর অধ্যাপনা নিয়ে। তারপর আলন্দীর বারকরী দলে ভিড়বার জন্যে ছুটি নিয়ে অপেক্ষা করবেন শিবাজী-উন্থানে। তাঁর ছেলে ফিল্‌ম ইনস্টিটিউটের ছাত্র, খুব ভালো ছবি তোলে। ছেলের ক্যামেরাটা সঙ্গে আনেননি বলে এবার আপসোস করেছেন,—আগামী বার আর ভুল হবে না।

নাথুরাম তো আমার সামনেই বারকরীব্রত নিয়েছে। সহজে ব্রতভঙ্গ করার লোক সে নয়। আষাঢ়ী যাত্রায় সেও নিশ্চয় যোগ দেবে। তবে এবার নতুন রাস্তায় হাঁটবে। সজ্জনগড়ের কাছে তার বাড়ি। হয়তো সে যাত্রা শুরু করবে সজ্জনগড়ের রামমন্দির থেকে। রামদাস স্বামীর পাতুকা অনুসরণ করে সে আসবে।

পৈঠানের বারকরীদলের মুখ্য পরিচালক হয়ে এসেছেন দেশপাণ্ডেজী। প্রতিবারই আসেন,—বুকে করে আনেন একনাথের পাতুকাকে। আগামী যাত্রায় মনে হয় তাঁর যাত্রা দীর্ঘতর হবে। বাখ্‌রিতেই এই নিয়ে আলোচনা হয়েছিল। জনার্দন স্বামীর পাতুকা আসে গোদাবরীর আরো উত্তরে দৌলতাবাদ থেকে। এবার সেই যাত্রায় কিছু শৃঙ্খলার অভাব ছিল। তাই এই অভিজ্ঞ পরিচালকের কাছে অনুরোধ হয়েছিল, তিনি যেন আগামীবার জনার্দন স্বামীর পাতুকাযাত্রার ভার নেন। দৌলতাবাদ থেকে আগন্তুক দলের দায়িত্ব এবার হয়তো তাঁর ওপর পড়বে।

কেবল যারা বারকরী নয়, তারা আসবে না। আসবে না বন্ধু কানহাইয়ালাল।

বাবার পাশে আমি থাকব, বাবাকে নিয়ে থাকব,—কানহাইয়ালাল হেঁকেছিল।

মহারাজ রাজি হননি। প্রসন্ন অথচ ক্লান্ত গলায় বলেছিলেন,—সে একটা কথা হোলো? আমার জন্যে তোমার ধর্ম ছাড়বে?

ধর্ম ছাড়ব? তার মানে?

বুঝতে পারছ না? বুঝিয়ে বলছি। পা ছড়িয়ে বেশ তো কদিন বসেছ,—আর নয়। এবার উঠে দাঁড়াও, ঝুলি নাও কাঁধে,—নতুন পথে এগোও। পথই তোমার ভগবান, চলাই তোমার ধর্ম।

পাশে ছিলেন বৈকুণ্ঠভাই। মুখ ফিরিয়ে নিচু গলায় বললেন,—স্রেফ বসে থাকাই কিন্তু একটা লোকের ধর্ম মহারাজ। তার দিকে একটু চোখ তুলে তাকাবেন?

বসে থাকা ধর্ম? কার? কে সে?

এই অভাজন মহারাজ, আমি। ঐ যে পুণ্ডলিক মন্দির, ওখানে বছরের পর বছর আমি বসে থাকি। বারকরীর দল আসে বছরে দুবার করে, বিট্‌ঠলদর্শনের আগে পুণ্ডলিকমন্দিরে যায়,—আমি তখন একবার করে উঠে দাঁড়াই, হাত বাড়িয়ে বলি,—এসো এসো।

বৈকুণ্ঠভাইএর ধর্ম কানহাইয়ালালের ধর্ম নয়। তাই মহারাজের কথা শুনে সে খাড়া হয়ে উঠে দাঁড়াল। মহারাজের পায়ের ধূলো নিল, আমাদের সঙ্গে কোলাকুলি করল, দুহাতে একবার ধরে নিল চেরিলের হাত। তারপর সোজা হাঁটা দিল নদীর দিকে। সোনালি পাড় ছাড়িয়ে হাঁটুজলে নোঙর ফেলেছে নৌকো।

আমি জানি লোকটা ঐ রকম। ত্বু পেছনে পেছনে ছুটে গেলাম,—চিৎকার করে উঠলাম,—

কোথায় যাও কানহাইয়ালাল?

থমকে দাঁড়াল। চওড়া করে হাসল।

বলব কেন?

তার মানে?

বাঃ, যেতে হবে তাই যাচ্ছি। কোথায় যাচ্ছি তা এখন বলব কী করে ?

কবে বলবে কানহাইয়ালাল ?

চড়ে বসল পারাপারের খেয়ানৌকায়। কাঁধের ঝুলিটা গলুইএর ধারে নামাল। গা তুলিয়ে হাত নেড়ে হেঁকে বললে,—

বলব বৈকি দাদা,—আবার যখন দেখা হবে তখন বলব।

দেখা হবে নাকি ? আবার কোনোদিন হাঁটব নাকি ঐ উদাসীন পথিকটার পাশে পাশে ? মুণ্ড মহারণ্যে হেঁটেছি, হেঁটেছি বারকরী যাত্রায় ? আবার হাঁটব ? বার বার তিনবার ?

তোমার ঘর নেই কানহাইয়ালাল, শুধু পথ আছে। আমার ঘরও আছে, পথও আছে। ঘরকে যেমন ভালোবাসি, পথকেও ভালোবাসি তেমনি। পথের নেশা মিটলে ঘরের টানে ফিরে আসি। পথ আবার হাতছানি দেয়। স্থয়োরাণীর বাসরশয্যায় বসে তুয়োরাণীর জন্মে মন কেমন করে।

পথের রহস্য কতোটুকু বা জানলাম এ পর্যন্ত ? পথ কতো দীর্ঘ, কতো চওড়া,—আবার কতো বঙ্কিম বিসর্পিল পাকদণ্ডী ! পথের পর অসংখ্য পথ। কতো পথে চলা এখনো বাকি। সেই অফুরান পথের কোনো অচিন বাঁকে তোমার দেখা আবার মিলবে ? বার বার তিনবার ?

আসন্ন আষাঢ়ী উৎসবে বারকরীরা আসবে। তাদের পায়ে পা মেলাবেন না পূর্ণচৈতন্য,—গলা মেলাবেন না তাদের গানে। পূর্ণচৈতন্যের চলা শেষ,—পুণ্ডলিকমন্দিরে শেষ জীবনের আশ্রয়। এই নদীর তীরে ভিড় জমাবে চেনা অচেনা কতো। বৈকুণ্ঠভাইএর পাশে দাঁড়াবেন তিনি। তুজনে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে বারকরীদের অভ্যর্থনা করবেন, গলা বাড়িয়ে একসঙ্গে বলবেন,—

এসো এসো।

সে ডাক আমি শুনব না।

ঐ বারকরীদের পাশে আমি আর থাকব না। তাদের গলায়

গলা মিলিয়ে তাদের পায়ে পা মিলিয়ে আমি আর চলব না। পান্ধারপুরে বিট্‌ঠলমুখ আর আমি দর্শন করব না। বারবার যাত্রার বারকরীব্রত আমার জন্যে নয়। আমি একবারের যাত্রী। একটি বারের তীর্থভ্রমণের সুফল আমি কুড়িয়ে নিয়েছি।

কী আমার সুফল ?

এই মহান দেশের শ্রেষ্ঠ সাধক-প্রেমিকরা যে পথে হেঁটেছেন সেই পথে আমি হেঁটেছি, যে ধূলিতে তাঁদের পদরেণু মিশে আছে সেই ধূলি আমি অঙ্গে নিয়েছি, যে গান তাঁরা গেয়েছেন সেই গানে ভরেছি আমার বুক। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে যে পথ বেয়ে লক্ষ লক্ষ যাত্রী দেবতার চরণে পৌঁছেছে, হাজার যাত্রীর পায়ে পা মিলিয়ে সেই বাঞ্ছিত-সন্নিধানে আমিও পৌঁছেছি।

অভঙ্গ গান শুধু কণ্ঠে জাগেনি, মৃদঙ্গছন্দ শুধু পায়ে জাগেনি, সমস্ত অন্তর জেগেছে গণমানুষের আত্ম-উজ্জীবনের আন্দোলনে। সে মানুষ কি ধনী, সে মানুষ কি কাঙাল ? সে মানুষ কি উচ্চ, সে মানুষ কি ব্রাত্য ? সে মানুষ কি পণ্ডিত, সে মানুষ কি নিরক্ষর ? সে মানুষ সকল মানুষ।

দেবতার জয়গানে শ্রবণ ভরে সকল মানুষের জয়গান আমি শুনেছি। উপলব্ধি করেছি ঐ দেবতা সকল মানুষের দেবতা,—ঐ দেবতার পূজামন্ত্রে নিহিত আছে জাতির আত্মশক্তি।

ডাক শুনে ধড়মড়িয়ে উঠে বসলাম।

একি ? চেরিল, তুমি ?

কেন সখা, আসতে নেই ?

না, না, তা কেন ? আমি তো ভাবছিলাম তোমাদের খোঁজেই বেরোবো !

চেরিলের হাসিতে ঠাট্টার ছোঁওয়া।

আহা-হা! ভর সন্ধ্যেবেলা নাক ডাকিয়ে ঘুমোতে ঘুমোতে

আমাদের কথা ভাবছিলে বুঝি ? না, স্বপ্ন দেখছিলে ? স্বপ্নটা ভেঙে দিলাম তো ?

তোমারই স্বপ্ন দেখছিলাম চেরিল, সত্যি বলছি। দিনের বেলাকার স্বপ্ন তো সত্যি হয় না,—তাই ছাখো, ঠিক সত্যি হয়ে তুমি এলে !

আমার ধর্মশালার ঘর,—দড়িবাঁধা খাটিয়ায় আড় হয়ে শুয়ে কখন জড়িয়ে এসেছিল চোখ। ঘুমের মধ্যে ঘুঘু-ডাকা তুপুর কখন পার। হাত-পা টানটান করে তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ালাম।

মেঝে ভর্তি ধুলো, জানলার গরাদের সঙ্গে উল্টোদিকের পেরেক পর্যন্ত শনের গিঁটবাঁধা দড়ি। কবে কোন্ যাত্রী রান্না করে গিয়েছিল, —একদিকের দেয়াল জুড়ে কালি। এই রিক্ত ঘরে চেরিলকে বসাতে আমার লজ্জা। বললাম,—চলো, বেরোবে নাকি ?

বাঃ, তোমাকে নিয়ে বেরোবো বলেই তো এলাম। পাশের শূন্য খাটিয়াটার দিকে তাকিয়ে বললে,—কানহাইয়ালাল নেই, তুমি বেচারী একেবারে একলা ! এসে ভালো করিনি ?

খুব ভালো করেছ চেরিল। অনেক ধন্যবাদ। নাথুরাম কোথায় ?

পুত্তলিকমন্দিরে। বাপ্পাকে ঘিরে খুব হৈচৈ চলেছে ! আমি সরে পড়েছি গুটিগুটি। একটা উপকার করবে ?

বলো চেরিল।

তোমাদের এই ধর্মশালার কলঘরে একটু চান করে নিতে দেবে ? তোয়ালে চিরুনি সব আমার ব্যাগেই আছে।

চেরিলের স্নানের অবসরে পেরেক থেকে জামাটা টেনে নিয়ে পরলাম, পা-তুটো পুরলাম চপ্পলের খোঁদলে। আঙুল দিয়ে টেনে টেনে সজুত করলাম মাথার এলোমেলো চুল।

তারপর ধর্মশালা থেকে তুজনে বার হয়ে এলাম।

কতোদিন পাশাপাশি হেঁটেছি, আজ শেষ হাঁটা। কাছাকাছি কাটিয়েছি কতো সন্ধ্যা, শেষ সন্ধ্যা আজ। কতোদিন চলেছি দলে

বলে,—আজ শুধু চেরিল আর আমি। বললাম,—আজ দুজনে কিন্তু খুব বেড়াব, অনেক গল্প করব। তাড়াতাড়ি নেই তো?

কীসের তাড়াতাড়ি সখা? তাড়াতাড়ি থাকলে দল ছেড়ে আসতাম?

পশ্চিমে সূর্য ডুবছে। শরৎ আকাশের ভাঙা মেঘ লালে লাল। তার আভা সামনের মন্দিরশোভায়, সদ্যস্নাত চেরিলের চুলে। একটু পরে অন্ধকার নামবে।

খুব ঘুরে বেড়ালাম দুজনে। মন্দির দেখলাম, বাজার দেখলাম, উঁকি মেরে দেখলাম রাজবাড়ির দেউড়ি। একটি জিনিষও না কিনে কষে দরদস্তুর করলাম দোকানে দোকানে। তারপর অন্ধকার নামতে পূর্বদ্বারের মাথায় মাথায় আলো জ্বলল, কানে এল গর্ভগৃহের আরতি-ধ্বনি।

আমরা মন্দিরের সামনে চোখামেলার সমাধির চাতালে পা ঝুলিয়ে বসলাম।

কালই তুমি চলে যাবে, না চেরিল?

হ্যাঁ সখা, তুমিও তো,—তাই না?

ঠিক।

আর কখনো এখানে আসব না,—তুমিও না, আমিও না। আর আমাদের কখনো দেখা হবে না,—তাই না?

আমি মৃদু হাসলাম।

হলেই হোলো? আমরা তো বারকরী নই। যাত্রা শেষ,—এবার যে যার পথের পথিক। তারপর?

তারপর নেই। তারপরের কোনো কথা নেই,—চেরিলের মুখে নেই, আমার মুখে নেই। কেমন-করা মন নিয়ে নামদেবের সমাধির দিকে তাকিয়ে শুধু চুপ করে থাকা।

মুখে না বলি, মন যে বলতে চাইছে। এখন বিট্‌ঠলের জয়গান নেই, কানহাইয়ালের ধমক নেই,—এখন শুধু বাঙাল সখা আর

প্রেমের দূতী পাশাপাশি। কটি ঘণ্টার সঙ্গযাপনের পর চিরদিনের ছাড়াছাড়ি। সাগরপারের বিদেশিনী, ক-দিনের জন্যে এদেশে এসেছ, টুরিস্টপ্রিয় ভারতদর্শনের বদলে বারকরী ভ্রমণের খেয়ালে মেতেছ,—এ মতি তোমার কেন হোলো, একটু অন্তত জানিয়ে যাও।

হঠাৎ চেরিল বললে,—এই ছাখো, তোমার দেওয়া মালা পরে আছি,—সেই আলন্দীতে দিয়েছিলে। আমি একটি জিনিস তোমাকে দেব,—এই নাও!

ঝুলি থেকে বার করল একটা বাঁধানো বই। চোখামেলার সমাধির মাথায় জ্বলজ্বলে আলো। মলাট উলটে নাম পড়তে অসুবিধে হোলো না। মহীপতির মারাঠী গ্রন্থ ভক্তলীলামৃত অবলম্বনে ইংরেজিতে লেখা তুকারামের জীবনী। লেখক ডক্টর জাস্টিন অ্যাবট।

ডক্টর জাস্টিন অ্যাবটের নাম আমার অচেনা নয়। মিশনারীর ছেলে মিশনারী, অ্যামেরিকায় জন্ম হলে কী হয় শৈশব থেকে প্রৌঢ়-কাল পর্যন্ত কাটিয়েছিলেন আমাদের দেশে। এদেশেই শিক্ষা,—কর্মও এদেশেই, পুণার অ্যামেরিকান মিশনে। ভারতবাসীদের খৃষ্টধর্মে ভজাবার জন্যে ব্যাকুল ছিলেন না, বরং চেয়েছিলেন ভারতীয় জীবনাদর্শ ও ধ্যানধারণার সঙ্গে একাত্ম হতে। ভারতের ইতিহাস দর্শন আর ধর্মসাহিত্য তিনি একাগ্রতার সঙ্গে অধ্যয়ন করেছিলেন। বিশেষ করে মধ্যযুগের সন্তবাণী তাঁর মনে খৃষ্টবাণীর অনুরণন তুলেছিল।

জীবনের শেষ দশ বছর রেভারেণ্ড অ্যাবট স্বদেশে কাটান,—নিউ জারসিতে। দশখণ্ড গ্রন্থ রচনা করেন, মারাঠী সন্তদের জীবনকথা। তারই একটি খণ্ড আমার হাতে চেরিলের উপহার।

আমি শুধোলাম,—এ বই তুমি কোথায় পেলে? এতো এদেশেই ছাপানো!

জোগাড় করা কি শক্ত নাকি? আমার সবগুলো ভল্যুমই আছে। একটি সঙ্গে ছিল, তোমাকে দিলাম।

বই-এর ফাঁকে একটা দোমড়ানো কার্ড। তাতে লেখা,—ডক্টর চেরিল হিল্‌টন, এম-ডি। ঠিকানা ঐ নিউ জারসিরই।

বইটা বগলে নিলাম, কার্ডটা পকেটে পুরলাম।

ধন্যবাদ চেরিল,—চলো. রাস্তার ওপর আর নয়, ঘাটে গিয়ে বসি।

মহাদ্বার ঘাট,—সামনে বালির পাড়। পুণ্ডলিকমন্দির। মন্দিরের মুখোমুখি ঘাটের সিঁড়িতে বসলাম। কুলায়ে-ফেরা পাখিদের কালো ডানার মতো অন্ধকার নামছে।

আমি যেন কানহাইয়ালালেরই মতো ডিটেকটিভ। অন্ধকারে আলোর হদিস বার করেছি। পণ্ডিতের মতো মাথা নেড়ে বললাম,—আর আমার বুঝতে বাকি নেই চেরিল, নিউ জারসির এক ডক্টর অব মেডিসিন প্রেরণা পেল ঐ নিউ জারসিরই এক ডক্টর অব ডিভিনিটির লেখা পড়ে। সেই প্রেরণা নিয়ে সে ভারতে এল। সন্তলীলামৃত আস্বাদন করতে বারকরীদের দলে ভিড়ল, তাই না?

ঠিক বলেছ সখা।

আস্বাদন তো বেশ হোলো, এবার তুমি কোথায় যাবে? দিল্লী, বেনারস, কাশ্মীর?

না, আর কোথাও না।

সে কি? আমাদের দেশ, কতো বড়ো দেশ, কতো বিচিত্র দেশ—কিছুই দেখবে না আর? বোম্বাই থেকে হাওয়াই জাহাজে সোজা দেশে ফিরে যাবে?

সেই খিলখিল হাসি। পণ্ডিতী ঘুচিয়ে দিল এক নিমেষে।

সত্যি, তুমি বড়ো বোকা সখা। ফিরে যাব কেন? এই দেশেই তো আমি থাকি। তোমার দেশই তো আমার দেশ। টুটিফুটি হিন্দী আমি তোমার থেকে খারাপ বলি?

এক অবাক বিস্ময়ে চেরিলের মুখের দিকে তাকালাম। বুকের মধ্যে ডানা ঝাপটিয়ে উঠল খুশির পাখি। তোমার দেশ আমার দেশ! চেরিল চলে যাবে না, ফিরে যাবে না, আমারই দেশে সে

থাকে। আমাদের ঘিরে একই দিগন্ত, আমাদের মাথায় একই আকাশ!

আবার শুনলাম চেরিল বলছে,—তবু তো তালিমারা তামিল শোনোনি আমার মুখে!

তামিল?

হ্যাঁ, তামিল আওড়াতে হয় না আমাকে?

কোথায় তুমি থাকো চেরিল?

তুমি চিনবে? জায়গাটার নাম কারিগিরি। খুব ছোট্ট জায়গা,—তামিলনাড়ুর এক কোণে। ভেলোরের নাম শুনেছ? ভেলোরের কাছে।

তামিলনাড়ুর ঐ অখ্যাত জায়গায় চেরিল থাকে,—কথা বলে তালিমারা তামিলে। আশ্চর্য!

ওখানে থাকো কেন? কী করো তুমি চেরিল?

বাঃ আমি ডাক্তার, দেখলে না কার্ডে! ওখানে একটা হাসপাতালে ডাক্তারি করি।

চেরিল এ সব কী শোনাচ্ছে?

উত্তর ভারতের কোনো নামকরা শহর নয়, দক্ষিণের মাদ্রাজ-বাঙ্গালোরও নয়। অখ্যাত কোন্ জায়গা,—সেখানে কোন্ এক হাসপাতালে ডিউটি দিচ্ছে নিউ জারসির এম-ডি ডাক্তার চেরিল হিল্ট্‌ন? আর সেই ডিউটি থেকে ছুটি নিয়ে হাঁটাপথে ঘুরেছে মহারাষ্ট্রের আলন্দী থেকে পান্ধারপুর? শেষ দিনে মার্কিনী ঠাট্টা জুড়েছে নাকি বোকা বাঙালটার সঙ্গে?

আমার গলার স্বর একটু তীব্র হোলো।

নামই শুনিনি তোমার ঐ কারিগিরির। ওখানে বসে কী ডাক্তারী তুমি করো?

বিট্‌ঠলদর্শন শেষ হয়েছে, কাল থেকে দুজনের দু-মুখো রাস্তা, এখন আর জানাশোনায় বাধা নেই,—তাই না? চেরিল হাসিমুখে বললে,—বলব? করি কুষ্ঠের ডাক্তারী।

আমি আঁৎকে উঠলাম। যুগ-যুগের সংস্কারে আমার সমস্ত স্নায়ু হঠাৎ যেন শিউরে উঠল।

কুষ্ঠ? লেপ্রসি? বলো কী? তুমি কুষ্ঠরোগীর সেবা করো?

আবার হাসল চেরিল।

হ্যাঁ, সেবা করি, শুশ্রূষা করি। কুষ্ঠ নিয়ে গবেষণাও করি। এই কাজেই আমার মিশন আমাকে পাঠিয়েছে।

আমার হাত-পাগুলো শক্ত হয়ে গিয়েছে। হাঁ করে তাকিয়ে আছি চেরিলের মুখের দিকে।

আবার বললে চেরিল,—কেন সখা, এতে আশ্চর্য হবার কী আছে? রেভারেণ্ড অ্যাবটের কথা ভাবো। কুষ্ঠরোগীকে স্পর্শ দিয়ে পরিত্রাণ করেছিলেন যীশু, আর রেভারেণ্ড অ্যাবট তোমাদের দেশের সন্তবাণীতেই যীশুর বাণী শুনেছিলেন। জানো, শেষ পর্যন্ত যা কিছু সঞ্চয় অ্যাবট সব দান করে গিয়েছিলেন কুষ্ঠসেবার জন্যে?

আশ্চর্যের ঘোর কেটেছে। কারুণ্যের একটা স্নিগ্ধ ধারা যেন ভরে উঠছে মনের মাঝখানে।

জানলাম,—কিন্তু চেরিল, তুমি কেন?

আমার টাকা নেই, সঞ্চয় নেই। হাতুড়ে ডাক্তারের দুটো হাত শুধু আছে। সেই হাতের দানটুকু দেব না?

আমি চুপ করে রইলাম। পুণ্ডলিকমন্দিরের চূড়োর আলো নিভেছে। ঘাটের নৌকোগুলি ছায়া-ছায়া। কিন্তু আকাশ জুড়ে চতুর্দশীর চাঁদের আলো। সেই আলো চেরিলের মুখে।

বিকেলে ধর্মশালার কলঘরে বালতি বালতি জল ঢেলে সে স্নান করেছে, ধুয়ে ফেলেছে গায়ের ধুলো-গ্লানি। তার ঝুমুর-ঝুমুর চুল টানটান করে বাঁধা। তার গায়ে পারচ্ছন্নতার নতুন গন্ধ। তবু পাংশু তার গাল, কপালে স্পষ্ট কটা বালরেখা। তার গলাখোলা কুর্তার ফাঁকে কণ্ঠার উঁচু হাড়।

আমি নিষ্পলক চোখে তার দিকে তাকিয়ে রইলাম। তার চোখে

যন্ত্রণার মেঘ। পৃথিবীর কুৎসিততম রোগবেদনার সে শরিক, ঘৃণ্যতম অচ্ছুতের সে বন্ধু। এ চেরিল সে চেরিল নয়।

তার ডান হাতটি হাতের মুঠোয় নিলাম। পুঁচিয়ে কাটা নখ, শক্ত আঙুল শ্রমে নিয়োজিত সেবায় নিবেদিত,—হীনতম অস্পৃশ্যের স্পর্শে ঐ আঙুলে পুণ্যের পরম প্রসাদ।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললাম,—এ পথ তুমি কেন বেছে নিলে চেরিল?

কেন সখা? এই তো সকল মানুষের পথ। সবচেয়ে যে দুঃখী মানুষ, নিরাশ্রয় মানুষ,—এই পথেই তো তার কাছে যেতে হবে। তোমাদের বিট্‌ঠল জাননি কূর্মদাসের কাছে?

আর কিছু বলার নেই।

কথা ঘুরিয়ে নিলাম। বললাম,—চলো, খেয়ে নিই। পাশের হোটেলটা বেশ ভালো।

চেরিল মাথা দোলালো। গাল-ছড়ানো চওড়া হাসি হাসল।

চলো, চলো,—কদ্দিন পরে ভালো হোটেলে খাব। পেট ভরে খাব। ইস্, বুঝতেই পারিনি পেটে আগুন জ্বলছে!

আমি তার হাসিতে সায় দিলাম না। আগুন আমার মাথায়। চোখ পাকিয়ে কড়া ধমক দিলাম,—

অমন দাঁত বার করে হেসো না চেরিল! তোমার হাসি দেখলে আমার পিত্তি জ্বলে যায়!

নিভে গেল সঙ্গে সঙ্গে।

কেন সখা? কী হোলো? হঠাৎ রাগ করলে কেন?

সখা, সখা,—সব মিথ্যে কথা, বানানো বুলি! কে তোমার সখা হতে চায়?

উত্তর দিল না। ভীতু-ভীতু বোকা-বোকা মুখ-চোখ।

তখন আমি শান্ত হাসি হাসলাম। কাঁধটি ধরে স্নেহভরে কাছে টেনে নিলাম। বললাম,—

অ্যামেরিকার মেমসায়েবই হও আর নামকরা ডাক্তারই হও, কেন

আমার রাগ তা বুঝবে কেমন করে? প্রথম যেদিন দেখা হোলো, মনে পড়ে? কানহাইয়ালাল বলেছিল,—তুমি আমার প্রেমের দূতী!

একটু লজ্জা পেল নাকি এই শেষ বেলায়? একটু নড়ে বসল। মুখ নামিয়ে টিমটিম করে বললে,—

সে তো ঐ মুখ্যুটার কথার কথা!

কথার কথাই তো! তবু মনে মনে কী আশা ছিল জানো? সখা হতে হতে একদিন হয়তো প্রোমোশন পেয়ে তোমার প্রেমিক হব!

চোখ তুলে তাকাল। মিটিমিটি দৃষ্টি।

তা হও না কেন সখা?

কী করে হব বলো? তোমার প্রেম তুমি যে সকল মানুষকে বিলিয়ে বসে আছ! ছিটেফোঁটাও কি পড়ে আছে আর?

উঠে দাঁড়ালাম দুজনে।

চেরিল বললে,—

চলো সখা, নাথুরামকেও ডেকে আনি।

॥ জয় জয় বিট্‌ঠল রামকৃষ্ণ হরি ॥

সমন্বয়পঞ্জী

[কয়েকটি অব্দ সম্বন্ধে মতান্তর আছে]

খ্রীষ্টাব্দ	ঘটনা
৫১৬	রাষ্ট্রকূট তাম্রলিপিতে পাণ্ডুরঙ্গপল্লীর উল্লেখ।
১১৮৭	যাদবরাজ্যের সূচনা। রাজধানী দেবগিরি।
১১৮৯	যাদবরাজ বিল্লমের অনুশাসন। পান্ধারপুরে মন্দির প্রতিষ্ঠা।
১২৩৭	হয়সাল অনুশাসনে পুণ্ডলিকের উল্লেখ।
১২৭০	নামদেবের জন্ম।
১২৭২	যাদবরাজ রামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেক।
১২৭৩	পান্ধারপুর মন্দিরে রাজা রামচন্দ্র ও মন্ত্রী হেমাদ্রির দান।
১২৭৫	জ্ঞানেশ্বরের জন্ম।
১২৭৬	রাজা রামচন্দ্রের পান্ধারপুর দর্শন।
১২৯৪	আলাউদ্দিন খিলজীর প্রথম দেবগিরি আক্রমণ।
১২৯৬	জ্ঞানেশ্বরের মৃত্যু।
১৩০৭	মালিক কাফুরের দেবগিরি আক্রমণ।
১৩০৯	রাজা রামচন্দ্রের মৃত্যু।
১৩১২	দেবগিরির পতন।
১৩২৭	মুহম্মদ তুঘলক কর্তৃক দিল্লী থেকে দেবগিরিতে (দৌলতাবাদে) রাজধানী অপসারণ। পান্ধারপুরের বিট্ঠলমন্দির ধ্বংস।
১৩৩৬	বিজয়নগর রাজ্যের প্রতিষ্ঠা।
১৩৩৮	চোখামেলার মৃত্যু।
১৩৪৭	বাহমনি রাজ্যের প্রতিষ্ঠা।
১৩৫০	নামদেবের মৃত্যু।
১৪৪৮	ভানুদাসের জন্ম।
১৪৭৩	নিত্যানন্দ প্রভুর জন্ম।
১৪৮০	কন্নড কবি পুরন্দরদাসের জন্ম।
১৪৮৪	বাহমনি রাজ্যের ভাঙন। বেরার, বিজাপুর, আহমদনগর, গোলকুণ্ডা ও বিদরে ভিন্ন ভিন্ন সুলতানী রাজ্যের প্রতিষ্ঠা।
১৪৮৬	শ্রীচৈতন্যের জন্ম।

খৃষ্টাব্দ	ঘটনা
১৫০৯	বিজয়নগরে কৃষ্ণদেব রায়ের সিংহাসনে আরোহণ।
১৫১৩	ভানুদাসের মৃত্যু।
১৫৩০	কৃষ্ণদেব রায়ের মৃত্যু।
১৫৩৩	একনাথের জন্ম।
১৫৩৪	শ্রীচৈতন্যের তিরোধান।
১৫৬৪	পুরন্দরদাসের মৃত্যু।
১৫৬৫	তালিকোটের যুদ্ধ,—বিজয়নগরের পতন।
১৫৯৮	তুকারামের জন্ম।
১৫৯৯	একনাথের মৃত্যু।
১৬০৮	রামদাসের জন্ম।
১৬২৭	শিবাজীর জন্ম।
১৬৪৯	রামদাসের পান্ধারপুর দর্শন। রামদাস ও শিবাজীর মিলন
১৬৫০	তুকারামের তিরোধান।
১৬৫৮	আওরংজেবের সিংহাসনলাভ।
১৬৫৯	শিবাজীর হাতে আফজল খাঁর মৃত্যু।
১৬৭৪	ছত্রপতি শিবাজীর অভিষেক।
১৬৮০	শিবাজীর মৃত্যু। শম্ভাজীর রাজ্যলাভ।
১৬৮১	রামদাসের মৃত্যু। আওরংজেবের দাক্ষিণাত্য যাত্রা।
১৬৮৯	শম্ভাজীর মৃত্যুদণ্ড। রাজারাম।
১৭০০	রাজারামের মৃত্যু। তারাবাঈ।
১৭০৭	আওরংজেবের মৃত্যু।
১৭০৮	শাহুর রাজ্যলাভ।
১৭১৪	বালাজী বিশ্বনাথ পেশোয়া।
১৭২০	বাজীরাও পেশোয়া।
১৭৪০	বালাজী বাজীরাও পেশোয়া।
১৭৬১	পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধ।

গ্রন্থপঞ্জী

[বিট্‌ঠল-বারকরী বিষয়ে সহায়ক রচনাবলী]

ইংরেজী গ্রন্থ

J. E. Abbot, N. R. Godbole & J. F. Edwards—
The Poet-Saints of Maharashtra

Bankey Behari—The Minstrels of God

Bankey Behari—Sufis, Mystics & Yogis of India

K. V. Belsare—Tukaram

R. D. Banerjee—Prehistoric, Ancient and Hindu India

S. V. Dandekar—Dnyanadev

G. A. Deleury—The Cult of Vithoba

V. B. Kulkarni—Shivaji, the Portrait of a Patriot

Majumdar, Raychaudhuri and Datta—An Advanced
History of India

N. Macnicol—Psalms of Maratha Saints

M. S. Mate—Temples and Legends of Maharashtra

C. A. Kincaid & D. B. Parasnis—A History of the
Maratha People

Sridhar Kulkarni—Eknath

M. G. Ranade—Rise of the Maratha Power

R. D. Ranade—Pathway to God in Marathi Lileratue

R. D. Ranade—Pathway to God in Kannada Lileratue

G. B. Sardar—The Saint-Poets of Maharashtra

G. S. Sardesai—A New History of the Marathas

G. S. Sardesai—The Main Currents of Maratha History

J. N. Sarkar—Shivaji and His Times.

হিন্দী ও মারাঠী গ্রন্থ

বি ভি কোল্‌তে—মরাঠী সন্তোঁকা সামাজিক কার্য
এস ভি ডাণ্ডেকার—বারকরী ভজনসংগ্রহ
ভি গো দেশপাণ্ডে—মরাঠীকা ভক্তিসাহিত্য
বি এল পাঠক—বারকরী ভজনমালা
প্রভাকর মাচবে—হিন্দী অউর মরাঠীকা নির্গুণ সন্তকাব্য
গীতা জ্ঞানেশ্বরী—রাজবাড়ে সংস্করণ
একনাথ গ্রন্থমালা—শ্রীএকনাথ গ্রন্থসার প্রকাশন
মহীপতি—ভক্তলীলামৃত
সন্তলীলামৃত

বাংলা গ্রন্থ

কৃষ্ণদাস কবিরাজ—চৈতন্যচরিতামৃত।
গিরীশচন্দ্র সেন—জ্ঞানেশ্বরী (অনুবাদ)
গিরীশচন্দ্র সেন—হরিপাঠাচে অভঙ্গ (অনুবাদ)
দ্বিজপদ গোস্বামী—শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভু
নাভাদাসজী—ভক্তমাল
প্রাণকিশোর গোস্বামী—সন্ধানীর সাধুসঙ্গ
বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য্য—ভারতীয় ভক্তিসাহিত্য
যদুনাথ সরকার—শিবাজী
রমেশচন্দ্র মজুমদার—বাংলা দেশের ইতিহাস

মহারাষ্ট্রে বিট্‌ঠলদেবের নাম

বিট্‌ঠল বা বিঠল : পান্ধারপুরের ভক্তরা সাধারণত এই নামে প্রভুকে অভিষিক্ত করেছিলেন। সন্তকাব্যে এই নামটি সর্বাপেক্ষা ব্যবহৃত।

বিঠোবা : ভক্ত-সাধারণেব ভক্তি-ভালোবাসার ডাকনাম। 'বা' অর্থে বাবা বা পিতা। যেমন জ্ঞানদেবের ডাকনাম জ্ঞানোবা, তুকারামের তুকোবা।

বিঠু বা বিঠো : বিঠোবার সংক্ষিপ্ত নাম।

বিঠাবাঈ বা বিঠাই : মাতৃসম্বোধনে বিট্‌ঠলদেব।

ঈট্‌ঠল : বিট্‌ঠলের অপভ্রংশ।

ইটোবা : বিঠোবার অপভ্রংশ।

ইটু : ইটোবার সংক্ষিপ্ত নাম।